২ অগাস্ট ১৯৮৩। তিন টাকা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পাক্ষিক, তিন টাকা
প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ২ অগাস্ট ১৯৮৩

এবার আমাদের বড় খবর পাঞ্জাব। পাঞ্জাব আর আসাম তো নিজগুণেই কাগজের বড় খবর। খবরটা যে আমারা সরাসরি ধরতে পারলাম, আমাদের পক্ষে সেটাই বড় খবর।

বাংলা ভাষার কাগজপত্র দেখে সন্দেহ হয়, এটা যেন মনে মনে ধরে নেয়া হয়েছে, সারা দেশের বা দুনিয়ার খবর যাঁদের দরকার, তাঁরা সেটা ইংরেজিতে পড়ে নেন আর যাঁরা বাংলা কাগজপত্র পড়েন তাঁদের অত দেশ-দুনিয়ার দরকার হয় না।

সেইজন্যে আমরা চাইছি যেখানে যা ঘটছে, সেখানে সরাসরি গিয়ে ব্যাপারটা জানতে-বুঝতে। বম্বে সুতাকল ধর্মঘটে যেরকম।

পাঞ্জাবকেও আমরা সেইভাবেই ধরতে চাইছিলাম। রঘুনাথ রায়না দিল্লী থেকে আমাদের নিয়মিত লেখক। নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতা, পাঞ্জাবের বিষয় তিনি অনেক দিন ধরে জানেন। তাই তাঁকে আমরা অনুরোধ করি পাঞ্জাবের ব্যাপারে তথ্যগুলো ঠিকভাবে সাজাতে ও তার ব্যাখ্যা দিতে।

তারপর আমরা দিল্লী হয়ে পাঞ্জাব যাই। পাঞ্জাবের রাজনীতি অবশ্য বরাবর দিল্লী থেকে চলে। দিল্লীর এত কাছে না হলে পাঞ্জাবের সমস্যা গত প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর আমাদের জাতীয় রাজনীতিকে এমন প্রভাবিত করত না। আরো একটা বড় কারণ, আমাদের সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সংখ্যা। ফলে, পাঞ্জাব বরাবরই আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে চাপ দিতে পেরেছে। পাঞ্জাবের সঙ্গে সেই কারণেই নানা সময়ে নানা ধরনের আপোষ।

আমরা যখন দিল্লী হয়ে পাঞ্জাব যাই তখন পাঞ্জাবের রাজনীতিতেও বেশ বড় রকমের বদল। আকালী দলের মধ্যে সবচেয়ে রোখা যাঁরা, তাঁরা প্রায় বিদ্রোহ করেছেন। আকালীরা অবশ্য কোনোদিনই রাজনৈতিক দল হিসেবে সুসংহত নয়, বরং নানামতের একটা প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে দাবি আদায়ের স্বার্থে তাঁরা এক হয়ে থাকেন। তা ছাড়া, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির একটা ধর্মীয় প্রভাব আছেই। কিন্তু পাঞ্জাবের আন্দোলনকে যেখানে তোলা হয়েছে, সেখানে আর কোনো নিয়ন্ত্রণ কেউই খাটাতে পারছেন না। আসামের আন্দোলনের কতগুলি দাবি ছিল প্রায় সমগ্র আসামের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। পাঞ্জাবের আন্দোলনের দাবিগুলো হচ্ছে—পাঞ্জাবেরই ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর সামজিক অবস্থান থেকে তৈরি করা। এঁদের স্বার্থ বেশিরভাগ সময়ই পরস্পরের অনুকূল নয়—তাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এককাট্টা হবার প্রয়োজনের চাইতেও বড় হয়ে উঠেছে—পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার স্বার্থ। পাঞ্জাবে গৃহযুদ্ধের সেই মুষল পর্ব শুরু হল বুঝি—এই আশঙ্কা নিয়ে পাঞ্জাব থেকে ফিরলাম।

সম্পাদক স্বপ্না দেব

ভবতোষ দত্ত

কতকগুলো পরিবর্তন বোধহয় করা দরকার।......একটা হল—৩৬৫ ধারা। একটা রাজ্যের ভার নিয়ে নেওয়া, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি—এটাকে অত সহজে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিৎ নয়।

দরবারা সিং

ধর্মীয় দাবীগুলো নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। আর ভৌগলিক সীমানা ও জলবন্টনের ব্যাপারটা অহেতুক চাগিয়ে রাখা হচ্ছে। আকালী দলের ভেতর অনেক ভাগ এবং তারা একে অন্যের সঙ্গে কোঁদলে লিপ্ত ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। একদল যদি সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান চায়. অন্য গোষ্ঠী বেঁকে বসে।

বিষ্ণু দে

রথীনের মোটিফ বেরিয়ে আসে রঙের সেই উপরিতল প্রয়োগেই, আর সুনিশ্চিত রেখার ধ্রুপদী সুর প্রবাহে। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো সাহিত্যিক সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না এবং যা তিনি গড়েন তার ফলাফল নিয়ে একটুও মাথা ঘামান না। মানুষটি মুক্তমন, বিনীত, খাঁটি আর্টিস্ট যাকে বলে। তাঁর কাজেও অসামান্য প্রগতির সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

সলিল চৌধুরী

আমার অভিযোগ ভারতীয় সঙ্গীতকে যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় বেঁধে রাখতে চান, তাকে মিউজিয়ামের বাইরে যেতে দিতে যাঁদের আপত্তি, তাঁদের বিরুদ্ধে। তাতে অর্কেস্ট্রা করতে গেলে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাদ্যবৃন্দের মতো ভ্যাদভেদে রাগসঙ্গীত বাজাতে হবে।

চিঠি

বিপন্ন মুখশ্রী

শঙ্খ ঘোষ 'বিপন্ন মুখশ্রী' রচনায় বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে দায়িত্বহীন সমালোচকদের কথা বলেছেন, তা সর্বাংশে সত্য। যিনি যে বিষয়ে জানেন না, তিনি যখন সে-বিষয়ের কোনো বই নিয়ে উপদেশমূলক মন্তব্য করতে থাকেন, তখন ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু কথায় কথায় আমরা আবার উল্টো এক চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে না যাই! ছন্দ যিনি আদৌ বোঝেন না, তিনি যখন ছন্দ-বইয়ের সমালোচনা করেন, তখন তাঁর নিশ্চয়ই ভর্ৎসনা প্রাপ্য। কিন্তু সে-বইয়ের সমালোচনার জন্য ছান্দসিক হতে হবে এমন মতও বোধহয় গ্রাহ্য নয়। লেখার শেষের দিকে কিছু কিছু কথাবার্তা আছে, যা থেকে এরকম ধারণাই পাঠকের মনে প্রশ্রয় পেয়ে যেতে পারে। একটি বই সমালোচনা করতে গিয়ে যাঁর 'ছ মাস বা এক বছরের মতো অন্যসব পড়াশোনা স্তম্ভিত হয়ে যায়', যিনি তখন 'নিজেকে মগ্ন রাখেন ওই একটিমাত্র প্রসঙ্গ নিয়ে' — তাঁর নিষ্ঠা ও সততা প্রশংসনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই উদাহরণকে শিক্ষণীয় মনে করার বিপদও আছে। পত্রপত্রিকার সমালোচনা বিভাগের প্র্যাকটিকাল সমস্যার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু বিশেষজ্ঞের সমালোচনাই একমাত্র বা সবচেয়ে আদর্শ সমালোচনা তা মনে করলে সমালোচনার পদ্ধতি ও লক্ষ্যকে বেঁধে দেওয়া হয়।

বইয়ের সমালোচনা তো নানা রকমেরই হতে পারে। বিশেষজ্ঞের দীর্ঘ পরিশ্রমের সমালোচনা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান। পাশাপাশি, বিষয়ের বিস্তারে অবগাহন করে গ্রহণের ব্যগ্রতায় ও উত্তেজনায় যিনি নিজের পঠনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁর লেখার স্বাদ অন্যত্র পাওয়া নাও যেতে পারে। বহুচারী, সামগ্রিকতার অনুসন্ধানী, সজীব মনের আশু প্রতিক্রিয়ারও অন্য দাম আছে। তাকে অস্বীকার করি কী করে! বিশেষজ্ঞতার আসন পাকা, না জেনে কথা বলা সবসময়ই নিন্দার্হ, কিন্তু বহুমুখী বিষয়চর্চার আগ্রহে যদি

সমালোচনায় ব্যস্ততা আসেও কখনো, তাকে কী পত্রিকাছাড়া করতে হবে? অবশ্যই দায়বোধকে বাদ না দিয়ে — তবে দায় তো শুধু বিষয়ের খুঁটিনাটির প্রতিই নয়, আমাদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার অখণ্ডতা আমাদের কর্মময় জীবনের দ্রুত সামাজিক বিনিময়ের প্রতিও।

সুব্রত রায়
কলকাতা ৩৭

শুধু সুন্দর নয়, অনুপম

'প্রতিক্ষণ'—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'শুধু সুন্দর নয়, অনুপম।' খুব ভাল লেগেছে বললে খুব অল্প বলা হবে। মনে হচ্ছে, এমন একটা কিছুর জন্যে আমাদের চাহিদা ছিল। এর আগামী সংখ্যাগুলি আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাবে এমন ভরসা জাগছে।

বারিদবরণ ঘোষ
বর্ধমান

ছবি কোথায়

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় কোজিনৎসেভের লেখা 'কিং লিয়ার' প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদটিতে কোজিনৎসেভের ফিল্ম 'কিং লিয়ার'-এর কোনো ছবি দেখতে পেলাম না। ফিল্মটি কলকাতায় এসেছিল, তাই অবাক লাগছে, কোনো ছবি যোগাড় করা গেল না কেন! কারণ, কোজিনৎসেভের লেখার সঙ্গে ফিল্মের স্থিরদৃশ্য থাকলে প্রবন্ধটি বুঝতে আরও সুবিধে হতো। নইলে অনুবাদটি পড়তে একটু কষ্ট হয়।

অমল নাগ
শিলিগুড়ি।

প্রতিক্ষণের স্থায়ী সাহচর্য চাই

প্রথম সংখ্যা আমি পাইনি, তাই দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদজ্ঞাপিত 'আন্তরিক অভিনন্দন' আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু যে অভিনন্দন আপনার বা আপনাদের প্রাপ্য তা সসঙ্কোচে জানাবার জন্যই এই চিঠি। এই পত্রিকার প্রতিটি দিক এবং সামগ্রিকভাবে 'প্রতিক্ষণ' আমায় প্রতিক্ষণেই ভাবিত ও আলোড়িত করছে, ক্ষণিকের অতিথি না হয়ে 'প্রতিক্ষণ' আমাদের স্থায়ী ও ক্রমোজ্জ্বল সাহচর্য দান করুন।

অনিশ্চয় চক্রবর্তী
আসানসোল

মুদ্রণের আভিজাত্য কই

মুদ্রণের যে অভিজাত যন্ত্র আজকাল ব্যবহৃত হয়, সেই তুলনায় 'প্রতিক্ষণ'-এর প্রথম সংখ্যায় ছবি দেখে সে সম্ভ্রান্ত মেজাজের আভাস কিন্তু পেলাম না। ফটো-ফিচারের ছবিগুলো তাদের বাঞ্ছিত চরিত্র পায় নি, তাছাড়া তাদের ক্যাপশানের নম্বরগুলোও বেঠিক। এতে যদিও নিজে খুঁজে নিতে পাঠকদের সক্রিয়তা বাড়ে, তেমনি সে ভুল সম্পাদনার অসাবধানতার ইঙ্গিতবহ। মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়াও কিছু বানান বোধ হয় অশুদ্ধরূপেই ছাপা হয়েছে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংখ্যায় এই সামান্য ত্রুটিগুলোও আর থাকবে না।

সত্য চ্যাটার্জী
বম্বে - ১

বাঘের গলার আওয়াজ

করেছেন কি মশাই? বন গাঁয়ে শিয়েল রাজার দেশে এযে বাঘের গলার আওয়াজ! পারবেন তো এই এক আওয়াজে কথা বলতে বাকী সংখ্যাগুলোয়? নাকি পরে খোকা কৌটোর খই-এর মতো মিইয়ে যাবেন ক্রমশ সস্তা জনরুচিকে তুষ্ট করে তথাকথিত বানিজ্যিক সফলতার মতলবে? চমৎকার প্রচ্ছদটি কে এঁকেছেন নাম নেই কেন? সূচীপত্রে যিনি বিনায়ক দেশপাণ্ডে তিনিই আবার যথাস্থানে ভাদুড়ী হয়ে যান কোন্ ম্যাজিকে? ইনি কে?-অর্থাৎ এই বিনায়ক ভাদুড়ী মশাই? ছদ্মনাম না মা বাবার দেওয়া? সে যাই হোক, লেখকের ছাতির মাপটা জানতে ইচ্ছে করে। এই ঊর্ধ্ববাহু এবং কাঁছাখোলা ভজন পূজনের দেশে তিনি যে মূর্তি-ভাঙার কুড়োলটা হাতে তুলে নিতে পেরেছেন, তার জন্যে সেলাম জানালাম। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে যে কাজ করিয়েছেন, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ পরিকল্পনার জন্যে, রাঘববাবুকে লেখার জন্যে। সব লেখা পড়া হয়নি এখনো। শুধু গন্ধ শুঁকছি। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বুঝিনি।

রজত দাশগুপ্ত
ভবানীপুর

রঘুনাথ রায়না

চক্রবর্তী কাউন্সিলের রিপোর্ট

যদিও প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে গঠিত ইকনমিক এ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের প্রথম রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি, মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ বয়ান কিন্তু আমাদের হাতে পৌঁছে গেছে। এবং রিপোর্টে সমস্যার গুরুত্ব অনেক নরম ভাষায় ও ছকে বলা হলেও স্বাভাবিকভাবে গোটা আর্থনীতিক কাঠামোটাকে ঢেলে সাজাবার কথা ভাবা উচিত এই মুহূর্তে। কিন্তু প্রশ্ন হল সরকারের কি সেই রাজনৈতিক ইচ্ছে ও দূরদৃষ্টি আছে ?

এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই উপদেষ্টা পরিষদ তৈরি হয়। তাতে আর্থনীতিক ব্যবস্থার ওপর প্রবল চাপের প্রতি সরকারি উদ্বেগই প্রকাশ পেয়েছে। সরকার বোধহয় অবস্থাকে এর চাইতে বেশি হাতছাড়া করতে চান না। সুখময় চক্রবর্তীর মতো অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের পরিচালনাধীনে, ডঃ কে· এন· রাজের মতো দক্ষ পণ্ডিতের সহায়তা নেবার মধ্যেও সমস্যার বহুমাত্রিক চেহারাটা বোঝার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়ের দিক থেকে কিন্তু কাউন্সিলের রিপোর্ট একটু সীমিতই। কাউন্সিল নিজেই বলছে, "প্রধানত ষষ্ঠ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অন্তর্গত ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার ওপর সক্রিয় প্রভাববিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো" নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঠামোগত, বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে আরো গভীরের মৌলিক সমস্যা কমিশন আলোচনা করেছেন। রিপোর্টে উল্লিখিত প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে আছে চাল উৎপাদনে নিশ্চল অবস্থা, বিদ্যুৎ-এর ব্যাপারে অবহেলা, অপরিহার্য শিল্পকেন্দ্রগুলোতে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা, আমদানি-রপ্তানির স্থিতি স্থাপকতা, সরকারি বিনিয়োগে মন্দা এবং কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে দারিদ্র্য মোচনের নানা কর্মসূচীকে মেলানো।

যদিও এ বিষয়গুলো নিয়ে পার্লামেন্টে ও কাগজে আলোচনা হয়েছে, তাতে কাউন্সিলের রিপোর্টের গুরুত্ব কোনোভাবেই কমে না। বরঞ্চ এর থেকে বোঝা যায় যে, মানুষকে আংশিক সত্য জানিয়ে সমস্যার গুরুত্বকে এড়ানো বা কমানো কঠিন।

কৃষিক্ষেত্রে সব যে ঠিকঠাক নেই, সমস্যা গভীরতর, রিপোর্টে একথা কবুল· করা হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মৌসুমী বৃষ্টিপাত 'স্বাভাবিক' বা 'প্রায়-স্বাভাবিক' হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি — কারণ, সারা পৃথিবীতেই এক অস্বাভাবিক আবহাওয়ার প্রভাবে আমরাও এক জটিল আবহাওয়া-আবর্তের চক্রে পড়ছি, এতদিন যা আমাদের ধারণার ভেতর ছিল না। রিপোর্টের এই সাবধানবাণী মনে রাখলে বোঝা যাবে, গত বছরের ব্যাপক খরার ফলে এ বছর খাদ্যশস্য উৎপাদন আরও সঙ্কটজনক অবস্থায়
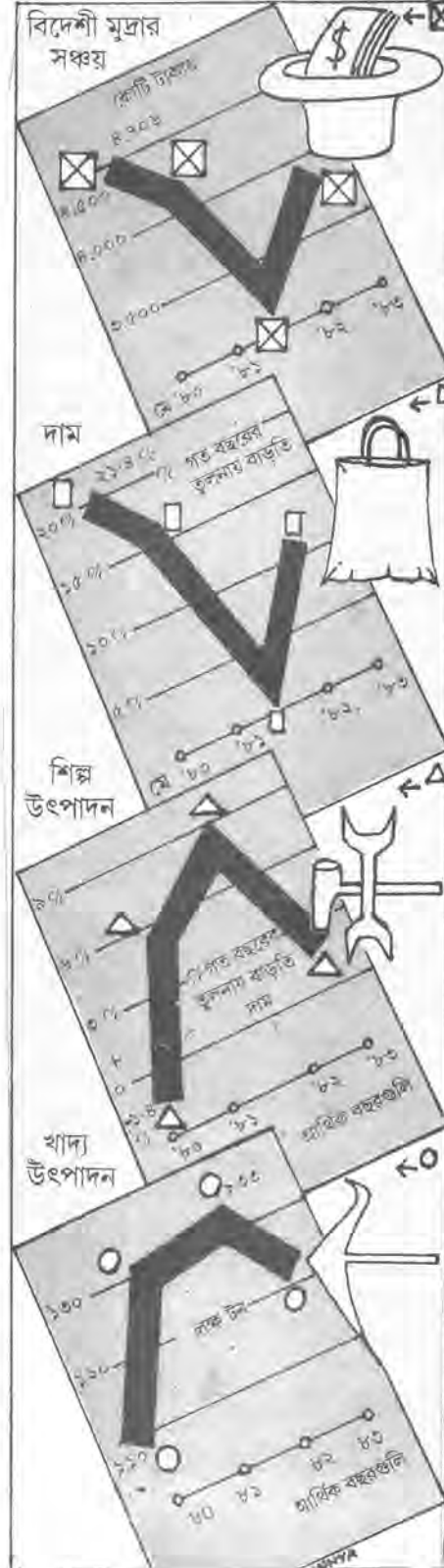
পড়তে পারে। রিপোর্টে বিশেষ করে চাল উৎপাদনে আমাদের শিথিলতার সমালোচনায় বলা হচ্ছে, "অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের ওপরই এতদিন আমাদের চাল উৎপাদনের দক্ষতা নির্ভরশীল ছিল।" এর অর্থ দাঁড়ায় অন্যান্য রাজ্যগুলোতে চাল উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতেই পারেনি।

এর কারণ দেখাতে গিয়ে কাউন্সিল বলছেন, "বিহারের মতো জায়গায় প্রবাসী জোতদারি ও অধিয়ারির ও তার সঙ্গে জড়িত অত্যাচার ও শোষণ নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় কম চাল উৎপাদনের জন্যে দায়ী।" রাজনৈতিকভাবে এই অবস্থার আশু সমাধানের গুরুত্ব ছাড়াও কাউন্সিলের সুপারিশ হল জলবণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নতি, যোজনা প্রকল্পের বিকাশ, আরও ব্যাপকহারে অধিক ফলনশীল বীজ সরবরাহ, সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণদান ও তাদের স্বত্বাধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু "রাজ্যস্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক উন্নতিসাধন না করলে," কাউন্সিলের মতে, "এ উদ্দেশ্যগুলোর কোনোটিই সফল হবে না। যে-যে অঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, সেসব জায়গায় এই পরিবর্তনের আবশ্যিকতা সম্পর্কে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন।"

তাই কাঠামোগত খামতি ও খাদ্যশস্য সংক্রান্ত কাউন্সিলের ব্যাখ্যা গভীরভাবে বিচার করা উচিত। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত কোনো খাদ্যশস্য আমদানি হয়নি বলেই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই-যে আমরা সে কারণেই খাদ্যে স্বয়ংনির্ভর। চীন দেশের তুলনায় খাদ্যশস্যের দিকটা ভারত আরও দক্ষভাবে পরিচালনা করেছে, এ মানসিকতাটাও ক্ষতিকর। বলা হয়, গত তিন বছরে, চীনের চার কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানির তুলনায় আমাদের আমদানি মাত্র সাড়ে সত্তর লক্ষ টন। এটাই ভুল ছবি তুলে ধরে। মনে রাখা দরকার, ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ংনির্ভরতার পাশে পাশেই কিন্তু ৪০ শতাংশ নাগরিক অপুষ্টিতে ভোগে। দ্বিতীয়ত, চীনের জনসংখ্যা ভারতের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি এবং তাদের কৃষিযোগ্য জমি কম থাকায় মাথাপিছু ০·১০ হেক্টর হিসেবে তা ভারতের মাথাপিছু হারের মাত্র ৪০ শতাংশে দাঁড়ায়। তবুও, তারা উৎপাদন করে ৩০ কোটি টন, ভারত ১৩ কোটি টন। নিম্নতম যে-ক্যালরি না খেতে পেলে ভারতে 'গরিব' ধরা হয়, চীনের হার তার ১০ শতাংশ বেশি। এবং আমাদের দেশের কোনো কোনো অংশে মাত্র ১০ গ্রাম মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের হারের তুলনায় চীনের হার মাথাপিছু ৮০ গ্রাম। এইসব কারণেই, ভারতে ৫২ বছরের আয়ুঃসীমা চীন দেশে গড়ে দাঁড়ায় ৬৯ বছর। তাছাড়া শিশু মৃত্যুর হারও চীনে অনেক কম।

পুরোনো যে-সব অভ্যাস আমি কোনোদিনই বদলাতে চাইব না... কেয়ো-কার্পিন তার একটি...

এই কেশ তেলটিই আমি ব্যবহার করছি বছরের পর বছর....'

—বলেন কলকাতার এক গৃহবধূ।

তিনি একাই নন। গোটা দেশজুড়ে হাজার হাজার গৃহবধূ পরিবারের সকলের জন্যে কেয়ো-কাপিন ব্যবহার করেন, আর পরামর্শও দেন এটি ব্যবহার করতে।

তাঁরা জানেন কেয়ো-কাপিন কেশ তেল হালকা, আঠাহীন, মৃদু সুবাসযুক্ত আর ঘন কালো চুলের জন্যে অপরিহার্য। এঁরা কেউই তেমন নাম-ডাকঅলা নন। কিন্তু নিখুঁত গুণমানের জিনিষটি পাবার জন্যে এঁদেরই আগ্রহ সবচেয়ে বেশী।

কেয়ো-কার্পিন কেশ তৈল
বহুদিনের বিশ্বস্ত

দে'জ এর তৈরী একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

PX/KK/B-2/83

কাউন্সিলের মতামতের আর একটি বিষয় হল — জ্বালানি। আমাদের খনিজ তৈল উৎপাদনে বৃদ্ধির হার আশা জাগাতে পারে। কয়লার ব্যবহার ও সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক বহুমুখী কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার কথা কাউন্সিল বলেছেন। কেরোসিন ব্যবহার হ্রাস করতে নরম কোক উৎপাদনে অধিকতর অনুদান ও গ্রামের মানুষদের দৈনিক দরকারের দিকে লক্ষ্য রেখে জ্বালানি বন তৈরির গুরুত্ব অনেক।

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে, কাউন্সিলের রিপোর্টে উৎপাদন ঘাটতির কারণ হিসেবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অদক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে নিচুমানের কয়লা যোগান ও সরবরাহের অনিশ্চিতি, প্রশাসনিক অযোগ্যতা, এবং একটি যোগ্য শুল্কব্যবস্থা তৈরিতে ব্যর্থতা—এসবের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। এই ত্রুটি দূর করতে, কাউন্সিলের মতে, একটি টাস্ক ফোর্স গড়ে তোলা উচিত ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে। "বিদ্যুৎ পর্ষদের নিয়োগ, বদলী ইত্যাদি ব্যাপার ছাড়াও শুল্কহার নির্ধারণের ব্যাপারেও অতিমাত্রায় রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ্যমন্ত্রীস্তরে এ নিয়ে চিন্তা দরকার," রিপোর্টে বলা হয়েছে।

কয়লা উৎপাদনের সমস্যাটা আলাদা করে দেখলে অবস্থার অবনতির চরিত্রটা বোঝা যাবে। অর্থনৈতিক বছরের প্রথম দুইমাসে, এপ্রিল ও মে-তে, কয়লা উৎপাদন প্রায় ৩০ শতাংশ কমে। কয়লা ব্যবহারের প্রধান কেন্দ্র বিদ্যুৎ ও ইস্পাত কারখানাগুলোর সঞ্চিত কয়লার পরিমাণে ঘাটতি হয়। কয়লাখনিগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ এত অনিশ্চিত যে সেখানে দিনে ৮ থেকে ১০ বার 'ট্রিপিং' হওয়া অসম্ভব না। বাইশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মুলিডিহ ধৌতাগার চালু হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যান্ত্রিক গোলোযোগের দরুন, এখনও অচল। রেলদপ্তর থেকে বলেছে, জ্বালানি কয়লার দৈনিক সরবরাহ দ্রুত ঠিক না হলে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হবে।

সামাজিক ব্যবহারের জন্যে তৈরির গুরুত্ব সম্পর্কে কাউন্সিলের সুপারিশকে মনে রেখে এটুকু বলা অন্তত ভুল হবে না যে, জ্বালানি কাঠের সরবরাহ, ছোট বাঁশ ও পশুখাদ্যের যোগান এবং জলবায়ু ও মৃত্তিকার স্থিতির দিক থেকে তত্ত্বগতভাবে পরিকল্পনাটি ভালো শোনালেও কার্যত যা হয়েছে, তা কিন্তু একদম উল্টো।

বনের কাঠ বেচা এতই লাভজনক যে এমনকি কৃষিজমিতেও এখন আয়ের খাতিরে ইউক্যালিপটাস বোনা হচ্ছে। যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বাৎসরিক একর প্রতি ৬০০ টাকা খরচা, সেখানে ইউক্যালিপটাস চাষে ঐ একর প্রতি ৬০০ টাকা লাগবে প্রতি ৩০ বছর অন্তর। আর প্রতিদানে একজন চাষী বছরে পাবে একর প্রতি ২,৫০০ টাকা। বন তৈরি তাই সম্ভ্রান্ত কৃষকের পক্ষে গ্রামীণ শ্রমশক্তি থেকে স্বাধীন হয়ে যাবার খুব সোজা উপায়। শ্রমিকদের মজুরিতেই তো তার আয়ের বেশির ভাগ লাগে। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বন তৈরিতে টাকা খাটালে ভূমিহীন শ্রমিককে তার জীবনধারণের মূল অবলম্বন থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং তাই হচ্ছে। জ্বালানির চাইতে কাঠ ও মণ্ড তৈরির শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ইউক্যালিপটাসের থেকে তিনগুণ আয় হয় বলে গ্রামের লোকের কাছে ব্যবহারের জন্য সে কাঠ পৌঁছয়ই না। আসল কথা, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সৎ হলেও প্রকৃত ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী থেকে ফয়দা ওঠাবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য যাদের আছে, তাদেরই রমরমা।

আমাদের অর্থনীতির এই দিকটি কাউন্সিল তাঁদের ভবিষ্যৎ রিপোর্টে বিচার করবেন আশা করা যায়। কাউন্সিলের অন্যান্য পর্যবেক্ষণও প্রণিধানযোগ্য। সরকারি বিনিয়োগে ঘাটতি হলেও, রেলওয়ের পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও বিদুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কয়লা ও অন্যান্য প্রকল্পগুলোর রূপায়ণে নির্বাচিত ও সুনির্দ্দিষ্ট বিনিয়োগ আবশ্যক।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ দুই বছরে, কাউন্সিল মনে করে, প্রত্যক্ষ কর থেকে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। বাড়ানো দরকার সেই সব উদ্যোগ থেকে যেখানে কর এখনও যথেষ্ট নয়। মন্ত্রিদপ্তরগুলো সরকারি উদ্যোগ যে গা ছাড়া ভাব নিয়ে পরিচালনা করেন, কাউন্সিলের রিপোর্টে সেই ঔদাসীন্য কাটাবার কথাও বলা হয়েছে।

"আশির দশকের মধ্যভাগ থেকেই ক্রমবর্ধমান ঋণ-পরিশোধ করবার দায়িত্বের পরিণাম হিসেবে আমাদের বেশ গুরুতর ঝামেলায় পড়তে হতে পারে," আমদানি রপ্তানির বৈষম্যের বিষয়ে কাউন্সিলের মত এরকমই। এই জটিল অবস্থার মোকাবিলায় আমরা নানা সুপারিশও পাচ্ছি।

শিল্পে উৎপাদনের খরচ ভারতবর্ষে অত্যধিক। দেশের বিভিন্ন উদ্যোগের ভেতর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত বলে কাউন্সিল মনে করে। "ভারতবর্ষে এ ধরনের প্রতিযোগিতার খুব অভাব। বোধহয় তাদের জন্য সংরক্ষিত বাজারের জন্যই। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবার জন্য আরও উৎসাহ প্রয়োজন—যাতে তাদের বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্যও কমে আসে। এসব দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারের জন্য এই প্রতিযোগিতা চাই।"

দারিদ্র্য দূর করার জন্য নানা পরিকল্পনা কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত। এ ব্যাপারে আলাদা সমীক্ষা করছেন বলেই কাউন্সিল কোনো সুপারিশ করেননি। "কিন্তু এই কর্মসূচীগুলোর কার্যকর রূপায়ণে ও ফলভোগকারী ব্যক্তিদের সক্রিয় ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করবার জন্য সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস বিবেচনা"র কথাও কাউন্সিল বলেছেন

বোঝা যাচ্ছে, আর্থনীতিক অবস্থা গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। নরম করে বলা সত্ত্বেও অর্থনীতির বিধ্বস্ত চেহারাটা পরিষ্কার ধরা পড়ে।

কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে, রাজনৈতিক উদ্যোগ ও জেলাভিত্তিক প্রশাসনের খোল নলচে বদলে এ পরিবর্তন আনা যায়। তা না হলে কাউন্সিলের রিপোর্ট পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে। □

সংবাদপত্র পাঠ করে আমাদের ধারণা, পাঞ্জাব অগ্নিগর্ভ। পরিস্থিতি সরেজমিন যাচাই করতে 'প্রতিক্ষণ'-এর সম্পাদক এবং বিশেষ প্রতিনিধি পাঞ্জাব গিয়েছিলেন। চণ্ডীগড় থেকে অমৃতসর ঘুরে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মুখোমুখি বসে তাঁদের উপলব্ধি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, বিরোধী দলগুলির তাৎক্ষণিক ফায়দা লুটবার মোহ এবং সর্বভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা পাঞ্জাব সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করেছে। ফলে, সমস্যার সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সমর্থন পাঞ্জাব সমস্যাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক আয়তনে। এই সমগ্র পরিস্থিতিই এখানে সরেজমিন তদন্ত, বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও সাক্ষাৎকারে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঞ্জাব
যা রটনায় নয়, ঘটনায়

স্বপ্না দেব এবং সুমিত্র দেশপাণ্ডে

চণ্ডীগড় থেকে আড়াই 'শ কিলোমিটার দূরে অমৃতসর যাবার পথে দুপাশে শুধুই ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। গরমের হল্কায় সেই বৃক্ষরাজিময় পারিপার্শ্বে নয়নাভিরাম দৃশ্য আছে, কিন্তু ছায়া নেই বিশ্রামের—তাই পাঞ্জাবের কৃষক খররৌদ্রেই ট্রাক্টর চালিয়ে যায়।

অমৃতসর যাবার পথে গ্রামেরও যেন শেষ নেই, যেমন দাদ্‌ওয়াজুর, মালোওয়া, খারার, কাভালি, চারহোর, ঘোষলান, পানিয়ালিল কল্যাণ, বালাচৌর, নয়ান শহর আর এই সব গ্রামের মাঝে মাঝে গমগমে রোপার, ফাগওয়ারা, জলন্ধর, কারতারপুরের মতো প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্র।

মাঝে শতদ্রু আর বিপাশার উদ্যমহীন দীর্ঘ বালুতট গনগনে আঁচে পুড়ছে। চণ্ডীগড়ে কারবুশিয়রের কল্যাণে রাস্তায় জল পিপাসা পেলে তা মেটাবার উপায় নেই, আর জীবন যেখানে ছড়ানো পরিকল্পিত সেক্টরে সেক্টরে, রাজনৈতিক পোস্টার সেখানে চোখে পড়েনি—অন্তত সেক্টর দুই থেকে নতুন গড়ে ওঠা সেক্টর ৩৮ পর্যন্ত বা অমৃতসর যাবার পথেও, কোথাওই নয়।

ফাগওয়ারা চণ্ডীগড়-অমৃতসর পথের
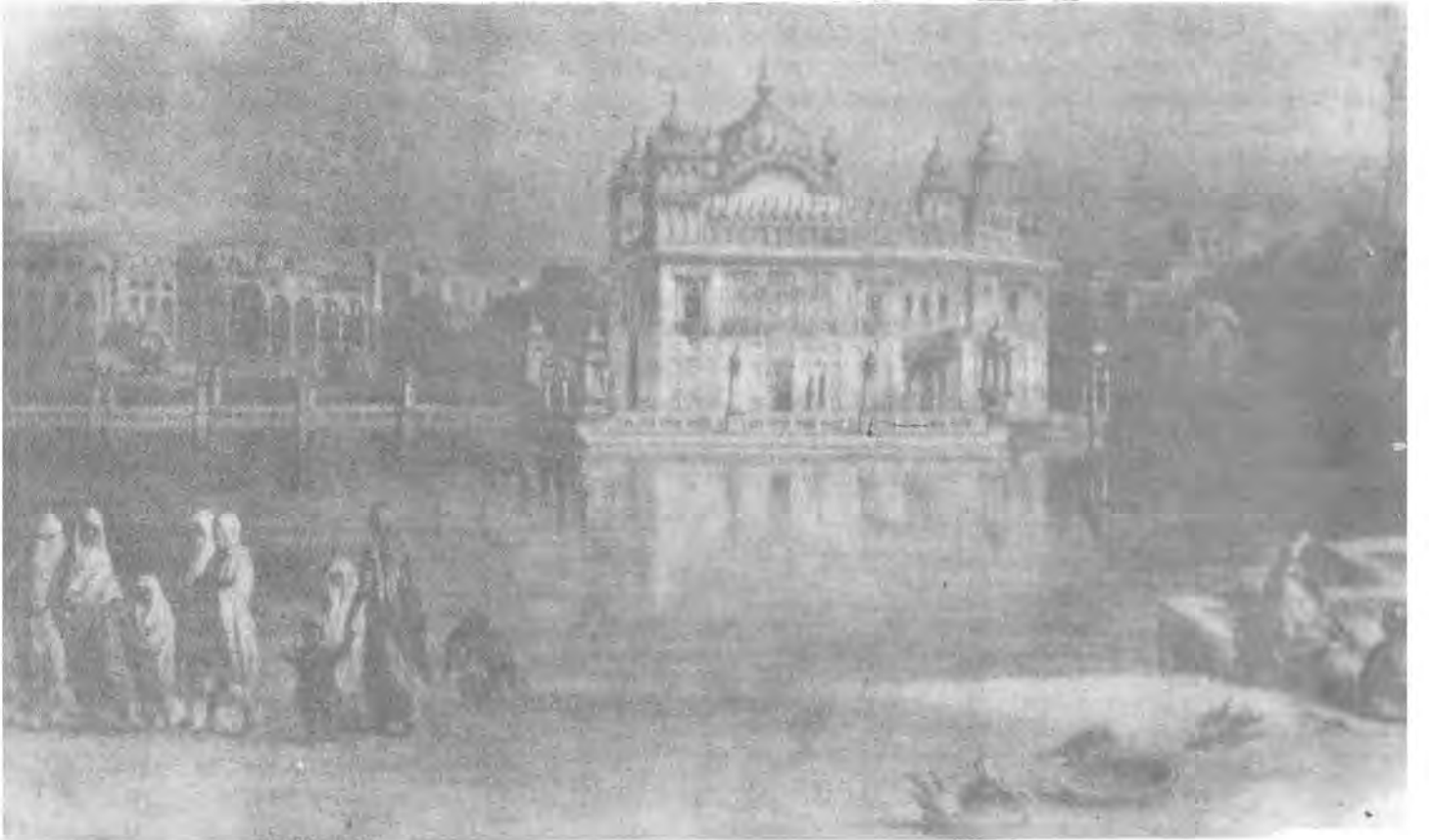
মাঝামাঝি। জল খাবার জন্য থেমেছিলাম সেখানে। আশেপাশের লোকেদের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগে বোঝা গেল, আকালী আন্দোলনে তারা উৎসাহী নয়। খটকা লাগে। আসলে, শতদ্রু-বিপাশার কোল থেকে যে সংবাদ আম'রা পাচ্ছি সংবাদপত্র মারফৎ, গঙ্গার দুই তীরে তা এসে আছড়ে পড়ছে প্রতিদিন মৃত্যু-খুন-রাহাজানির বিহ্বলতা নিয়ে। মনে হতে পারে, অমৃতসর শহর বুঝি দুর্ভেদ্য আকালী দুর্গ, সেখানে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ রাস্তায় বেরুতে সাহস পায় না, বুঝি জনজীবন সেখানে স্তব্ধ। মনে হতে পারে, 'মোর্চা'-র নামে বোধ হয় দলে দলে আকালী সমর্থক এখনও আসছেন স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ করতে, যেন গোটা পাঞ্জাবের সব মানুষের সমর্থনেই পাঞ্জাব আন্দোলন চলছে।

ধারণাটা ঠিক নয়, তার কারণ, পাঞ্জাবের ঘটনাকে আরও উত্তেজক করে তুলবার স্বাভাবিক পেশাদারি প্রবণতায় সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ। অমৃতসরের জনজীবন কোনো অবস্থাতেই, আন্দোলনের চরম পর্যায়েও, বিকল হয়নি। এমন কি স্বর্ণমন্দিরের

পি. এস. বাদল

দরজার সামনে ডি.আই.জি. হত্যার আধঘণ্টার ভেতরেই সেই খুনের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব আর ছিল না। প্রতিটি ঘটনাই বিচ্ছিন্ন হিংসার প্রকাশ—আর সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে দেখানো হয়েছে এক বিস্ফারিত চেহারায়, যাতে এমন ধারণা সহজেই হতে পারে যে, এ যেন গোটা পাঞ্জাবেরই প্রতিবাদ।

এই আন্দোলনের কোনো শ্রেণীচরিত্র নেই। কোন শ্রেণীর শিখ বা সেই অর্থে পাঞ্জাবের কোন শ্রেণীর দাবির প্রকাশ এই আন্দোলন? ব্যাপক কৃষক সম্প্রদায়? না। শ্রমিকদের বড় অংশ? না। মধ্যবিত্তদের সংখ্যাগরিষ্ঠ? না। তবে কারা? বা মোট কত অংশ তারা গোটা পাঞ্জাবের শিখদের মধ্যে? পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অমৃতসরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় মোট জনসংখ্যার ২০ থেকে ২২ শতাংশের বেশি জনসমর্থন নেই এর পেছনে।

তবে সন্ত্রাসটা করছে কারা? এত যে দলে দলে জেলে যাচ্ছে, তারা কে? কেন যাচ্ছে? ভিনদ্রানওয়ালে কী আন্দোলনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যুক্ত, বা লঙ্গোয়াল? প্রশ্নগুলো সঙ্গত কারণেই

জার্নেইল সিং ভিনদ্রানওয়ালে

জটিল। গুরুদুয়ারাতে হাজার দশেক মাইনে করা কর্মচারী আছে—অধিকাংশই বেকার, অর্ধশিক্ষিত, তারা তো কম লোক নয়। তাদেরই ভেতরকার ১২, ১৩,১৪, ১৫ বছরের কিশোররা হাতে বন্দুক ও কাঁধে কার্তুজের ঝোলা দুলিয়ে গুরু নানক নিবাসের সিঁড়িতে, আনাচে কানাচে আত্মমগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাই গুরু নানক নিবাসের ছাদে ভিনদ্রানওয়ালের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে—ভিনদ্রানওয়ালেকে রক্ষা করার চাইতেও বন্দুক হাতে দাঁড়াবার রোমাঞ্চই তাদের চোখেমুখে।

৩৮ বছরের ছোকরা ভিনদ্রানওয়ালের কাছে যখন গিয়েছিলাম, তখন অমৃতসরে বিকেল পাঁচটা। পড়ন্ত বিকেলের গাঢ় রোদ স্বর্ণমন্দিরের গম্বুজে ঠিকরে পড়ছে। গুরু নানক নিবাসের ছাদে এক খাটিয়ার ওপর ভিনদ্রানওয়ালে আধশোয়া। মাথায় নারাঙি রঙের পাগড়ী, গায়ে আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী, পায়ে জমাট লোম। বুকে আমেরিকান পেন গোঁজা। এক ঘণ্টা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ও নিজের 'সোনি' টেপে রেকর্ড করল তবে অমন জটিল টেপ রেকর্ডার আগে দেখিনি। দরিদ্রতম মানুষটি হয়ত তার সারাজীবনের সঞ্চয় এনে গুঁজে দিচ্ছে ভিনদ্রানওয়ালের গভীর পকেটে—প্রণাম করে, কিন্তু ভিনদ্রানওয়ালে নমস্কারও ফিরিয়ে দেয় না। (ভিনদ্রানওয়ালের সঙ্গে 'প্রতিক্ষণ' প্রতিনিধির একান্ত সাক্ষাৎকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।—স.প্র.) নিচে 'মোর্চা'-র ২৫/৩০ জনের একটা দল মাইকে তীব্রস্বরে গ্রামীণ অপ্রচলিত পাঞ্জাবী ভাষায় গালাগাল করছে। সেই পরিবেশে বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, এই গরীব লোকগুলোকে কি নিষ্ঠুরভাবে বোকা বানিয়ে রেখে এতবড় একটা ফাঁকি দেবার চক্রান্ত চলছে।

সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর যে একটা মস্ত ফাঁকি আছে, সেটা আন্দোলন পরিচালনার ধরন থেকেই বোঝা যায়। লঙ্গোয়াল ও ভিনদ্রানওয়ালে এখন আবদ্ধ শিরোমণি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির বাড়ি ও গুরু নানক নিবাসের চৌহদ্দিতে। তারা বেরুতে পারে না, কারণ বাইরে এলেই পুলিস তাদের ধরবে। কিন্তু এই বদ্ধ অবস্থায় কিছু-কিছু উত্তেজিত শিখ জাঠার সঙ্গে তাদের সমাজ, এলাকা, মাটির বাইরে দেখা হচ্ছে এক ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে। ফলে, নিজেদের যা রাজনৈতিক দাবি ছিল, এই

জি. এস. তোহরা

বিচ্ছিন্নতার ফলে, সে দাবিগুলো গৌণ হয়ে প্রায় রোজই নতুন নতুন দাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার ফলেই এটা ঘটতে পারে। তাই জলবণ্টন বা অন্য কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের বদলে ট্রেনের নাম বদলানো, শিখরা আলাদা জাতি তাই আলাদা দেশ চাই গোছের বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্লোগানই প্রধান হয়ে ওঠে।

সমস্ত আন্দোলনের চরিত্রে মস্ত ফাঁকি যে আছে, তা বোঝা যায় আরও বেশি, যখন দেখি যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভিনদ্রানওয়ালে তার দীর্ঘ বক্তৃতাগুলোতে (আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও) প্রকাশ করে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় তার কোনো প্রভাব নেই। সাম্প্রদায়িকতার কথা শুনে তারা হাসবে, কারণ একটি পরিবারে পাঁচজন বৌ থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু-তিনজন হিন্দু মেয়ে থাকবেনই। সেই ধরনের পারিবারিক গড়ন অসংখ্য। সে সব পরিবার কি ভেঙে যাচ্ছে? একেবারেই না। অমৃতসর শহরে হিন্দু আর শিখের দোকান পাশাপাশি এবং কোনো টেনশনই নেই প্রধান বাজার এলাকায়, যেখানে সবচাইতে বড় কাপড়ের কারবার। জালিয়ানওয়ালাবাগের সামনে

দিয়ে চলে গেছে যে দীর্ঘ পথ, তাতে শিখ ও হিন্দু গায়ে গা লাগিয়েই চলছে। কোনো অসুবিধে নেই। একটি শিখ রিক্সাওয়ালা বা স্কুটার চালক হিন্দু মহিলা আরোহীর প্রতি সমান ভদ্র এবং কেউই রাত্রিবেলা একলা রাস্তায় বেরুতে ভীত নন। কিছুদিন আগে একজন হিন্দুপুলিস অফিসার অমৃতসরে এসেছিলেন, পথে তাঁকে খুন করা হয়। তাঁকে দাহ করতে হিন্দু অফিসারদের চাইতে অনেক বেশি শিখ অফিসার অংশ নেন।

অমৃতসরের বর্তমান সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিস (এস·এস·পি) সরবজিৎ সিং তাঁর অফিসের ঘরে বসে আমাদের জানালেন, পুলিসের বর্তমান চেষ্টা হচ্ছে, স্বর্ণমন্দিরের আশপাশের এলাকায় থেকে যারা নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে, তাদের ধরা। পুলিসের পক্ষে, ধর্মীয় কারণেই, যদিও ঐ এলাকায় ঢোকা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, কিন্তু সেসব সমাজবিরোধীরা তো তাদের হিংসাত্মক কাজ হাসিল করবার জন্য সে এলাকার বাইরেই আসে। পুলিস তখন তাদের ধরবার চেষ্টা করবে—এটাই এখন তাদের নীতি। সরবজিৎ সিং জানালেন, মোর্চা-র লোকেরা সন্ধ্যেবেলায় শান্তিপূর্ণভাবে এসে আইন অমান্য করে—সেখানে প্রধান সমস্যা আইনশৃঙ্খলার নয়, সমস্যা পর্যাপ্ত পরিবহণের। সরবজিৎ সিং কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করেছেন। তিনি হেসে বললেন, ভিনদ্রানওয়ালে আর লঙ্গোয়ালের সঙ্গে কথা বলুন, দেখুন ওরা কি বলে। কিন্তু দোহাই আপনাদের, সে সব চুকে গেলে এই কচকচি ভুলে স্বর্ণমন্দিরের অপূর্ব স্থাপত্যের দিকে তাকাতে ভুলবেন না যেন। এতে বোঝা যায়, পুলিসও এই মুহূর্তে কোনো বড় টেনশনে নেই আর।

আরও একটা মজা আছে এই কারাবরণের পেছনে। সে কথা আমাদের বলেন স্মরণ সিং গিল। আকালীরা যখন ক্ষমতায় ছিল বাদলের নেতৃত্বে, তখন জেলে বন্দী সব আকালীদের (কারাবরণের সময় যাই হোক না কেন) তারা মুক্ত করে এবং 'স্বাধীনতাসংগ্রামী' হিসেবে পেনশন

সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বহু লোক ছ'মাস, একমাস জেলে থেকেও সে পেনশন পাচ্ছে। আকালী নেতারা এখন সেই লোভ দেখায় গরীব লোকদের। তারা জেলে যাক, আকালীরা ক্ষমতায় এলে, এসব লোকদেরও 'স্বাধীনতাসংগ্রামী' বলে ঘোষণা করে পেনশন দেওয়া হবে। সাধারণ একটি দরিদ্র মানুষের কাছে এই প্রলোভনই যথেষ্ট।

কিছু দাবি নিয়ে তারা এই মুহূর্তে একটু চুপচাপ। যেমন, চণ্ডীগড় হস্তান্তর। চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে দিলে সেখানে মোট ছ'টি বিধানসভার আসন তৈরি হবে। এবং আকালীরা জানে সেই ছ'টা সিটের একটিতেও তারা জিততে পারবে না। এবং চণ্ডীগড় হাত ছাড়া হয়ে গেলে আকালীদের পক্ষে সংগঠন চালানোও অসম্ভব। সেটা আকালী নেতারা বোঝেন, এবং এই কারণেই চণ্ডীগড় নিয়ে খুব একটা মাতামাতি দেখা যাচ্ছে না।

এ ছাড়া আকালীদের ভেতরেও তীব্র দলীয় কোঁদল। কিছুদিন আগেই পূর্বতন আকালী দল সভাপতি জগদেব সিং তালওয়ান্দি আকালী বিধায়ক ও লোকসভা সদস্যদের মিটিং ডেকেছিলেন, পূর্বতন আকালী দল (তালওয়ান্দি) সাধারণ সম্পাদক দয়াল সিং-এর মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্তে আবার লঙ্গোয়াল গোষ্ঠীভুক্ত, আকালী দলের লুধিয়ানা (গ্রামীণ) জেলার সভাপতি তালিব সিং সাধু [illegible] করেছিলেন। দয়াল সিং এখনও অন্য [illegible] বসে অমৃতসরেই।

আকালী দলের পক্ষ থেকে মাস ছয়েক আগে বিধায়কদের পদত্যাগ করবার সিদ্ধান্তকেও বহু বিধায়ক মানছেন না। তাঁরা সদস্য থেকেই বিধানসভাতেই আকালী লড়াই চালাতে চান। সেখানে জগদেব সিং গোষ্ঠীর সমর্থক গুরবচন সিং লাখমিরওয়ালা নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তালওয়ান্দি গোষ্ঠী লঙ্গোয়ালের নেতৃত্বে আস্থা হারাচ্ছেন, কারণ প্রথমত, লঙ্গোয়ালের হাতে এখন আন্দোলন আর নেই, এবং দ্বিতীয়ত, আনন্দপুর সাহিবে গৃহীত আকালী দলের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকর করতেও লঙ্গোয়াল তেমন উৎসাহী নন।

তাই আসাম আন্দোলন ও পাঞ্জাবের আন্দোলনের চরিত্রগত পার্থক্য খুবই প্রকট। আসামে মানুষদের প্রাথমিক সংহতি পাঞ্জাব আন্দোলনে নেই। তবে আসাম আন্দোলনের শেষ দিকে যেমন চরমপন্থীদের হাতে চলে গিয়েছিল অবস্থা, পাঞ্জাবেও এখন তাই। ফলে, ভিনদ্রানওয়ালের হাতেও কতখানি কর্তৃত্ব আছে, সেটাও সন্দেহ করা যায়।

অমৃতসর থেকে আমরা ফিরে এসেছি গভীর রাতের পথ বেয়ে। কারতারপুর, ফাগওয়ারা বা জলন্ধরে ইতস্তত পুলিস ছিল, কিন্তু শহরের পরিবেশে, অত রাতেও, কোন উদ্বেগ বোঝা যায় নি। গ্রামে গ্রামে মেলা চলছে। নাগরদোলায় উচ্ছল শিশু। হাট সেরে সাইকেল করে ফিরছে বহু লোক। সবই তো স্বাভাবিক। □

আগামী সংখ্যায়

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে
নিখিল চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ এবং
মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ফারুক আবদুল্লার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার
এছাড়া স্বর্ণমন্দিরের চত্বরে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার :
সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল এবং জার্নেইল সিং ভিনদ্রানওয়ালে

পাঞ্জাব সংকট: সমাধান কঠিনতর

রঘুনাথ রায়না

এই সীমান্ত রাজ্যের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর হিংসাত্মক ঘটনার বিস্তার সামাজিক-রাজনৈতিক জটিলতা গভীরতর সমস্যারই ইঙ্গিত দেয়। আকালী রাজনীতির কট্টর বিক্ষোভ ও চূড়ান্ত ধর্মীয় আবেগ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে ধ্বংস এবং উগ্রপন্থী আচরণই যার একমাত্র পরিণাম।

কিন্তু ঘটনা পরম্পরাকে একচোখো পদ্ধতিতে বিচার করে পাঞ্জাব সমস্যার প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে না, সমাধান তো অসম্ভব। নানা ধরনের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যাপার এমন জট পাকিয়ে আছে যে সরল কোনো ফরমুলায় তা খোলা অসাধ্য ব্যাপার। সাধারণত ভারতীয় রাজনীতির অন্তর্গত বিশৃঙ্খলাকে আমরা ব্যাখ্যা করে দেখি না। যেকোনো জরুরী অবস্থাকেই ধামাচাপা দেবার বা কোনো রকমে মানিয়ে নেয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জাবে এর কোনোটাই কাজ করেনি। কারণ সেখানকার ঘটনাবলীকে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি কেবল আকালী উগ্রপন্থা হিসেবেই দেখে আসছেন।

এটার অর্থ এমন নয় যে অবস্থার এই অবনতির জন্য শিখদের সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব দায়ী নয়। ১৯৭৩ সালে শ্রীআনন্দপুর সাহেবে গৃহীত প্রস্তাবেই আকালী উগ্রপন্থা স্বীকৃতি পায়।

যদি সেই সিদ্ধান্তে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের কথাই শুধু থাকত, যদি বলা হোত যে কেন্দ্র কেবল বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে, তাহলে বোঝা যেত, রাজ্যগুলি যে আরো বেশি ক্ষমতা চাইছে, আকালী সিদ্ধান্তও তারই একটি অংশ কিন্তু আনন্দপুর সাহেবের প্রস্তাবে সে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এঁদের প্রকাশ্য দাবি, শিখদের ক্ষেত্রে ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করা যাবে না। শিখদের ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র চাই—এটাই তাঁদের মূল বক্তব্য। আনন্দপুর সাহেব শহরে গৃহীত প্রস্তাব চরম বিন্দুতে পৌঁছয় যখন এঁরা শিখ জাতি তত্ত্ব হাজির করলেন। জন্মসূত্রে ভারতীয় কিন্তু বর্তমানে মার্কিন নাগরিক গঙ্গা সিং ধিলন শিখদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় দিতে পৃথক রাষ্ট্রের আন্দোলন করতে বলেন। শিখ এডুকেশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি হিসেবে তিনি এই আবেদন পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ডঃ জগজিৎ সিং চৌহান বলে এক ব্যক্তিকেও খালিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় আমরা দেখতে পাই। (সম্প্রতি জুলাই মাসের ১১ তারিখে ডঃ চৌহান খালিস্তান আন্দোলনের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন লন্ডনে। 'খালিস্তান জাতীয় পরিষদের' কাছে তিনি পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেবেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তিনি দেশে ফিরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলে বিবৃতিতে বলা হচ্ছে। ভারত সরকার তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করলে তিনি কোর্টে যান এবং কেসের রায় তাঁরই পক্ষে।) এই চৌহানই প্রথম স্বর্ণমন্দিরে বেতারকেন্দ্র স্থাপনের দাবি তোলেন। মাথা-গরম রক্ত-গরম বক্তৃতা শুধু সেই দাবিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আকালী দলের একটি অংশ তালওয়ান্দির নেতৃত্বে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার আবেগের উন্মাদনাকে সুবিধেমতো কাজে লাগাতে থাকে। এমন কি লঙ্গোয়াল পরিচালিত আকালীদের
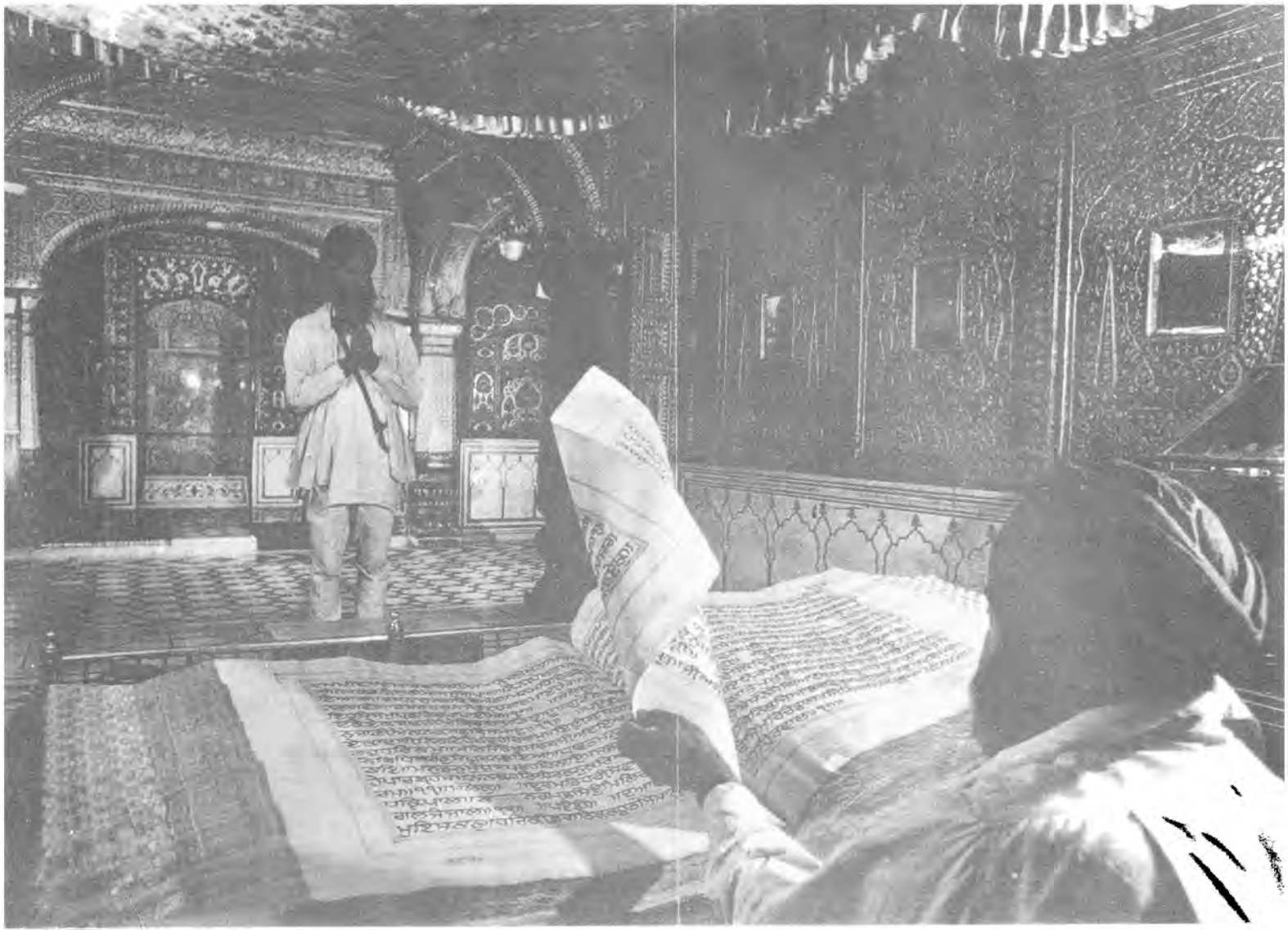
প্রধান অংশও পিছিয়ে নেই। শিরোমণি গুরদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটিতেই (এস· জি· পি· সি·—পাঞ্জাবে শিখ ধর্মস্থান পরিচালনার মুখ্য সংস্থা) গৃহীত সিদ্ধান্তেও শিখদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি জানানো হয় সর্বসম্মতভাবে। এমন কি ১৯৭৭ সালে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনেও আকালী দল আনন্দপুর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আর তখন থেকেই মধ্যপন্থী ও উগ্র আকালীরা এক হয়ে এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এগুচ্ছে।

এটা খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা একঘেয়ে কথা বলে যাচ্ছেন—আকালী দলের নানা অংশের ভিতের ভাগাভাগির ফলেই নাকি এসব ঘটছে। পাঞ্জাব রাজ্যে সাম্প্রতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও শিখ-ইতিহাসের জটিল ধারার আবর্তে নিহিত কঠিন প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর মেলে না এ ব্যাখ্যাতে। এমন-কি ব্রিটিশরাও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মধ্যপন্থী ও উগ্র এই দুভাগে ভেঙে দেখত। কিন্তু এই ধরে-নেওয়া বিভাগের যে কোনো অর্থ নেই, তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই, আকালী আন্দোলন যে জনসমর্থন পাচ্ছে, সেটাকে হিসেবে ধরে এই সব কিছু বিচার করতে হবে।

কিন্তু সে বিচারের আগে মনে রাখা দরকার, আকালী সাম্প্রদায়িকতা কেবল টাকার একপিঠ। অন্যদিকে আছে, কংগ্রেস(ই)-র উচ্ছন্ন সুবিধেবাদী রাজনীতি ও নিকৃষ্ট হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। আসলে পাঞ্জাব সমস্যার শুরু বোধহয় ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের সেনসাসেই। তখন অধিকাংশ হিন্দু সেনসাসে মাতৃভাষা হিসেবে পাঞ্জাবী না লিখিয়ে 'হিন্দি' লেখায়। এবং এই অবাস্তব বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতেই পাঞ্জাব রাজ্যকে ভাগ করা হয়—প্রকৃত পাঞ্জাবী ভাষী বাহু অঞ্চলকে পাঞ্জাবের বাইরে ফেলা হয়। ফলে চন্ডীগড় ও পাঞ্জাবীভাষী এলাকার প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। এহল গোদের উপর বিষফোঁড়া।

কংগ্রেস (ই)-র দায়িত্ব কিন্তু কম নয়। সঞ্জয় গান্ধী রাজনীতিতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যুবশক্তিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা শুরু হল। শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল যেহেতু কংগ্রেস (ই)-র চোখের বালি, সেজন্য আকালীদের হটাতে ১৯৭৯ সালে দল খালসা তৈরি হয়—শিখ এ্যাসোসিয়েশন ও শিখ সাহিত্য সভা—এই দুই গোষ্ঠীকে মিশিয়ে। একজন খ্যাতনামা শিখ কংগ্রেস (ই) নেতার আর্থিক প্রশ্রয়ে খালসা দল শিখ রাষ্ট্রের দাবিতে খালিস্তান কথাটা ক্রমাগত ব্যবহার করে চলে। শিখ ভোটকে নিজের কব্জায় আনবার এটাই ছিল কংগ্রেস (ই)-র চাল। কিন্তু কংগ্রেসই (ই) হিন্দু সমর্থন খোয়াতেও রাজি নয়। শিখ ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে এক যুক্তিবাদী পাঞ্জাবী মনোভাব গড়ে তোলার বদলে কংগ্রেস (ই) পাঞ্জাবে হিন্দু সমস্যা পর্যবেক্ষণের জন্য হিন্দু সুরক্ষা সমিতি গঠন করে।

শাসক দল শুধু যে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনেছে তাই নয়, সারা রাজ্যে এই বিষ ছড়াবার জন্যেও তারাই দায়ী। পাঞ্জাবকে চন্ডীগড় দেওয়া হয় ১৯৭০ সালে আর পাঁচ বছরের মধ্যে এই হস্তান্তরের কাজ শেষ হবার প্রতিশ্রুতি ছিল। এখনও তা হয়নি। নদীর জল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে অধিকার নিয়ে ১৯৭৮ সালে আকালী দল ক্ষমতায় এসে সুপ্রিম কোর্টে যায়—কিন্তু ১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) সে কেস প্রত্যাহার করে।

তাই আজকে পাঞ্জাবের এই বিস্ফোরক অবস্থার জন্যে দায়ী হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, শিখ সঙ্কীর্ণতা ও কংগ্রেস (ই)-র সুবিধাবাদ। আর তার ফল হিসেবে সীমান্তবর্তী এই রাজ্যের ঘটনায় সারা

দেশের সংহতি বিপন্ন। কিন্তু 'করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে' মন্ত্রে দীক্ষিত সিরজিওয়ারের মতো 'সুইসাইড স্কোয়াড' বা আকালী আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে গেলে শিখ ইতিহাসের গভীরে যাওয়া দরকার। অতীতে বারবার দেখা গেছে, শিখরা কখনো দেশের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে মিলিতভাবে, আবার কখনো বিচ্ছিন্নভাবে তাদের "মৌলিক অধিকার" জানিয়ে এসেছে। এই "অধিকার" অবশ্য যুগে-যুগে বদলেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন যেমন হয়েছে তেমনি সম্প্রতি নানা সুবিধেবাদী আঁতাতের মাধ্যমেও সেই দাবির প্রকাশ আমরা দেখছি। কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মীয় শুদ্ধতা ও সমতাবাদী সামাজিক নীতিভিত্তিক পাল্টা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এক ধারাবাহিক চেষ্টাও অব্যাহত। এই আদর্শের প্রেরণায় সামাজিক সংগ্রাম কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ভেতর অবদ্ধ নয়—তা জীবনের সমস্ত স্তরকেই ছুঁয়ে থাকে। এই লক্ষ্যে পৌছুতে এমন একজন মানুষের দরকার, যার ভেতর এক ঐশ্বরিক ধারার মূর্তরূপ পাওয়া যাবে। এই মানসিকতাকে কাজে লাগিয়েই সন্ত জার্নেইল সিং ভিনদ্রেনওয়ালে তাঁর পেছনে এত জনসমর্থন সংগঠিত করতে পেরেছেন।

পাঞ্জাব সমস্যার জটিলতায় অন্য একটি দিকও আছে। যদিও দেশের মধ্যে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর ভেতর পাঞ্জাব অন্যতম, হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী তাঁদের জমি হারিয়েছেন তাঁদের বড়লোক প্রতিবেশীর কাছে, যদিও 'সবুজ বিপ্লব'-এর দেশ, তবুও ১৯৫১ থেকে সারা দেশে মোট ৪০,০০০ কোটি টাকার সরকারি সংস্থাখাতে বরাদ্দ অর্থের মাত্র ৯০০ কোটি টাকা এ রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ হিসেবে। মাথাপিছু আয় এখানেই সর্বাধিক, তবুও অশিক্ষিতের হার ৭৫ শতাংশ। যদিও শিখদের শেকড় তাদের দেশের খুব গভীরে, তবুও ১৪ শতাংশ শিখই 'দেশ'-এর বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। এই সব বিপরীত উপাদানে পাঞ্জাব সমস্যা জটিলতর হয়েছে। তাছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির ফল হিসেবে এক নতুন শ্রেণী ক্ষমতার অংশও দাবি করছে। গত ৩০ বছরে মাত্র চার বার এরা ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল, তাও যুক্তফ্রন্টের সাহায্যে। কংগ্রেস (ই) বারবারই সে-সব সরকার ভেঙে দিয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে পাঞ্জাব সমস্যা মিটবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শাসক দলও বোধহয় অবস্থাকে গড়িয়ে যেতে দিচ্ছে, এটাই দুর্ভাগ্যের।

পাঞ্জাব আন্দোলনে কয়েকজন নেতা

সন্ত হরচাঁদ সিং লঙ্গোয়াল : শিরোমনি আকালী দলের সভাপতি এবং মধ্যপন্থী শিখ, 'মোর্চা'-র একনায়ক। লঙ্গোয়াল, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে, সম্ভ্রান্ত, পেশাদারী, শহুরে (প্রধানত ক্ষত্রি সম্প্রদায়ভুক্ত) শিখদেরই প্রতিনিধি। যদিও জার্নেইল সিং ভিনদ্রানওয়ালে ও লঙ্গোয়াল হলেন আকালী আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা, তাঁদের ভেতর পার্থক্যও কিন্তু প্রচুর। যেমন স্বর্ণমন্দিরের চত্বরে ভিনদ্রানওয়ালের সশস্ত্র অনুচররা ছড়িয়ে আছে। লঙ্গোয়ালের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এতে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই, কিছুদিন আগে স্বর্ণমন্দিরে পুলিস ঢুকবে, এই অছিলায় লঙ্গোয়াল নিজের কিছু সশস্ত্র সদস্যকে স্বর্ণমন্দিরের প্রধান প্রধান জায়গায় বসাতে চেয়েও পারেননি। যে 'মোর্চা' গত ১১ মাস ধরে চলে আসছে, লঙ্গোয়াল তার নেতৃত্বে থাকলেও তাঁর প্রধান আবেদন কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের। তিনি শিক্ষিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দুদের সঙ্গে আঁতাতের সপক্ষে। পাকিস্তান যদি কোনোদিন আক্রমণ করে, তবে, লঙ্গোয়াল খোলাখুলি বলছেন, কেন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ ভুলে আমরা এক হয়ে লড়ব। লঙ্গোয়ালের মতে, আমরা একে অন্যকে হত্যা করতে পারি না। হিন্দু আর শিখদের ভেতর যে সম্পর্ক তা মানবতার। কিন্তু যেহেতু ভিনদ্রানওয়ালের ভূমিকা লঙ্গোয়ালের পক্ষে অস্বীকার করা অসম্ভব, সব সময়ই আন্দোলনের পদ্ধতিগত বিষয়ে ভিনদ্রানওয়ালের সঙ্গে তাঁকে আলোচনা করতে হয়।

জার্নেইল সিং ভিনদ্রানওয়ালে চক মেহেতো গ্রামে এক নগণ্য ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন ৩৭ বছরের এই সন্ত। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ ভিনদ্রানওয়ালে পাঞ্জাব আন্দোলনের প্রধান শক্তি বললে ভুল হবে না। আকালী আন্দোলন নিয়ে যত আলোচনাই চলুক না কেন, ভিনদ্রানওয়ালের সম্মতি ছাড়া কোনো চুক্তি বা আপস অকল্পনীয়—যেমন সরকারপক্ষের হয়ে পাঞ্জাব প্রসঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব নিলেও প্রত্যেকটি ব্যাপারে পি· সি· শেঠিকে যেমন উঠে গিয়ে প্রধান সচিব পি· সি· আলেকজান্দারের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। ভিনদ্রানওয়ালের মানসিকতা কিন্তু লঙ্গোয়ালের ঠিক বিপরীতে। লঙ্গোয়াল যেখানে শান্তির কথা বলেন, ভিনদ্রানওয়ালে ডাক দেন সশস্ত্র আক্রমণের। তিনি মুসলিম শক্তির সঙ্গে আঁতাতে বিশ্বাসী। পাকিস্তান যদি আক্রমণ করেও, তবুও "ক্রীতদাস হয়ে আমরা যুদ্ধ করতে পারব না," বলেন ভিনদ্রানওয়ালে। গ্রামের অশিক্ষিত ও ভূমিহীন শিখদের নানা সাম্প্রদায়িক শ্লোগানে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন তিনি। ১৯৮১ সালে 'পাঞ্জাব কেশরী' কাগজের সম্পাদক লালা জগৎ নারায়ণ হত্যার সঙ্গে তিনি যুক্ত বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিরঙ্কারী নেতা বাবা গুরুচরণ সিংকে দিল্লীতে হত্যার পেছনেও ভিনদ্রানওয়ালের হাত আছে। তিনি নিজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা স্বীকার না করলেও, হত্যাকারীদের উদ্দেশে বলেছেন যে, তাদের সোনা দিয়ে ওজন করা উচিত। ভিনদ্রানওয়ালের নীতি হল কোনো শক্তি বাধা দিলেই তাকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার। কোনোরকম ব্যক্তিগত মুচলেকা বা বেল ছাড়াই তিনি যে জেল থেকে ছাড়া পান, তার কারণ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সেরকম কোনো অবস্থা হলে 'রক্তগঙ্গা' বইয়ে দেব্যর কথাও তিনি ভাবেন—তাঁর সাম্প্রদায়িকতা এতটাই উগ্র।

প্রকাশ সিং বাদল : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আকালীদের মধ্যে নরমপন্থী। তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধীর উচিত পাঁচ বা সাতজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির এক কমিশন গঠন করে আমাদের দাবির যাথার্থ্য বিচারের কাজ সেই দলের ওপর দেওয়া। সেই ব্যক্তিরা পাঞ্জাবী বা শিখ নাও হতে পারেন—সেটাতে বাদলের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সেই কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে এবং আমরা তা মাথা নত করে মেনে নেব। কিন্তু বাদলের এই নরমপন্থা খুব একটা কার্যকর হবে না, কারণ সংখ্যালঘু উগ্রপন্থী ভিনদ্রানওয়ালের সমর্থন পাওয়া মুশকিল—অন্তত এই ধরনের ফরমুলায়। বাদল অবশ্য ভিনদ্রানওয়ালেকে কোনোভাবেই সমর্থন করেন না। এবং আকালী নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনি ভিনদ্রানওয়ালের কাছে যাননি।

গুরুচরণ সিং তোহ্‌রা শিরোমনি গুরদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির (এস· জি· পি· সি·) সভাপতি। শিখদের যত ধর্মস্থান আছে—তাদের প্রধান নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা। তোহ্‌রা পরিচালিত এই সংস্থা সম্পূর্ণভাবে ভিনদ্রানওয়ালের সমর্থক। তোহ্‌রা গত ১৩ বছর ধরে এস· জি· পি· সি·-র সভাপতি। এই পদাধিকার হারাতে চান না বলেই প্রথম থেকে তিনি ভিনদ্রানওয়ালেকে সমর্থন করছেন। তিনি বলেন, দরবারা সিং-এর সরকার উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবার কথায় কেন জোর দেন বুঝি না, কারণ দরবারা সিং-এর সরকারই তো আমাদের সম্পর্কস্থাপনে আগে উৎসাহী ছিলেন। উগ্রপন্থীরা তো কংগ্রেস (ই) তৈরি করেছে, সুবিধামতো তাদের ব্যবহার করা তো তাদেরই শেখানো।

পাঞ্জাব সমস্যা মেটাবার জন্য আজ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যস্থতায় অংশ নিয়েছেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং, পি· ভি· নরসিংহ রাও, জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা, পি· সি· শেঠি, কংগ্রেস (ই) এম· পি· আমরিন্দার সিং, সি· পি· এম-এর এম· পি· হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, এমন কি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শিবচরণ মাথুরও।

আকালীদের দাবি আকালীদের দাবি যদিও এক নেতা থেকে অন্য নেতায় ভিন্ন অগ্রাধিকার পায়, তবুও দুটি প্রধান ব্যাপার হল (ক) পাঞ্জাবের নদীগুলোর জল বণ্টন—বিশেষ করে শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতীর জলের সিংহভাগ পাঞ্জাবের প্রাপ্য, (খ) চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের রাজধানী হিসেবে দিতে হবে। অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম—(গ) অমৃতসরকে 'পবিত্র শহর' বলে স্বীকৃতি ; যদিও সরকার স্বর্ণমন্দিরের ২০০ মিটারের মধ্যে সিগারেট বা মাদকদ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন, আকালীরা চায় গোটা শহরটাতেই এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হোক ; (ঘ) স্বর্ণমন্দির থেকে এখনকার ৯০ মিনিটের বদলে তিন ঘণ্টা 'গুরুবাণী' (ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ) প্রচার ; (ঙ) ভিনদ্রানওয়ালের ২০ জন সমর্থকের মুক্তি ও (চ) বম্বে-অমৃতসর 'ফ্লাই মেইল'-এর নাম বদলে 'স্বর্ণমন্দির এক্সপ্রেস' করা।

কথোপকথন

প্রতিক্ষণের তরফ থেকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী দরবারা সিং এর এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছে ২১ শে জুলাই, ১৯৮৩ সকাল সাড়ে ন'টায়। চণ্ডীগড়ের দু'নম্বর সেক্টরে, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বপ্না দেব এবং সুমিত্র দেশপান্ডে

পাঞ্জাব সমস্যা সমাধান কীভাবে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

এই সমস্যার দুটো দিক আছে—একটা প্রশাসনিক, অন্যটি রাজনৈতিক। প্রশাসনিক দিক থেকে আমরা ঘটনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক বিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে সেদিকে লক্ষ রেখে আমরা এই সমস্যা মেটাবার চেষ্টায় রত। কারণ এখানে সম্প্রদায়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। শিখদের ভেতর আকালীদের একটি অংশই কেবলমাত্র এই প্রচার চালাচ্ছে বা বলা যায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ব্যস্ত। এটা হলো একটা দিক।

অন্যটি রাজনৈতিক। বর্তমান সরকার এটা ভালোভাবেই জানে, তিন বছর ধরে জনসংঘের সঙ্গে মিলে আকালী দল পাঞ্জাবে সরকার চালিয়েছে এবং তখন তারা আজকের এই দাবীগুলো নিয়ে একটা কথাও বলেনি কিন্তু। যে সমস্যাগুলো এখন তুলে ধরা হচ্ছে, সেগুলো তখনও ছিল। কিন্তু সে সময়ে কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি, কারণ তারা সরকারের অংশ। তাছাড়া কেন্দ্রেও তাদের বন্ধু জনতা সরকার থাকা সত্ত্বেও চণ্ডীগড়ে জনসংঘের শরিক থাকলেও বর্তমান দাবী নিয়ে কোনো কথা শোনা গেল না। তারা তো অতি সহজেই কেন্দ্রের কাছে অসন্তোষের কথা বলে মিটিয়ে নিতে পারত সব কিছু। কিন্তু সে তাদের লক্ষ্য নয়। আসলে এদের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা দখল করা। আকালী দল চায়, যেনতেন প্রকারেণ গদিতে আসতে — কোন পথে তা হাসিল করবে সেটা বড় কথা নয়, ফল পেলেই হলো।

কিন্তু একলা আকালীদের পক্ষে এই মুহূর্তে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব, যদি না বি.জে.পি বা সেই দিক থেকে জনসংঘের সঙ্গে তারা আঁতাত না গড়ে। চণ্ডীগড়ে একটি রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে নিজেদের ক্ষমতায় তারা

নিজেরাই অবিশ্বাসী। শেষবার জনসংঘ সমর্থন না দেবার ফলেই কিন্তু সরকারের পতন ঘটে।

যাতে ১৯৮৫ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত টানা যায়, এমন একটা মনোভাব নিয়েই তারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, পাঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও আন্দোলন চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু মোটামুটি সব ধর্মীয় দাবীগুলোই মিটিয়েছেন। এলাকা হস্তান্তর ও জলবণ্টনের সমস্যার ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বহুবার বলেছেন যে, তারা এসে আলোচনা করে, সব দাবীগুলোর বিভিন্ন দিক যাচাই করে, সমস্ত যুক্তি বুঝে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সেটাই চূড়ান্ত কিন্তু তারা সমাধান চায় না, ফের ক্ষমতায় আসবার জন্য তাদের প্রভাব ছড়াবার জন্য এই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখাটাই তাদের কাজ। তাই সমস্যাকেও তাদের তৈরি করতে হয়।

প্রশ্ন আকালী দল যে কিছুদিন আগে সাময়িক আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আকালী দলের জনসমর্থন হারাবারই কি সঙ্কেত তা ?

উত্তর আগেই বলেছি ধর্মীয় দাবীগুলো নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। আর ভৌগোলিক সীমানা ও জলবণ্টনের ব্যাপারটা অহেতুক চাগিয়ে রাখা হচ্ছে। আকালী দলের ভেতর অনেক ভাগ এবং তারা একে অন্যের সঙ্গে কোঁদলে লিপ্ত ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য। একদল যদি সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান চায়, অন্য গোষ্ঠী বেঁকে বসে।

আন্দোলনে নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে আপনার কী মূল্যায়ন ?

উত্তর তিনটে গোষ্ঠী আছে। প্রথম গোষ্ঠী ভিনদ্রানওয়ালের। এই লোকটি সবকিছু সম্পর্কেই অতিমাত্রায় গোঁড়া। সে মনে করে জোর করে সব কিছুই পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখা যায়। তার প্রকাশিত মন্তব্য এবং ভাবভঙ্গী থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, কোনোরকম সমাধানেই তার অরুচি। তার সমাধান শুধু বন্দুকের ভয় দেখিয়ে। শিখ মতবাদে এ এক ধ্বস্ত চেহারা। কারণ, শিখ মতানুযায়ী গুরদুয়ারাতে একমাত্র নির্দোষ মানুষদেরই আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে হচ্ছে উল্টোটা। খুনীরা গুরদুয়ারার সংলগ্ন এলাকাতে আশ্রয় নিচ্ছে·····

গুরদুয়ারার সংলগ্ন এলাকায়, গুরদুয়ারার ভেতরে নয় ?

উত্তর আসলে গুরদুয়ারার এলাকা শুরু হয় সেই বিন্দু থেকে যেখানে আমরা জুতো খুলে পা ধুই। সেইখান থেকেই আসল এলাকার শুরু। বাইরের অপবিত্রতা সেখানে অনুপস্থিত। কিন্তু জুতো পরে প্রকর্মর ভেতরে যাওয়াটা মানা। কিন্তু সেই এলাকার চতুষ্কোণের বাইরের সঙ্গে গুরদুয়ারার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ গুরু নানক নিবাস এই এলাকার বাইরে। শিরোমণি গুরদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির যাঁরা সদস্য তাঁরা মিটিঙে এলে বা এমনি এলেও তাঁরা বিশ্রামের জন্য সেখানে থাকতে পারেন।

কিন্তু এই লোকটি তার সমস্ত বন্দুকধারী প্রহরী, বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঐ বাড়িটি দখল করে আছে। সে বলতে পারে—না, আমি তো কিছু করি নি। সে কিছু না করেও থাকতে পারে। কিন্তু ওখানে বহু লোক আছে, যারা খুনে। এই হলো এক গোষ্ঠী।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী বলতে গুরচরণ সিং তোহরার গোষ্ঠী। তিনি শিরোমণিগুরদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি। যে সব নেতা আছেন, তাঁদের ভেতর ইনিই সবচাইতে চতুর। তিনি রাজ্যসভারও সদস্য। শিরোমণি গুরদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি থেকেই তিনি আকালী দলের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল ও তাঁর সহচরদের তথাকথিত মধ্যপন্থাকে হটাতে না পারলে তাঁর পক্ষে সেই পদাধিকার রাখা সম্ভব না। এই মধ্যপন্থীরা কোনো রকমে একটা মীমাংসায় আসতে চায়। উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেলে ক্ষমতাও বাড়বে এবং বি. জে. পি-র সাহায্যে ক্ষমতা দখল তখন সহজ হবে। তোহরার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করিয়ে, তোহরাকে হারিয়ে প্রবন্ধক কমিটিকে নিজেদের দখলে আনা। প্রবন্ধক কমিটি ও আকালী দল যদি বাদলের হাতে আসে, তবে তারাই সবচাইতে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী হতে পারে। তাই আন্দোলন চালিয়ে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, যাতে মনে হওয়া সম্ভব, সমস্যার আর শেষ নেই। যার নেতৃত্বে এই কাজটা চলছে, তার নাম ভিনদ্রানওয়ালে। শান্তির পথে প্রধান অন্তরায় সে-ই। আর তারই সৃষ্ট অবস্থাকে অন্যরা কাজে লাগাচ্ছে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে।

লঙ্গোয়াল হলো তৃতীয় গোষ্ঠী। তিনি সহৃদয়, ভালো মানুষ। কিন্তু এখন, এসব লোকের পাশে, তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই। তাঁকে এখান থেকে ঠেলা দিচ্ছে, উনি অন্যদিকে যাচ্ছেন; অন্যদিক থেকে ঠেলা দিচ্ছে, তিনি এদিকে আসছেন।

ভালো মানুষ হয়েও সমস্যা সমাধানে তিনি অপারগ বলেই, তিনি বাদল, তোহরা বা ভিনদ্রানওয়ালের ওপর নির্ভরশীল।

শুনেছি, বাদলই নাকি একমাত্র নেতা যিনি ভিনদ্রানওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন নি ?

উত্তর উল্টোটাই বরং ঠিক। ভিনদ্রানওয়ালেই দেখা করতে চান নি বাদলের সঙ্গে।

প্রশ্ন পাঞ্জাবের মন্দিরে, ধর্মের নামে, আসামীদের আশ্রয় দেবার যে বেআইনী কাজ চলছে, সেটা কি কোনোভাবেই বন্ধ করা যায় না ?

উত্তর প্রশাসনিক দিক থেকে এটাই প্রধান সমস্যা। এটা ছাড়া অন্য কোন সমস্যাই নেই। বাইরে যারা নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে, আমরা তাদের পেছনে লেগে আছি। প্রশাসনিক কারণেই সমস্ত ব্যবস্থার কথা এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না—কারণ এতো খোলাখুলি বলার অসুবিধে আছে। আমরা জানি, গুরদুয়ারায় অনেকে আশ্রয় নিয়েছে যারা ভালো লোক নয়। কিন্তু আমরা গুরদুয়ারাতে এই সময়ে প্রবেশ করতে চাই না।

কিন্তু তাহলে কি কোনো সমাধানই নেই ?

উত্তর নিশ্চয়ই সমাধান সম্ভব। কিন্তু আগেই বলেছি, যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তার সমস্ত কিছু আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা এ জিনিস চলতে দেব না। আমরা এ ব্যাপারে সজাগ।

খালিস্তান মানে, যেখানে শুধু 'খলিস'-রাই থাকবে। এটা শব্দটির অপব্যবহার। খালিস মানে পবিত্র। সেটা তো শিখ ছাড়া অন্যরাও হতে পারে। কিন্তু কায়দা করে শিখ অসন্তোষের সঙ্গে এই খালিস্তান আন্দোলনকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আকালীদের ভেতর চরমপন্থী ভিনদ্রানওয়ালে ও বাইরে বসে চৌহান এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

আর দল খালসা ?

দল খালসা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আকালীদের সঙ্গে লড়বার জন্যই প্রথমে দল খালসা গড়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা এখন সেই শক্তিদেরই চরিত্র পেয়ে যাচ্ছে। অপ্রত্যক্ষভাবে খালিস্তান আন্দোলন কিন্তু এরা সকলেই সমর্থন করে। মুখে কিন্তু খালিস্তান বিরোধী এরা। যারা পড়াশোনা করে নি, চাকরি পায় নি, জীবনে সবক্ষেত্রেই অসফল, সেই অসন্তোষ নিয়েই তারা এই দলে এসে ভিড়েছে। শিখ জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন—এ ধরনের শ্লোগান দিয়েও সরল সাধাসিধে মানুষদের ঠকানো হচ্ছে আন্দোলনের নামে।

এই মুহূর্তে আমি এই আন্দোলনের চেহারাকে ছোটও করছি না, বড়ও করে দেখছি না। শুধু বলব যে, শিখদের মাত্র ২০ শতাংশ লোক এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গুরদুয়ারার কাজে প্রায় হাজার দশেক লোক নিযুক্ত। তারা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনকে সহজেই এ ব্যাপারে কাজে লাগান যায় ইচ্ছেমতো। গুরদুয়ারা কমিটির আর্থিক বাজেট এখন বছরে ছ'কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। তা আরও বাড়বে। আমি সমালোচনা না করেই বলছি, এই অর্থ প্রকৃত বাঞ্ছিত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে না। আর এর পেছনে আছে এক সামান্য অংশের সমর্থন। লঙ্গোয়াল মনে করেন, যখনই তাঁরা সরকার গড়লেই তাকে বাতিল করবার একটা চক্রান্ত দানা বেঁধেছে। এতে তাঁদের মানসিকতাটা বোঝা যায় অনেকটা। অর্থাৎ, ক্ষমতায় এসে নিজেদের ইচ্ছেমতো সরকার চালাতে চান তাঁরা। অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের অসহিষ্ণুতাও প্রবল। দাবী আদায়ে তারা যত না ইচ্ছুক, তার চাইতে বেশি প্রবণতা ক্ষমতায় আসার।

আপনার কী মনে হয় খালিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ আছে ?

আমি এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলব না। তবে এটুকু বলা যায়, হ্যাঁ, এ অভিযোগ সত্যি।

আর আমেরিকার ভূমিকা ?

হ্যাঁ, আমেরিকার মতো দেশ চায়, ভারতবর্ষ আরও বেশি করে ভাঙুক। আর এ ধরনের আন্দোলন দেশের এক জায়গায় শুরু হলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে অন্য দিকে। আমার মনে হচ্ছে, বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাসের এক ঢেউ আসছে। পাকিস্তান এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এ আন্দোলনকে নানা সাহায্য দিয়ে লালন করতে চায়—এখান থেকে পাকিস্তানে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের নানা অযাচিত সুযোগ সুবিধে দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে এক অনুকূল মানসিকতা তৈরি করতেই এই চাল।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বকে ক্রমাগত যে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, সেটাকে উদাহরণ হিশেবে দেখিয়ে কি অন্য সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীরা চাপ সৃষ্টি করতে পারে না ?

হ্যাঁ, কিছু লোক উৎসাহ পাচ্ছে, যেমন আসাম থেকে এরা প্রেরণা পেয়েছিল।

আপনার রাজ্যে বিরোধীদের ভূমিকা কি ?

হরকিষণ সিং সুরজিৎ তো মধ্যস্থতা করছেন ?

করছেন, কিন্তু সব আলোচনাতেই তাঁকে নিজের দলের স্বার্থের কথাই মনে রাখতে হচ্ছে। অবশ্য সব নেতাই তা করবেন। কিন্তু এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না।

চার পাঁচটি দল আছে। এক তো গেল আকালী। দ্বিতীয় সি· পি· আই। তারা অবস্থার সঠিক মূল্যায়নে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বুঝতে পেরেছেন। তারা বলে, আমরা অসংহতির বিরুদ্ধে, আমরা খালিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে, এবং তারা হিংসাত্মক ঘটনারও বিরোধী। তারা খোলাখুলি এ কথা বলে এবং জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট আগ্রহী। অন্য শক্তি হলো সি· পি· এম। তারা কখনও কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলে, কখনও ভিনদ্রানওয়ালের বিরুদ্ধে গলা চড়ায়। কিন্তু মূলত তারা আকালী দাবীর সমর্থক।

বি· জে· পি· ?

বি· জে· পি· এ রাজ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। একজন বিধায়ক আছে এবং সেও নির্বাচনের পর যোগ দিয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো দল নেই।

পাঞ্জাব এবং আসাম আন্দোলনের মধ্যে কি কোনো মিল আছে ?

কোনো মিল নেই। শিখরা বলছে, তারা আলাদা দেশ চায়—যেটা অন্য ভারতীয়ের কাছে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর আসামে লোকদের সমস্যা ছিল কিছু লোককে তাড়ানো।

কিন্তু "কম" মানে কি ?

কম মানে দেশ।

কিন্তু ল'ঙ্গোয়াল সম্প্রতি বলেছেন, "কম" মানে জাতি

"কম" মানে জাতি ? এতো আরও খারাপ কথা। জাতি ? কীভাবে তা জাতি হবে ? তারা কোথা থেকে এসেছে ? জাতি মানে তো তাদের উদ্ভব অন্য কোথাও হবে—তাহ'লে তারা কী অন্য কোথাও থেকে এসেছে ? একটা দেশে নানা গোষ্ঠী থাকে—সেটাই দেশ। আমাদের নানা গোষ্ঠী—শিখরা ধর্মভিত্তিক, হিন্দুরা ধর্মভিত্তিক, খ্রীষ্টানরা ধর্মভিত্তিক। কিন্তু এই সব মিলেই ভারতবর্ষ, দেশ।

আপনি কি মনে করেন কেন্দ্রের শিথিল প্রশাসনই পাঞ্জাব সমস্যাকে আরও গুরুতর করে তুলেছে ?

মনে হয় না, এ কথা বলা ঠিক। কারণ, আসামে একধরনের সমস্যা ছিল, এখানে একধরনের সমস্যা। আগেই বলেছি, মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ পাঞ্জাব আন্দোলনের পিছনে। এবং সাধারণ মানুষ তাদের বলছে যে তোমরা জেলে না গিয়ে টেবিলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করো। কিন্তু গুরদুয়ারার ভেতর থেকেই তাদের উস্কানী দিয়ে পাঠানো হচ্ছে "রাজ করেগা খালসা" শ্লোগান মুখে পুরে দিয়ে।

আনন্দপুর সাহিব সিদ্ধান্তগুলি কী ?

তারা সোজা কথায় একটা আলাদা সংবিধান তৈরি করবার ক্ষমতা চায়। সেটা কি দেওয়া সম্ভব ? বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রাহীন দাবী বলেই আমরা তার বিরোধী। □

শঙ্খ ঘোষ

ভিখিরির আবার পছন্দ

থাক্ সে পুরোনো ক্লাসুন্দি
যুক্তি তর্ক চুলোয় যাক্
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই।

ভাঙবার শুধু সময় চাই
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হব কদিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য!

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ!

ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে।

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ!
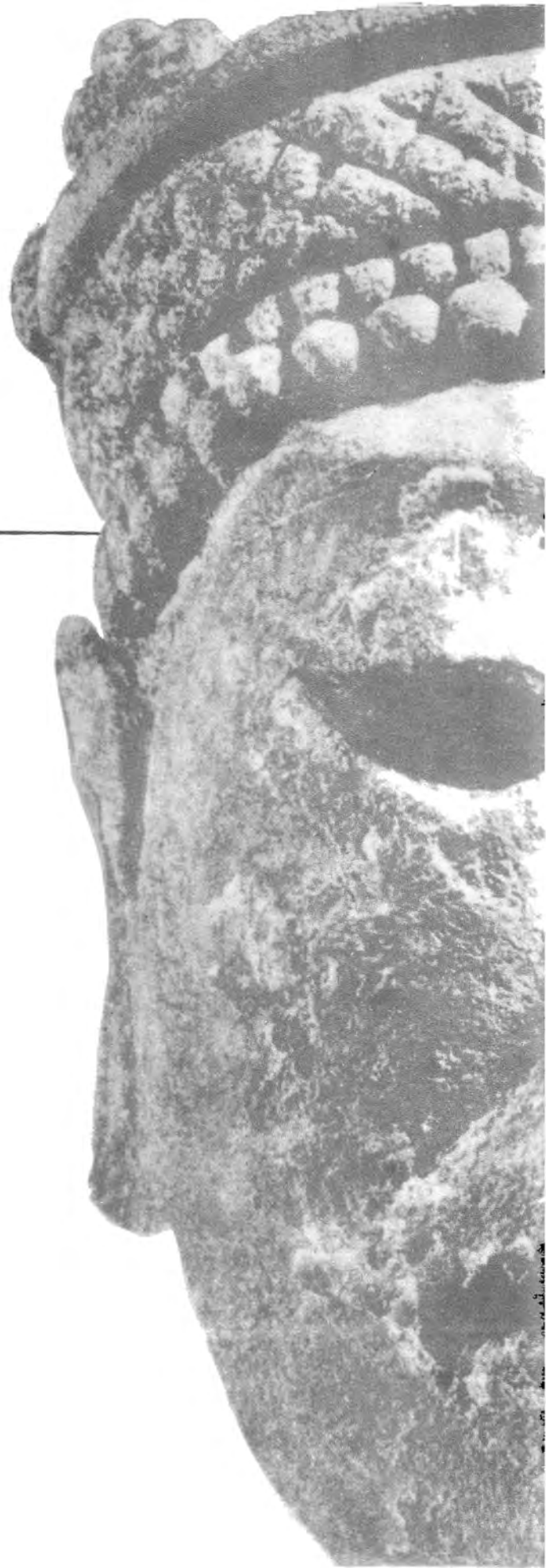
অশথগুঁড়ির জট

সেই সুপুরিগাছগুলিও এখন আর নেই
আমি ভেবেছিলাম
তোমার সঙ্গেই হয়তো কিছু কথা বলা যাবে

কেটে ফেলা কত-না সহজ, মাটির ভিতর গড়িয়ে গড়িয়ে
ধমনী গিয়েছে কতদূর
কেইবা তার খোঁজ রাখতে পারে

ভেঙে ফেলছে পুরোনো দেউড়ি, ভেঙে ফেলছে হাঁপধরা দেয়াল
তার থেকে বেরিয়ে আসছে পরতে পরতে পাকে পাকে
নাছোড়বান্দা অশথগুঁড়ির জট

বললে বলা যায় মহাকাল
বললে বলা যায় এই হলো মুখোমুখি দাঁড়াবার
হেতালের লাঠি

আমি ভেবেছিলাম
তোমার সঙ্গেই হয়তো কিছু আজ
সম্পর্ক দাঁড়াবে

কিন্তু এই বিকেলের বাঁকা আলো নিয়ে
বাতাবাখারির পাশে আপাতত আলতো হয়ে দেখি
ছেঁড়া বাকলের গুঁড়ো মাটি

জানি না কী হতে পারে আজও
ওই ধমনীর পাশে অশথগুঁড়ির গূঢ় জট
আরো একবার যদি রাখি !

মুক্তি বোসকে এত দূর নিয়ে আসা যেন অনুকূলের পক্ষে কোনো দুর্বহ দায়িত্ব ছিল, এখন অন্তত লক্ষ্মীর কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সে দম ফেলতে পারছে। কিন্তু ব্যাপারটা থেকে কেটে যাবার জন্যে সে আর ঘরে ঢুকতে চায় না।

লক্ষ্মী বলে, 'ওঁর সঙ্গে আপনার দেখা হল কোথায়?' যেন মুক্তি বোসের সঙ্গে তাদের এমন দেখাশোনা হয়ে যাওয়ার মতোই সম্পর্ক। মুক্তি বোস একটু হেসে, চোখটা তুলে, আবার চোখ নামিয়ে নেয়। ও-ঘরে ঝিমলির সঙ্গে পিসিমার চাপা কথা শোনা যায়। অনুকূল ততক্ষণে দরজা থেকে বলতে শুরু করেছে, 'উনি আমাদের অফিসে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে একসঙ্গে এলাম,' এই পর্যন্ত বলে কথাটা যেন শেষ হল না, অনুকূল যোগ করল, 'রিক্সায়।'

মুক্তি বোস আবার চোখটা তুলে অনুকূলের দিকে তাকিয়ে নামিয়ে নেয়। মুক্তি বোসের সঙ্গে আসতে আসতে অনুকূল বেশি কথা বলে ফেলার দায়-দায়িত্ব থেকে সরে পড়তে চায় এমনই তার তাড়াহুড়ো।

মুক্তি বোসের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না – আর কারো সঙ্গে তার কোনো কথা আছে, সে ঝিমলিকেই কিছু বলবে। কিন্তু কী বলবে? আজ ঝিমলি ডিভোর্স পেয়ে গেছে বলে কিছু বলতে চায়? কিন্তু, মুক্তি বোস আজ দিয়েছে বলেই ত ঝিমলি পেয়েছে? নাকি নিজের জোরেই ঝিমলি পেয়েছে, মুক্তি বোস দিতে না চাইলেও পেয়েছে, যা পাওয়ার জন্যে এতদিন, দশ-দশটা বছর মামলা করছে সেটা আজ পেয়েছে? তা হলে মুক্তি বোস এল কেন? পিসিমা যখন তাঁর পায়ের কাছাকাছি মুক্তি বোসকে দেখতে পান তখন, 'না না ঠিক আছে বোসো,' বললেও প্রণাম না করে ওঠা যায় না তখন। পিসিমার এক পিসতুতো শাশুড়ীরছেলে মুক্তি বোস। সেই সূত্রে তাঁদের সম্পর্ক বৌদি-দেওরের।

মুক্তি বোস উঠে দাঁড়ায়। পিসিমার বিরাট চেহারার সামনে তাকে একটু ছোটই দেখায়। এই প্রণাম ও উঠে দাঁড়ানোর ফাঁকে পিসিমা তাঁর চোখটা তুলতে পেরেছেন। এখন তিনি সরাসরি মুক্তি বোসকেই দেখতে পান – ছোটখাটো চেহারার প্যান্টশার্ট পরা মুক্তি বোসকে। পিসিমা অর্থহীন স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, 'ভালো আছ?'

'এই আর কি? আপনার শরীর কেমন?'

পিসিমা অভিযোগ করতে ভালোবাসেন না। বললেন, 'ভালো।' তারপরও মুক্তি বোস কিছু বলে না ও দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলেন, 'তুমি কিছু বলবে?' পিসিমার কথাতে এরকম একটা অর্থের সম্ভাবনাও যেন থাকতে পারে যে মুক্তি বোসের কোনো কথা বলার কোনো অর্থ নেই।

পিসিমারও হয়ত ভয় হয় যে তাঁর কথার ওরকম একটা অর্থও হতে পারে। তিনি আবার বলেন, 'তুমি বোস। বসে বসে বল।'

মুক্তি বোস একটু এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, 'আপনি বসুন,'

লক্ষ্মী বেডকাভারটা টেনে বলে, 'এখানে বসুন, পিসিমা,'

'তুমি বোস না। আমি দাঁড়িয়েই শুনছি,' পিসিমা আবার বলেন। লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এ-ঘর থেকে ত এখন পয়সা বের করা যাবে না।

দেবেশ রায়

মুক্তি বোস বসে থাকে চুপচাপ আর দু-এক বার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়; যেন সে এলে এ বাড়িতে যে একটা অস্বস্তির ব্যাপার হবে তা সে জানে ও জানে বলেই সবচেয়ে কম অস্বস্তি তৈরি করতে চায়। অথবা তার কাজটা তার নিজের কাছে এত বেশি দরকারি যে কারো সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবার সময় নেই।

এই ঘরটাতে সেই সময়টি ঘনিয়ে আসে যাতে কারোরই কিছু করার বা বলার থাকে না। অনুকূল দরজা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে বলে ফেলে, 'পা-টা তুলে বসুন না, আরাম করে'

মুক্তি বোস নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝে যেন। তারপর বলে, 'না, ঠিক আছে, ঠিকই আছে ত?' কিন্তু অনুকূলের কথার সম্মানে একটু নড়েচড়ে বসে।

লক্ষ্মী ভিতরের দরজার পাল্লার কাছে গিয়ে ভিতর দিকটা একটু দেখে –ঝিমলি কি চলে গেল।

পিসিমা তাঁর ঘর থেকে বেরোন। যেমন তাঁর সারা দিনের হাঁটা-চলা তেমনি গতিতে হেঁটে আসেন। সেই গতির ভিতর তাঁর অত বড় শরীরের ভারটাই প্রধান। আর একটু রোগা ও খাটো হলে পিসিমা বোধহয় তাঁর নিজের মতো চলাফেরা করতে পারতেন।

পিসিমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়ার জন্যে লক্ষ্মীকে ঘরের ভিতর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। পিসিমা সোজা চৌকিটার শেষ পর্যন্ত যান। তার আগেই তাঁকে দেখে মুক্তি বোস উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। ইচ্ছে করলে পিসিমা আগেই দাঁড়াতে পারতেন। কিন্তু তিনি যেন মুক্তি বোসের আরো কাছাকাছি যেতে চান। অথবা তাঁর চোখটা মেঝের ওপর ফেলা ছিল বলে তিনি মুক্তি বোসকে আগে দেখেননি।

মুক্তি বোস একটু এগিয়ে এসে পিসিমাকে প্রণাম করতে যায়। ওখানে দেয়ালের দিকে ট্রাঙ্ক সাজানো ছিল। একদিকে ট্রাঙ্ক আর একদিকে চৌকির মাঝখানের ফাঁকটা প্রণামের জন্যে নিচু হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রণাম করতে যাওয়ার সময় বা করে ওঠার সময় মাথায় ঠোকর লাগতে পারে। অনুকূলকে পাঠাতে হবে **মিষ্টি** আনতে। প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে দেখে অনুকূল নেই। পিসিমার ঘরের ভিতরে চৌকিতে চুপচাপ বসে ঝিমলি জানলার দিকে তাকিয়ে। বারান্দায় খুঁটির পাশে উঠোনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বিপুল। লক্ষ্মী বিপুলকে বলে, 'দেখ ত তোর বাবা কোথায়, বোধহয় বাইরে, অফিস থেকে এসে ত খেলও না।'

বিপুল একটা লম্বা লাফে বারান্দা থেকে নামে। লক্ষ্মী পিসিমার ঘরে ঢুকে ঝিমলিকে বলে, 'কি ব্যাপার? উনি কিছুই ত বললেন না! কী করবে তুমি?

ঝিমলি জানলার দিকে তাকায়। তারপর লক্ষ্মীকে বলে, 'দেখি, পিসিমা আসুন।' আবার লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বলে, 'নাকি, আমি চলে যাই, আর দশ মিনিট আছে বাসের, তুমি বরং বলে দিও কথাটা বলেও উঠে দাঁড়ায় না ঝিমলি। তার জীবনের অনিশ্চয়তা সে কিছুটা বুঝে নিতে পেরেছে বা তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু আন্দাজ পেয়েছে। তাতে মুক্তি বোসের এমন আসার ফলে যে নতুন নতুন অভাবিতের সঞ্চার ঘটবে ঝিমলি তা থেকে সরে যেতে চায়। ঝিমলি অভাবিতের জন্যে আর প্রস্তুত হওয়ার সাহস পাচ্ছে না। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী এসে তার ঘাড়ে হাত দেয়। আস্তে বলে, 'বোসো। এখানে আমরা সবাই আছি। পিসিমা আছেন। কিছু ভেবো না।'

ঝিমলি আবার আস্তে বসে আর লক্ষ্মীর হাত তখনও তার ঘাড়ে থাকে। ঝিমলির ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে এ বাড়ির কেউ ত এমন সরাসরি যুক্ত ছিল না, হয়ত যুক্ত নেইও। আর সমস্যাটা তেমন হয়ে উঠলে ঝিমলিকে হয়ত একাই যা করার করতে হবে। কিন্তু এখন বাস ধরে কোথাও যাবে হয়ত ঝিমলি, কোথাও হয়ত তাকে যেতে হবেই, কিন্তু সেটাও ত তার কাছে এত নির্দিষ্ট নয় যার ওপর ভিত্তি করে সে তার সমস্ত ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলতে পারে। তার পরিস্থিতির সামগ্রিক অনিশ্চয়তায় মুক্তি বোসের আসার মতো এমন আকস্মিকেরও একটা জায়গা বোধহয় থেকে যায়। ঝিমলি লক্ষ্মীর দিকে চোখ তুলে বলে, 'কী চায় কী? একা এসেছে?'

লক্ষ্মী বলে, 'কিছুই বুঝতে পারলাম না। ওর সঙ্গে কোনো কথা

হয়েছে কিনা জানি না। যাই বলুক, মাথা গরম করো না। শুনে যেও–

'একা এসেছে?'

'হ্যাঁ, একাই ত'

ঝিমলি আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। লক্ষ্মী ঝিমলির কাঁধ থেকে হাত তুলে দরজায় যায়। অনুকূল আসছে, পেছনে বিপুল। লক্ষ্মী একবার তার ঘরের দিকে তাকায়। তারপর এই ঘরের ভিতর অপেক্ষা করে। অনুকূল এসে দরজায় দাঁড়ায়। লক্ষ্মী তাকে ঘরের ভিতর আসতে বলে। কিন্তু এ ঘরের ভিতরে তাদের দুজনের দাঁড়াবার মতো জায়গা ছিল না। ঘরের একটা পাশ জুড়ে চৌকি। তারও এক দিকে কৌটোকাটা। আর একটা পাশে এক লাইনে কিছু বস্তা। পিসিমার সামান্য ধানি জমি আছে। আর বাকিটা জুড়ে কৌটোকাটা ইত্যাদি। অনুকূল দরজার কাছে দাঁড়ায়। লক্ষ্মী বলে, 'শোন, তোমার কাছে টাকা আছে? একটু মিষ্টি নিয়ে এসো, ও ঘর থেকে ত টাকা বের করা যাবে না'

ঝিমলি ডেকে বলে, 'লক্ষ্মী, আমার কাছে আছে, নাও না–'

'আরে না না আমি নিয়ে আসছি', বলে অনুকূল ঘর থেকে বেরতে যায়। লক্ষ্মী তাকে ডেকে বলে, 'তোমার সংগে ওর রাস্তায় কোনো কথা

হয়েছে?'

ঝিমলিও উঠে দাঁড়ায় অনুকূলের কথা শুনতে। অনুকূল তাড়াতাড়ি বলে উঠে, 'না, না, আমি ত কিছুই জানি না'

'তুমি জান কে বলেছে? তোমাকে উনি কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন?'

'আরে, তুমি মিছিমিছি দাদাকে ধমকাচ্ছ কেন?' ঝিমলি বলে ওঠে।

লক্ষ্মী একটু হেসে ফেলে বলে, 'দেখো না, তখন থেকে যেন চোর ধরা পড়েছে। তোমার কি? তুমি ও রকম করছ কেন?'

অনুকূল বলে, 'উনি আমার অফিসে গিয়ে নিচে থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি ত বিশ্বাসই করিনি। পরে জানলা দিয়ে দেখি সত্যি। আমি নেমে আসতেই বললেন, তোমাদের বাড়িতে বৌদির সংগে একটু দেখা করতে যাব।' অনুকূল থেমে যায়। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কী বললে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন। আমি বড়বাবুকে বলে চলে এলাম। উনি রিক্সা ডাকলেন। উঠে পড়লাম।'

'রাস্তায় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?' লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, ঝিমলি আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন।'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম ও ত থাকে না, কাজ হয়ে গেলে সেদিনই চলে যায়। আছে না চলে গেছে বলতে পারব না,' অনুকূল বলে।

'বা বা, তুমি ত সব একেবারে ঠিকঠাক জবাব দিয়েছ, যাও, এখন খাবারটা নিয়ে এস আর বাড়িতেই থেক–' লক্ষ্মী বলে।

'বাড়িতেই ত আছি, আবার কোথায় যাব', অনুকূল বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে বলে।

লক্ষ্মী হেসে ফেলে, 'না, বাড়িতে এত গোলমাল দেখে হয়ত সরে পড়লে।'

কথা শেষ করে লক্ষ্মী ঝিমলির দিকে তাকিয়ে হাসে। ঝিমলিও একটু হেসে বলে, 'তুমি মিছিমিছি বকছ কেন – ।'

বাইরে পিসিমার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। লক্ষ্মী ও ঝিমলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু দরজার দিকে এগোয় না। বাড়িটা এত ছোট যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বললে ও-ঘর থেকে শোনা যাবে।

পিসিমা এসে ঘরের চৌকাঠ ধরে সামলে নিজের ঘরে ঢোকেন। একটু দাঁড়িয়ে বলেন, 'ও তো ও ঘরে একা থাকল। অনুকূল বসুক একটু–'

'ও ত খাবার আনতে গেল,' লক্ষ্মী বলে।

পিসিমা মাথা ঘুরিয়ে বলেন, 'তা হলে?'

'আমি যাচ্ছি। কিন্তু যা নোংরা শাড়ি–'

'ব্যাপারটা কি? আমার ত বাস ছেড়ে দিল বোধহয়।' পিসিমা ধীরে ধীরে তার ঘাড়টা সোজা করে ঝিমলির দিকে তাকান, 'তোর ত আজ আর যাওয়া হবি না। নয় ত ওর সংগে কথা না বলি এখুনি চলি যাতি হয়।'

'কী কথা বলবে, বলতে চায় কী?' লক্ষ্মীই প্রশ্নটা করে।

'সেটা ত আর ও আমাকে বলে নাই। আমিও শুনতে চাই নাই। আমাকে বলল, আপনারা হয়ত ভাবিছেন আমিই আজ মামলা তুলে নিয়েছি বলে রায়টা হয়ে গেল। আমি তা তুলি নাই। নতুন ম্যাজিস্ট্রেট কিছুতেই কারো কোনো কথা শুনল না।'

'তা নিয়ে আবার কথা বলার কী আছে। আমার মামলা আমি জিতেছি। কে জেতাল কে হারাল সে সব কথা কোথেকে আসে?' ঝিমলি একটু চাপা রাগে বলে ওঠে।

'আমি সে কথা মুক্তিকে বলেছি। বললাম, দশ-দশটি বচ্ছর তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। ছেলেটিকে একবার চোখের দেখাও দেইখতে দাও নাই। আজ আসি ফটাস করি কচ্ছ কথা আছে। তা সে যদি কথা কইতে না চায়, তা হলি কিন্তু তোমাকে চলি যাতি হবে। আমি কুনো জুরা জুরি কইরতে পারবনি। এখন, ঝিমলি কও, যাবা কি যাবা না, কথা কবা কি কবা না। তবে কথা কইলি তোমার আর আজ যাওয়া চলে না। এক কথায় আরিক কথা আসবি। সে তুমি দেখ। যদি কও কথা কবা না, আমি গিয়া বলি আসি, না, ঝিমলি কথা কবে না; তা দেখো, কও, কি করবা কও'

এমন অবস্থায় খুব অল্প সময়ের ভিতর অনেক কথা ভেবে নিতে হয়। কে কতটা ভাবতে পারে তা নির্ভর করে ভাবার অভ্যাস ও ক্ষমতার ওপর। কিন্তু আসলে হয়ত এ সব পরিস্থিতিতে কে কী করবে সেটা ঠিক হয়েই থাকে। ঝিমলি যে মুক্তি বোসের সংগে দেখা করবেই এটা ঠিক না থাকলে দশ-দশটি বছর পর মুক্তি বোসের পক্ষেই কি সম্ভব হত ঝিমলির সংগে দেখা করতে এই বাড়িতেই আসা। দশ বছর ধরে বংশী ছিল বলেই মুক্তি বোসের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হয়নি। দশ বছর পর মামলায় ঝিমলি আজই ডিভোর্স না পেলেও হয়ত মুক্তি বোস আসত ঝিমলির সংগে দেখা করতে। কারণ এখন আর বংশী নেই। মামলার নিষ্পত্তিটা যে আজই ঘটেছে সেটার সংগে এই সাক্ষাতের কোনো সম্বন্ধ হয়ত নেই। বা হয়ত আছে নেহাতই একটি সামান্য উপলক্ষের বা বাধার সম্বন্ধ।

ঘটনার এই পূর্বনির্দিষ্টতা মেনে নিলে ঝিমলির পক্ষে ত আর পিসিমার ঘর থেকে লক্ষ্মীর ঘর পর্যন্ত এই কয়েক পা আসা সম্ভব হত না। তাই এই ছাঁচের ভিতর ঢোকার আগেও তাকে এক নেহাত ব্যক্তিগত, প্রায় গোপন সত্যের কৈফিয়ত নিজের কাছে দিয়ে নিতে হয় যে হয়ত মুক্তি বোস ছেলে সম্পর্কে নতুন কোনো প্রস্তাব দিতে এসেছে। এই কৈফিয়তটাও ত তার নিজের মনকে চোখ ঠেরেই দিতে হয় – তাদের ছেলে সম্পর্কে মুক্তি বোসের এমন দায়িত্ব হঠাৎ জাগার কারণ কি? ছেলের তরফ থেকেই যদি তেমন প্রয়োজন তৈরি হত, গত দশ বছরে কখনো, তা কি ঝিমলি জানতে পারত না? যদি না মুক্তি বোস সেই জানা অসম্ভব করে তুলে থাকে! কলকাতার কাছে যে হস্টেলে তাদের ছেলেকে মুক্তি বোস রাখে সেখানে অনেক চেষ্টা করে ঝিমলি দেখেছে – স্বামীজিরা ছেলের সংগে তাকে দেখা করতে দেননি। এমন ইংগিতও সে পেয়ে আসছে, ছেলের অনিচ্ছেতে তার সংগে ছেলের দেখা হওয়া সম্ভব নয়। যেন, ছেলের ইচ্ছে থাকলেও, ঘটতে পারত। অথচ ডিভোর্সের মামলার আগে যে জুডিসিয়াল সেপারেশনের মামলা ঝিমলি জিতেছে তাতে ছেলে সম্পর্কে তারও আইনী অধিকার ছিল। সে আইনী অধিকার কার্যকর করতে হলে ঝিমলিকে আরো মামলা লড়তে হত। তখন উকিল পরামর্শ দিয়েছিল, ডিভোর্সের মামলাতেই এ সব কথা তোলা যাবে। সে সব কথা উঠেওছে। আজকের রায়ে তার ব্যবস্থা কী হয়েছে তা সবটা ঝিমলি জানে না। তাই কি জানাতে এসেছে মুক্তি বোস? তাই বুঝি জানাতে এসেছে মুক্তি বোস! তাই নিশ্চয়ই জানাতে এসেছে মুক্তি বোস।

মাত্র এইটুকু আসতে আসতে, এই কয়েক পা হাঁটতে হাঁটতে ঝিমলির অপ্রস্তুতি কেটে যায়। আইনেরই একটি ব্যবস্থা হিসেবে যেন এই দেখা ঘটছে আর এ দেখায় আইনের ব্যবস্থা নিয়েই যেন শুধু কথা হবে।

তার আর মুক্তি বোসের মধ্যে বংশীর মৃত্যুর সদ্য-অতীত নতুন সংযোগের সুযোগ করে দেয়নি, আইনের বর্তমান বা ছেলের ভবিষ্যতের নেহাত অনতিক্রম্য সংযোগটুকুর কারণেই দশ বছর পরের এই দেখা – এমন ভেবে নিতে পারায় ঝিমলির পক্ষে সহজ হয় লক্ষ্মীর ঘরে ঢোকা।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঝিমলি দরজাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে, প্রায় হেলান দিয়ে, কিন্তু এ-পাল্লায় হেলান দেয়া যায় না বলেই আলগা ছুঁয়ে থাকে পিঠটায়। যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে ঝিমলির দিকে তাকাতে বসে-বসে মুক্তি বোসকে পুরোটা ঘুরতে হতো। তেমন ঘোরা সম্ভব নয়। নইলে, বাঁ পাটা চৌকির ওপর তুলে ঘুরতে হয়। সেটাও না করে, মুক্তি বোস উঠে দাঁড়ায় ও এটা যেন তারই ঘর, এমনভাবে, ঝিমলিকে চৌকি দেখিয়ে বলে, 'বোসো—'

মুক্তি বোস ঝিমলির দিকে সরাসরি তাকাতে পারে, সুতরাং ঝিমলিকেও পারতে হয়। ঝিমলির ডান হাত একটু পেছনে একবার যেন আঁচল খোঁজে। কিন্তু তারপর আর খোঁজে না। ঝিমলিকে কিছু-একটা বলতে হবে। এখুনি বলতে হবে। কিন্তু কোনো রাগ বা সন্দেহের সঙ্কেত রেখে কোনো কথা বলতে চায় না ঝিমলি। মুক্তি বোসের সঙ্গে তার সম্পর্ক এতই আগের যে সে নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া তার ঘটতে পারে না। তবু যে একটা প্রতিক্রিয়া তাকে মনে-মনেও ঠেকাতে হচ্ছে তার কারণ গত দশ বছর ধরে ডিভোর্স আটকে রেখে, আজই সমস্ত আপত্তি তুলে নিয়ে, মুক্তি বোস তাকে অপমান করেছে। যেন, আজ যদি সুযোগ পেত তাহলে ঝিমলিই মামলা তুলে নিত। ঝিমলির উকিলও তাকে এই পরামর্শ দিয়েছিল। ঝিমলি তো আর উকিলের পরামর্শ শুনে মামলা করেনি। উকিলের পরামর্শ শুনে সে মামলা তুলতও না। যখন মুক্তি বোসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েই গেছে ঝিমলি এ-কথাটা তার জানিয়ে দেয়া দরকার। কিন্তু এটা মনে আসতেই নিজেকে আর একটু সামলাতে হয় ঝিমলিকে। সে কোনোভাবেই মুক্তি বোসের ওপর রাগ করতে পারে না।

মুক্তি বোস দাঁড়িয়েই ছিল। ঝিমলি কথা বলছে না দেখে তাকে বলতে হয়, 'আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।' কথাটা বলে মুক্তি বোস থামে। এবার

কি ঝিমলি জিজ্ঞাসা করবে, কী কথা। কিন্তু কথাটা তো বলবে মুক্তি বোস। ঝিমলির অপেক্ষা ছাড়াই।

মুক্তি বোস আবার শুরু করে, 'আজকের মামলাতে ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের কোনো কথাই শোনেনি',

ঝিমলি জিজ্ঞাসা করে ফেলে, 'কী কথা'

'মানে আমাদের উকিল এতদিন যেভাবে মামলা করেছে, আজও সেইসব আরগুমেন্টই দিচ্ছিল, কিন্তু এই নতুন ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আরো রেগে গেলেন'

'মামলা তো একদিন শেষ হবেই—'

'না। তুমি হয়ত ভাবতে পার যে আমরা ইচ্ছে করেই আজ আমাদের অবজেকশন উইথড্র করে নিয়েছি যাতে কেসের রায় আজই হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়'

ঝিমলি একটু চুপ করে থাকে। মাঝখানে বংশীর মৃতদেহ এসে গেছে। অর্থাৎ মুক্তি বোস জানাতে এসেছে, সে জানে বংশী বেঁচে নেই। আর সে বোঝে, এখন ঝিমলির কাছে কেস জেতা-হারার কোনো মানে নেই। ঝিমলি কি এটা জানাতে চায় যে বংশী বেঁচে না থাকলেও তার কাছে মুক্তি বোসের কাছ থেকে ডিভোর্সটা একই রকম দরকারি? মুক্তি বোসও কি এটাই জানতে চায়, বংশী বেঁচে না থাকলেও ঝিমলির কাছে মুক্তি বোসের কাছ থেকে ডিভোর্সটা একই রকম দরকারি কি-না? কিন্তু মুক্তি বোস এখনও একবারও বংশীর নাম উচ্চারণ করেনি।

'তোমাদের উকিল এতদিন ধরে কেস করছেন। হঠাৎ সব তুলে নেবেন কী করে?'

'আমি কিছু ভাবব কেন'

'আইনের ব্যাপার। উকিল তো তার মতো করেই সব বলে—জেতার জন্যে'

'সে তো বটেই, কেস তো উকিলই করে। আমাদের উকিলও তো কত কিছু করেছেন,' ঝিমলি একটু থামে। এখানেই কি বলবে যে তার উকিলের পরামর্শ শুনে সে কেস তুলে নেয়নি বা তারিখ চায়নি। কিন্তু ঝিমলি বলে না। মুক্তি বোস একটু চুপ করে থাকে, যেন ঝিমলি আরো কিছু বলতে পারে। ঝিমলি কিছু বলে না। দরজার কাছে কখন এসে পিসিমা দাঁড়ান—'তোর বাসের টিকিটটা কোথায়, এখনও হয়ত বিক্রি করে দেয়া যাবে,'

ঝিমলি পিসিমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার ছোট হাত ব্যাগটায়, চৌকির ওপর।'

পিসিমাকে কথাটা বলে ঝিমলি ভিতরের উঠোনের দিকেই তাকায়। পিসিমার ঘরেরও ওপাশে রান্নাঘরে বোধহয় খাবার পাঠাবার আয়োজন করছে লক্ষ্মী। তার সামনে দিয়ে বিপুল সাইকেলটা টেনে বেরিয়ে গেল একবারও না তাকিয়ে।

ঝিমলির মনে হল সে যেন অনেকক্ষণ কথা বলছে মুক্তি বোসের সঙ্গে, যেন তার বাস চলে যাওয়ার কথা আরো অনেক আগে। সে আজ বাস ধরতে পারল না মুক্তি বোসের জন্যে। সেই কারণেই কি মুক্তি বোসের সঙ্গে তাকে কথা বলে যেতে হবে। এখন তো ঝিমলি অনায়াসে বলতে পারে, 'আমি তাহলে আসছি', আর সত্যি-সত্যি যদি বাসের সময় এখনো থাকে তবে বাস ধরার চেষ্টাও করতে পারে। কিন্তু সেসব কিছুই না করে ঝিমলি দাঁড়িয়ে থাকে। দশ-দশটি বছর পরে মুক্তি বোস তাকে কী বলতে এসেছে আজ, কোনো আন্দাজ পাচ্ছে না ঝিমলি। সেই আন্দাজের জন্যেই কি তার এই দাঁড়িয়ে থাকা? অথচ মুক্তি বোসকে তার কথাটা এখনো জানানো হয়নি বলে যে, মামলা না-চালানোর পরামর্শ ঝিমলিও পেয়েছিল।

এদের কথাটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। মুক্তি বোস যেকোনো মুহূর্তে, 'আচ্ছা আসি', বলে প্যাসেজের দরজার দিকে পা বাড়াতে পারে। সে দাঁড়িয়ে আছে ও দরজা খোলা আছে। ঝিমলি তো ভেতরে চলে যেতেই পারে। কিন্তু কথাটা শেষ হল কি না সেটা বুঝে নিতে যেন এদের আরো কিছু সময় দরকার হচ্ছে।

আর সেই সময়টুকু জুড়ে ঝিমলির মনে হঠাৎ হু হু করে এত কথা আসতে শুরু করে। যেন, কোথাও একটা ছোট বাধা দেয়া ছিল, সেটা কখন অচেতনে সরে গেছে, মাত্র কয়েক মিনিট আগেও তো তার মনে হয়নি মুক্তি বোসের কাছে তার এত কথা জিজ্ঞাসার আছে। মুক্তি বোস আজ কোনো মতলব নিয়ে কাজ করেনি এই কথাটা এমন বোঝাতে চায় বলেই কি ঝিমলির মাথায় গিজগিজ করতে থাকে ছেলেকে নিয়ে এত কথা। কোর্ট তো বলেছিল তার কাছে ছেলেকে পাঠাতে, পাঠিয়েছিল মুক্তি বোস? ডিভোর্স কেস হয়েছে, তাই সে 'কনটেস্ট' করেছে? কেস না-হলে সে 'কনটেস্ট' করত না? করত তো না-ই। কারণ, ঝিমলিকে জব্দ করার সবচেয়ে ভালো উপায়ই তো ছিল ডিভোর্স না-দেয়া। ঝিমলি রেগে যাচ্ছে। ক্রমেই রেগে যাচ্ছে। একটু অন্য কথা বললে বা ভাবলে হয়ত ঝিমলির রাগ কমতে পারত। কিন্তু কী কথা বলবে সে। মুক্তি বোস চলে যাক। নইলে হয়ত ঝিমলিকে চলে যেতে হবে। ঝিমলি শোনে মুক্তি বোস জিজ্ঞাসা করছে, 'তুমি কি আজই চলে যাচ্ছিলে—'

'হ্যাঁ'

'আমি সেটা ভেবেই আরো এলাম। না এলে তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হত না। আমি রায়ের খবরটা পরে পেয়েছি। নইলে হয়ত কোর্টেই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম—'

'এর জন্যে দেখা করার দরকার আর কি ছিল।'

'না। সব কিছুই তো হয়েছে। তুমি ডিভোর্সও পেয়ে গেছ। কিন্তু আমি তোমাকে বিপদে ফেলার জন্যে আজ কেস ছেড়ে দিয়েছি এ-কথা যদি তুমি ভেবে নিতে তাহলে—', মুক্তি বোস কথা শেষ করতে পারে না।

'আমি তা ভাবতে যাব কেন। কেসটা তো আমিই করেছি', একটু থেমে ঝিমলি আবার ভাবে সে কি বলবে তার উকিল কী বলেছিল, 'আর কেউ কেস ছেড়ে দেবে ভেবে এতদিন কেস চালাইনি,'

ঝিমলি আবার একটু থামে, 'গত বছর দশেকে কখনো কোনো পয়েন্ট কেউ তো ছাড়েনি যে আমি খামোখা ভাবব আজ ছাড়বে।'

কথাটা যখন শুরু করেছিল ঝিমলি তখন সে ভাবেনি আজকের তারিখ, আজকের দিনটাকে সে এমন এক করে দিতে পারবে গত দশ বছরেরই সঙ্গে। যেন আজ ঝিমলি কোনো নতুন অবস্থায় পড়েনি, দশ বছর যেমন ছিল, তেমনি আছে, আজও। বংশীর মৃতদেহটি তার কথা দিয়ে সে ঢেকে দিতে পারল। আজও তার কাছে ডিভোর্স পাওয়াটা ততটা মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয় নয়। হয়ত মুক্তি বোস তাই ভাবতে চায়। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে একবারও কৌশিকের কথা বলছে না কেন? সে কি চায়, কৌশিকের কথা ঝিমলিই তুলুক। নাকি সে জানে, কৌশিকের প্রসঙ্গ তুললে ঝিমলিই তাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতে পারে।

ঝিমলি আবার মনে-মনে নিজেকে সামলায়। সে কৌশিকের কথা তুলবে না। এমন-কি কৌশিকের কথাও তুলবে না। এতগুলো বছর ধরে কৌশিকের কথা তার বাবা ও মায়ের মধ্যে আদালতে যদি হয়ে আসতে পারে, তবে, আজ সন্ধ্যায়, মুক্তি বোসের এই আকস্মিক আসাটার সুযোগে ঝিমলি কেন কৌশিকের কথা তুলবে। অন্তত এই একটি কথা না তুলে তো সে মুক্তি বোসকে বোঝাতে পারে তার কাছে ঝিমলির কোনো কিছুই আর জিজ্ঞাসার নেই।

মনে-মনে এটুকু ঠিক করতেও ঝিমলির নিজের সঙ্গে যে-কিছু বোঝাপড়া চলে, তাতেই তাকে বিরক্ত হতে হয়। মুক্তি বোসের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছু কি বাকি আছে, যাতে তার নিজের সঙ্গে এইটুকু বোঝাপড়ারও দরকার হয়?

লক্ষ্মী খাবার নিয়ে ঢোকে। চায়ের ডিশে কিছু সাজানো। দুহাতে যেন দু-তিনটি ডিশ, লক্ষ্মীর। মুক্তি বোসের সামনে খাবারটা কোথায় দেবে এ নিয়ে একটু ভাবতে হয় লক্ষ্মীকে, তারপর বিছানার ওপরই দুটো ডিশ রাখে। একটাতে দুটো সিঙাড়া আর-একটাতে দুটো রসগোল্লা আর সন্দেশমতো কিছু, দুটো। বিছানার ওপর ঐটুকু ডিশও একটু কাত হয়ে থাকে। মুক্তি বোস এতক্ষণে যেন বসার সুযোগ পায়। ঝিমলিও চৌকিটার একপাশে বসে।

মুক্তি বোস বোধহয় একটু আনমনা ছিল। তাই তার সামনের ডিশ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, এমন-কি যে-ডিশটা একটু কাত হয়ে ছিল, সেটা সোজাও করে নেয়। লক্ষ্মী ততক্ষণে ঝিমলির সামনেও একটা ডিশ রেখেছে। লক্ষ্মীর দিকে না-তাকিয়ে ঝিমলি হাতের ইঙ্গিতে ডিশটা সরিয়ে নিতে বলে বটে কিন্তু তার চোখ মুখে বোঝা যায় সে সামনের ডিশটা দেখছেও না বুঝি। লক্ষ্মী যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ মুক্তি বোস 'আরে রে রে' করে ওঠে।

দরজাতেই ঘুরে লক্ষ্মী বলে, 'কী হল?'

ধারাবাহিক

No10
FILTER
Amjad Ali Khan
Sarod maestro
His cigarette : No. 10 Filter
Uncompromising quality
Unvarying satisfaction
No10
FILTER
No10
FILTER
STATUTORY WARNING
CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH
The taste to go
steady with
SM/1/81

বিষ্ণু বসু

বাবু থিয়েটার

আরো কিছু বাবুর বাড়ি

এক

শ্যামবাজারে যদি হতে পারে তবে শোভাবাজারে নয় কেন! আর শোভাবাজারে আছেন যখন খোদ একজন রাজা। আর যে সে রাজা তিনি নন, স্বয়ং রাধাকান্ত দেব। কলকাতার নানা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাঁর মনস্কতা আজও হয়ে আছে কিংবদন্তি। হাতিবাগান থেকে পশ্চিমদিকে চলে গেছে অরবিন্দ সরণি—যার আগেকার নাম গ্রে স্ট্রিট। কয়েকশো গজ পরেই অরবিন্দ সরণি থেকে একটু কানাচেভাবে একটা রাস্তা ডানদিকে বেরিয়ে গিয়ে মিশেছে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। এ পথটির নাম রাজা নবকিষেণ স্ট্রিট। এ পথের দুধারেই রয়েছে শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজবাড়ি। নবকৃষ্ণ সাহেবদের উচ্চারণে হয়েছেন নবকিষেণ। এই নবকৃষ্ণই ছিলেন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা—লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান। দেওয়ানি করে প্রচুর টাকা আয় করেছিলেন তিনি। শোনা যায়, মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি নাকি সেকালেই খরচ করেছিলেন দশ লক্ষ টাকা।

রাজা নবকৃষ্ণের নাতি রাজা রাধাকান্ত দেব। ঠিক সাক্ষাৎ পৌত্র অবশ্য তিনি নন। রাজা নবকৃষ্ণ পোষ্য নিয়েছিলেন তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে গোপীমোহনকে।

রাজা গোপীমোহনের বড় ছেলে রাজা রাধাকান্ত। জন্ম তাঁর সতেরশো তিরাশি সালে। কারু কারু মতে তাঁর জন্ম সন সতেরশো তিরানব্বই। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। ইংরেজি ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। হিন্দু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সতীদাহরোধ আইনের বিরোধী, ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনার পদ
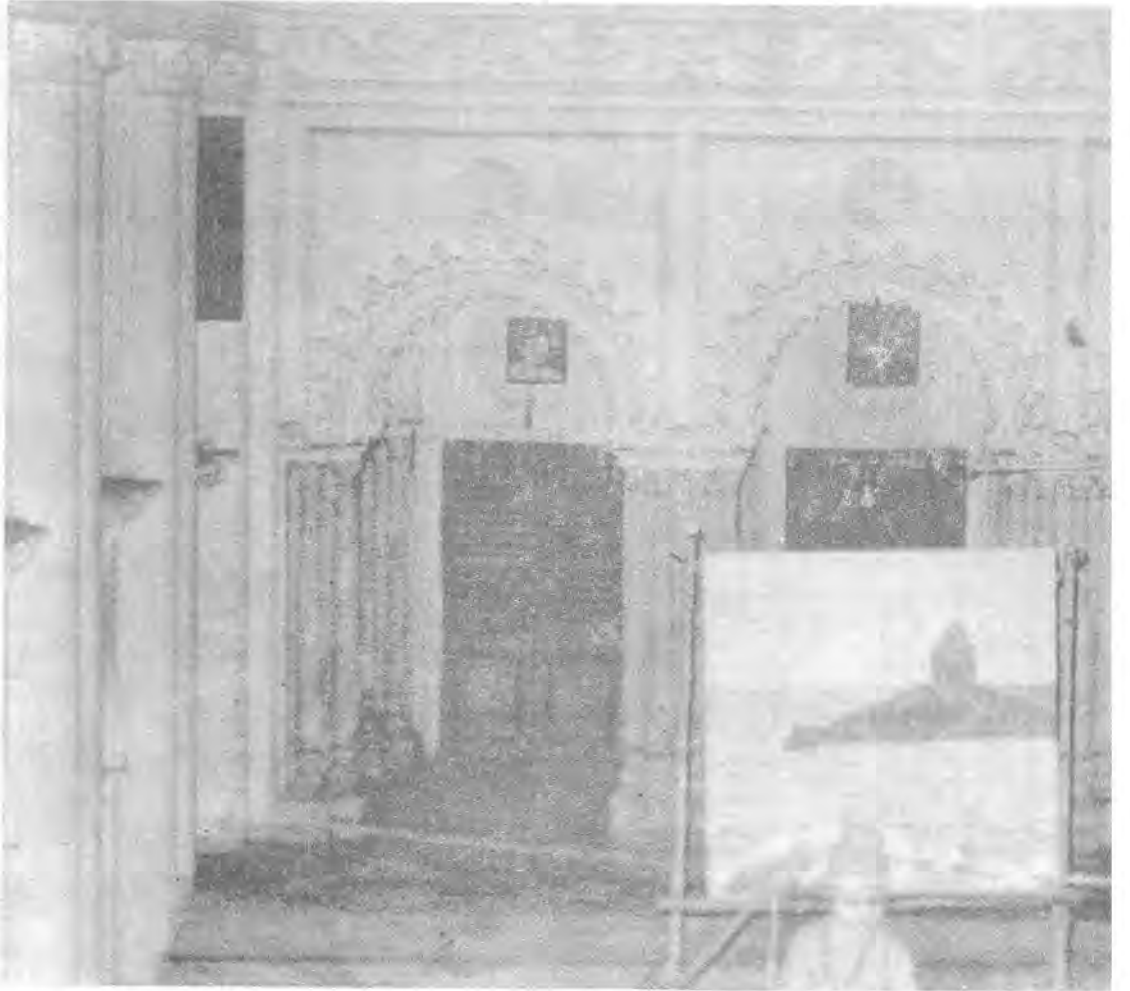
রাধাকান্ত দেব

শোভাবাজারের রাজবাড়িতে এটাই কি রাধাকান্ত দেবের নাটমঞ্চ ?

থেকে বিতাড়নের নায়ক, আবার অন্যদিকে চিকিৎসাবিদ্যার জন্য হিন্দু ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদ বা তাঁদের উচ্চশিক্ষার বাবদে অর্থসাহায্য ব্যাপারে অগ্রণী। **শব্দকল্পদ্রুম** তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। প্রায় চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল আটখণ্ডের এ গ্রন্থখানি। কলকাতার সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁর সক্রিয় মনস্কতা এখনও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে।

কলকাতার সাংস্কৃতিক দুনিয়ার সঙ্গে যিনি এমন আদ্যোপান্ত জড়িয়ে ছিলেন তিনি থিয়েটার নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেন না এটা হতেই পারে না। পাথুরেঘাটায় হল, শ্যামবাজারে হল আর শোভাবাজার পিছিয়ে থাকবে তা কেমন করে হয়! তাই তাঁকেও দেখা যায় এগিয়ে আসতে নাট্যাভিনয়ের আসর সাজাতে। সাল আঠারশো চুয়াল্লিশ। সে বছর দুর্গাপুজোর সময় রাজাবাহাদুরের সাধ হল তাঁর বাড়িতেও হবে নাটক। কিন্তু তিনি প্রসন্নকুমার বা নবীনচন্দ্রের মতো তেমন কৃচ্ছ্রসাধনে রাজি ছিলেন না। নিজে যোগাড়যন্ত্র করে, নাটক বাছাই করে, অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে কঠোর মহলা দিয়ে নাটক নামানোর ঝক্কি তাই তিনি নেননি। তিনি আমন্ত্রণ করে আনলেন সাহেব পাড়ার সাঁসুসি থিয়েটারের অভিনেতা ও স্টেজ ম্যানেজার মি· ব্যারিকে।

মি· ব্যারি কলকাতায় এসেছিলেন আঠারশো বিয়াল্লিশ সালে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। স্বামী স্ত্রী দুজনেই অভিনয়ে ছিলেন পটু। বিশেষ করে কমেডি অভিনয়ে। সাঁসুসি থিয়েটারের দুর্দিনে ব্যারি-দম্পতি বেজায় খেটেছিলেন। সে আমলে সাহেব পাড়ার থিয়েটারে এঁদের নামডাক ছিল দারুণ। বোধহয় সেজন্যেই রাজা রাধাকান্ত সোজাসুজি ব্যারির উপরেই ন্যস্ত করলেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে নাট্যাভিনয়ের ভার।

আঠারশো চুয়াল্লিশ সালের উনিশে অক্টোবর। দিনটা ছিল শনিবার। সেদিনই সন্ধ্যায় শোভাবাজার রাজবাড়িতে অভিনীত হল দুটি নাটক—লাভার্স অব সালামাঙ্কা এবং দ্য ফক্স অ্যাণ্ড দ্য উলফ

কিন্তু কোথায় বসেছিল এ অভিনয়ের আসর ? রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ি এখনো দাঁড়িয়ে আছে রাজা নবকিষেণ স্ট্রিটে। সেখানে এখনো আছে একটি থিয়েটার হল—বাড়ির অধিবাসীরা যাকে এখনও বলেন নাটমন্দির। গাড়িবারান্দা পেরিয়ে হলে ঢুকলেই গা সির সির করে। হলের উত্তর অংশে বাঁধনো চাতাল, সেখানে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হওয়া অসম্ভব ছিল না একেবারেই। হলে চার-পাঁচশো দর্শকের জায়গা হতে পারে অনায়াসেই। দোতলার চারদিকে ফারফোরের কাজ করা জানালা। বোঝা যায় সেখানে এসে বসতেন অন্দরমহলের মহিলা দর্শকের দল। এ নাটমন্দিরই সেদিন সেজেছিল অসংখ্য আলোকমালায়। আলোমালায় থিয়েটার বাড়ি সেদিন যে সেজেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হলের বাইরে বানানো হয়েছিল একটি উঁচু তোরণ—তাতে বসানো হয়েছিল চিত্রবিচিত্র আলোর মালা। সঙ্গে ছিল ফুলের মালা, সবুজ ঘাস ও ফুলের স্তবক। তাছাড়া রঙ্গালয়কে সাজানো হয়েছিল পতাকা, ঢাল, বর্শা, বর্ম প্রভৃতি দিয়ে। হাজার খানেক বাতির আলোয় ঝলমল করছিল রঙ্গালয়। বাইরের সেই সুন্দর উঁচু তোরণের উপরে ইংরেজিতে লেখা ছিল রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম। তার একটু নিচেই লেখা 'ওয়েলকাম'।

আঠারশো চুয়াল্লিশ সালের একুশে অক্টোবরের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এ অনুষ্ঠানের বিবরণ বেরিয়েছিল। ইংলিশম্যান লিখছেন:

> 'হলঘরটি পূর্ণ করা হয়েছিল লিটল থিয়েটারের আদলে উপযুক্ত দৃশ্যাবলী এবং জমকালো অলংকৃত ঝালর দিয়ে, পুরোটাই সাজানো হলঘরের স্টাইলের সঙ্গে সমতা রেখে.....'

নাট্যাভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। নাটকের সঙ্গে ব্যবস্থা ছিল মঁসিয়ে রজিয়ারের টাইট অ্যাণ্ড স্ল্যাক রোপ নাচের। এ নাচও সকলকে খুশি

[illegible] ধর

করেছিল। দর্শকদের আসনে হাজির ছিলেন কলকাতার ধনী বাবুদের একটি অংশ এবং কিছু সাহেব-মেম। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাঙালী বাড়িতে ইংরেজি নাটক দেখে সেদিন সকলেই প্রীত হয়েছিলেন। অভিনয় শেষ হয়েছিল রাত সাড়ে এগারোটায়।

দুই

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে আর কোনো থিয়েটারের আসর বসেছিল কিনা সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। তবে এক প্রহরের প্রমোদেই খরচ হয়ে গিয়েছিল লক্ষাধিক টাকা।

এর পরে বাবু থিয়েটারের পর্দা উঠল ওয়েলিংটন স্ট্রিটে। বাবু দুর্গাচরণ দত্তের বাড়ি ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। যার হালের নাম রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার। তিনি তাঁর বাড়িতে নাটকের আসর বসালেন আঠারশো আটচল্লিশ সালে।

চেহারা ও চরিত্রে বাবু দুর্গাচরণের থিয়েটারের মিল অনেকটাই ছিল শোভাবাজারের রাজবাড়ির সঙ্গে। তিনিও নিজের উদ্যোগে মহলা দিয়ে নাটক তৈরি করিয়ে অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেননি। রাজা রাধাকান্তের মতো তিনিও ভার দিয়েছিলেন সাঁসুসি থিয়েটারের মি· ব্যারির উপরেই। অবশ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল টিকিট বিক্রি করে। টিকিটের দাম নির্দিষ্ট হয়েছিল চার টাকা করে। টিকিট বিক্রির দায়িত্বও নিয়েছিলেন মি· ব্যারি। চোদ্দ নম্বর ওয়েলিংটন স্ট্রিট থেকে টিকিট বিক্রির বন্দোবস্ত হয়েছিল।

অভিনয় হয়েছিল সাকুল্যে দুদিন। আঠারশো আটচল্লিশ সনের আঠাশে নভেম্বরের 'বেঙ্গল হরকরায়' পরিবেশিত সংবাদে দেখা যায় উনত্রিশে নভেম্বর বুধবার এবং পয়লা ডিসেম্বর শুক্রবার অভিনয়ের আসর বসেছিল। প্রথম রাতে অভিনীত নাটক দুটির নাম হল—দ্য এসেন্স অব হিউমার এবং টু গ্রেগরিস। এইসঙ্গে ছিল মূকাভিনয়ের বন্দোবস্ত। দ্বিতীয় রাতেও অভিনীত হয়েছিল দুটি নাটক—লাভার্স কোয়ারেল এবং দ্য প্লাউম্যান টার্নড লর্ড মাইক। সবগুলোই হাসির নাটক।

কর্তৃপক্ষ অভিনয়ের সময় নির্ধারিত করেছিলেন রাত আটটায়। রাত সাড়ে সাতটায় প্রেক্ষাগৃহের দরজা খোলা হয়েছিল। এ আসরকেও বলা যায় শুধু এক প্রহরের প্রমোদ।

তিন

আঠারশো চুয়ান্ন সালের বাইশে এপ্রিল সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন বেরুল। তাতে জানানো হল—

> 'অ্যামেচার দুঃখ প্রকাশ করছে যে চব্বিশ তারিখ রাতে জুলিয়াস সিজার ট্র্যাজেডিখানা অভিনয়ের যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল তা অপরিহার্য পরিস্থিতির দরুন কোনো এক ভবিষ্যৎ রজনীর জন্য মুলতবি রাখা হল যা উপযুক্ত সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে। চাঁদাদাতা ও জনসাধারণকে যে টিকিট দেওয়া হয়েছে তা প্রদর্শনীর রাতে গ্রাহ্য হবে।'

বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল নন্দলাল বসুর নামে। তিনি ছিলেন জোড়াসাঁকো থিয়েটারের অবৈতনিক সম্পাদক।

কিন্তু কে এই জোড়াসাঁকো থিয়েটারের কর্ণধার?

দুর্গাচরণ দত্তের বাড়িতে নাট্যাভিনয়ের পরে দীর্ঘকাল কোনো বাঙালীবাবুর উদ্যোগে থিয়েটারের আসর আর চোখে পড়ে না। সাহেব পাড়ায় অবশ্য ইংরেজি থিয়েটারের তখন বেশ রবরবা। বাঙালীবাবুরা টাকা দিয়ে, দর্শক হিসেবে হাজির থেকে তার পোষকতা করে চলেছেন ভালোভাবেই। এর মধ্যেই আবার অলক্ষ্যে তৈরি হয়ে চলেছে মৌলিক বাংলা নাটক লেখার পটভূমি। আঠারশো বাহান্ন সালে প্রকাশিত হল দুটি মৌলিক বাংলা নাটক—জে· সি· গুপ্তের কীর্তিবিলাস এবং তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন। কিন্তু এ নাটক দুটো অভিনীত হয়নি কোনোদিনই। নাটক দুটোর অভিনয় যোগ্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেও বলা চলে হয়ত গুপ্তমশাই বা তারাচরণবাবু তেমন কোনো বাবুর পোষকতা পাননি। তাই তাঁদের নাটক পাদপ্রদীপের সামনে হাজির হতে পারে নি। বাংলা মৌলিক নাটকের সৌখীন অভিনয় শুরু হতে তখন ছিল বছর তিনেক বাকি।

তাই বলে কলকাতার বাবু থিয়েটার তো আর বন্ধ থাকতে পারে না। তাই আঠারশো চুয়ান্ন সালে এগিয়ে আসতে দেখা যায় প্যারীমোহন বসুকে। বাড়ি তাঁর জোড়াসাঁকো। তাই তাঁর থিয়েটারের নাম 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার'।

প্যারীমোহন বসু ছিলেন শ্যামবাজার থিয়েটারের হোতা বাবু নবীনচন্দ্র বসুর ভাইপো। হয়ত তিনি পিতৃব্যের বাড়িতে দেখেছিলেন বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয়। সেই স্মৃতিই তাঁকে নাট্য প্রযোজনায় উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে। কিংবা বাবু কালচারের দায় মেনে তিনি হয়ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন থিয়েটারে।

মুলতবি নাটক জুলিয়াস সিজার শেষ পর্যন্ত জোড়াসাঁকো থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল আঠারশো চুয়ান্ন সালের তেসরা মে। থিয়েটার গৃহটি সাজানো হয়েছিল অসংখ্য আলোকমালায়। সঙ্গে ছিল ছবি আর প্রচুর মনোহর সূক্ষ্ম দ্রব্য। নাট্যশালার সাজসজ্জা হয়েছিল চমৎকার। রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ ও প্রস্থানের বন্দোবস্ত হয়েছিল সুন্দর। দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায় প্রকাশ পেয়েছিল শিল্পীর মুন্সীয়ানা। দরকার মতো জিনিস দিয়ে শোভিত হয়েছিল যোগ্য স্থান। শিল্পীর দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল কারুকার্যেও। নাট্যশালার সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছিল সুরুচি।

তবে আয়োজন যেমন হয়েছিল তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাজির ছিলেন না দর্শক সম্প্রদায়। সাকুল্যে নাকি শ'চারেক দর্শক হাজির ছিলেন সে রাতের অভিনয়ে। সংবাদদাতা জানিয়েছেন দর্শকরা সবাই নাকি সম্ভ্রান্ত। দেশীয় দর্শকদের সঙ্গে এক আসরে বসেছিলেন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারাও। ঝড় বৃষ্টির জন্য দর্শকের উপস্থিতি আশানুরূপ হয়নি সে রাতে। প্যারীমোহন বসুর বাড়ি ছিল জোড়াসাঁকোর বারানসী ঘোষ স্ট্রিটে। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় পাঁচই মে

তারিখে এ অভিনয়ের বিশদ আলোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচক লিখেছেন

> 'বাবু মহেন্দ্র নাথ বসু জুলিয়াস সিজারের বেশধারণপূর্বক যথার্থ নাটকের যথার্থ বর্ণনারূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাবু কৃষ্ণধন দত্ত সারকম ব্রুটসের মূর্তি গ্রহণ করিয়া আপন কার্য সাধনের সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ করেন নাই, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কেসিয়াসের রূপ ধারণ করিয়া ব্রুটসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার বিলক্ষণ পরীক্ষা প্রকাশ হইয়াছে বিশেষত রামচন্দ্র বর্ধনের অস্ত্র প্রহার সিজারের মৃত্যু ও তাহার আত্মীয়গণের ক্রন্দন ব্রুটসের বিকট মূর্তিধারণ ও গাম্ভীর্য প্রকাশ ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ই সুন্দররূপে সুনির্বাহ হইয়াছে, এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু সম্বন্ধী কঠিন নাটকের অনুরূপ এতদ্রূপে দর্শাইবেন ইহা কেহই বিবেচনা করেন নাই। দর্শকমাত্রেই তাঁহারদিগের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নাট্যকাণ্ড দেখিয়া অনেকের শরীর শীর্ণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে, আমরা যোড়াসাঁকো থিয়েটরের বন্ধুদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম····· আমরা নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রার্থনা করি তাহারা টিকিটের মূল্য ন্যূন করিয়া ঐ নাট্যকাণ্ড পুনর্বার সাধারণকে দেখাইবেন।'

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর দ্য ইণ্ডিয়ান স্টেজ নামের বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে জানিয়েছেন বাবু প্যারীমোহন বসুর ছেলেরাও নাকি অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরাই নাকি প্রধান ভূমিকাগুলোতে অভিনয় করেছিলেন। সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় উল্লেখ করা অভিনেতাদের মধ্যে তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল না। তিনি আরও জানিয়েছেন যে বাবু ব্রজলাল বসুও নাকি অভিনেতাদের একজন ছিলেন। ব্রজলাল বসুর পরিচয় তিনি দিয়েছেন এভাবে—'বাবু ব্রজলাল বসু বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিয়ান স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ বসুর পিতা'—ইত্যাদি। কিন্তু সংবাদ প্রভাকরে পরিবেশিত খবরে দেখা যায় স্বয়ং মহেন্দ্র নাথ বসুই জুলিয়াস সিজারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। হেমেন্দ্রনাথের দেওয়া তথ্যে তাই একটু খটকা লেগে থাকে।

যাই হোক, সংবাদ প্রভাকরের প্রশংসাধন্য হলেও এ অভিনয় কিন্তু হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় প্রশ্রয় পায়নি একেবারেই। অবশ্য দৃশ্য ও মঞ্চ সজ্জার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল প্যাট্রিয়ট কিন্তু সামগ্রিক প্রযোজনা বিষয়ে বিরূপতা গোপন করেনি মোটেই। এগারোই মে বৃহস্পতিবারের সংখ্যায় এ অভিনয়ের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে প্যাট্রিয়ট জানিয়েছিল :

> 'জুলিয়াস সিজর নাটকখানি চায় কুশলী অভিনয়, কিন্তু ক্যাসাস ও ক্যাসিয়া ব্যতিরেকে যাবতীয় প্রদর্শকগণ গান গেয়েছিলেন বা অভিনয়ে ফেটে পড়েছিলেন উইল শেকসপীয়রের অভিপ্রায়ের বাইরে। ওরিয়েন্টল সেমিনারির প্রাক্তন ছাত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক যুবক ক্যাসাসের ভূমিকা ভালো ফুটিয়েছেন। যুবক ভদ্রলোকটি অনুভূতি অনুযায়ী অভিনয় করেছেন·······'

প্যাট্রিয়টের সমালোচকের কাছে মোটা গোঁফ থাকা সত্ত্বে ব্রুটসের অভিনয় ভালো লাগেনি। সিজার ও কালপুনিয়াও তথৈবচ। মার্ক অ্যান্টনি কে নাকি রোমান বীরের মতো কখনোই মনে হয়নি। মিঃ ক্লিংগার নামে একজন সাহেব ছিলেন নাটকখানির পরিচালক। প্যাট্রিয়ট ক্লিংগার সাহেবকেও রেয়াত করেনি। তাঁর শিক্ষা নাকি ছিল ত্রুটিযুক্ত এবং সমালোচকের মতে 'এ মানুষটি সব কিছু নষ্ট করবে।'

এভাবেই শেষ হল বাবু থিয়েটারের একটি বিশেষ অধ্যায়। সাহেবদের উপর ভার দিয়ে বাড়িতে ইংরেজি নাটক মঞ্চস্থ করার প্রবণতা এর পর থেকে কলকাতার বাবুদের মধ্যে আর তেমন দেখা যায় না। তারপর বাবু থিয়েটারের নতুন পরিক্রমা শুরু হল। বাবুরা এবার সর্বান্তকরণে ঝুঁকে পড়লেন বাংলা থিয়েটারের দিকে।

ধারাবাহিক

সুকুমার রায়ের গল্প

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

২. 'হিংসুটি' গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকাংশ ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে চরিত্র-বিশ্লেষণ করে পরপর তিনটি ঘটনার পরম্পরায় হিংসা যে আত্মধ্বংসী, তা প্রমাণ করা হয়েছে।

৩. 'দুই বন্ধু' গল্পে সওদাগর বিশ্বাসঘাতকতা করে মহাজনের মোহর চুরি করে তার বদলে পয়সা রেখে দেয়। ফলে মহাজন সওদাগরের ছেলের বদলে একটি বাঁদরকে ফেরৎ দিতে চাইলে ইংরেজি 'টিট্ ফর ট্যাট্' বা সংস্কৃত 'শঠে শাঠ্যং' নীতিটি ঝলসে ওঠে।

৪. 'গরুর বুদ্ধি' গল্পে পণ্ডিতমশাই তাঁর ন্যায়শাস্ত্র পড়া বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তথাকথিত বিদ্যাবুদ্ধি মানুষের মনকে কীভাবে প্যাঁচালো ও অতিরিক্ত সন্দিগ্ধ করে দেয়।

৫. 'অসিলক্ষণ পণ্ডিত' গল্পটি একটি রূপক। এদেশীয় যেকোনো সরকারী অফিসের কার্যধারা যেমন দুএকটি কর্মদক্ষ মানুষের উপর নির্ভর করে, আর 'বাকি সবাই বসে বসে মাইনে খায়', ঠিক তেমনি এই গল্পের রাজসভার চিত্র। অসিলক্ষণ পণ্ডিত 'মোটা রকম মাইনে পাচ্ছেন আর প্রতিদিন তলোয়ার পরীক্ষা করছেন, আর বলছেন "এই তলোয়ারটা ভালো, এই তলোয়ারটা খারাপ।" ভারি কঠিন কাজ।' এই 'নেই কাজ তো খই ভাজ' পরিবেশে দেদার ঘুষের রাজত্ব চলে। অসিলক্ষণও 'যাদের উপর তিনি চটা, যারা তাঁকে ঘুষও দেয় না, খাতিরও করে না, তাদের তলোয়ার যত ভালই হোক না কেন.....তাঁর কাছে পার পাবার জো নেই।' সরকারী অফিসের বিল পাশ হবার রূপচিত্র এতে হুবহু প্রকাশিত। কিন্তু গল্পের শেষে এসে 'টিট্ ফর ট্যাট্' নীতিটিই জয়যুক্ত হয়েছে। ওস্তাদ কারিগরের বুদ্ধিতে অসিলক্ষণের নাক কাটা গেছে।

৬. 'ছাতার মালিক'-এর মতো 'ব্যাঙের রাজা' গল্পেও মূল চরিত্র কতকগুলি ব্যাঙ। কিন্তু এখানে রক্ষক যে সাধারণত ভক্ষক হয়ে পড়ে, সেই নীতিকথাটিকেই প্রকাশ করা হয়েছে। রাজা বা নেতা ছাড়াই জীবন সুখের হয়, তাতে জাঁকজমকের কৃত্রিমতা লাগাতে গেলেই বিবাদ হয়।

৭. 'ডাকাত নাকি' গল্পের রসপরিবেশ নির্মল প্রাণবন্ত হাস্যের। কিন্তু এখানেও হারুবাবুর অহেতুক সন্দেহগ্রস্ত মনকে ঠাট্টা করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে।

৮. 'উকিলের বুদ্ধি'তে উপকথাসুলভ নির্বিশেষ চরিত্রের আমদানি হলেও দুর্বল ও অসহায় চাষার জয়ের মধ্যে পাঠকের সহানুভূতি যুক্ত হয়। গরীব চাষাকে সর্বস্বান্ত করে মহাজন ও উকিল। উকিলের বুদ্ধিতে চাষীটি মহাজনকে আদালতে পরাস্ত করার পর সেই একই বুদ্ধিতে যখন উকিলকেও পর্যুদস্ত করে, তখন গল্পের সেই মোঁপাসা-সুলভ শেষ-চমকে আমরা চমকিত না হয়ে পারি না।

৯. মাছি-মারা কেরানীর মতো অন্ধ অনুকরণ করলে যে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না, 'বুদ্ধিমান শিষ্য' গল্পের শিষ্য তা প্রমাণ করেছে। নামকরণটি অবশ্যই ব্যঙ্গার্থক। অতএব দেখা গেল তেরোটি গল্পের ন'টিতেই নীতি বা 'মর‍্যাল' ব্যাপারটা এসেছে। কোথাও সেটাই গল্পের মূল রস, কোথাও বা তা আলগোছে যুক্ত।

এরই মাঝখানে 'পুতুলের ভোজ' গল্পটি স্বতন্ত্র। শিশুমনের কল্পনা যে বড়দের যুক্তি ও বাস্তব জগতের থেকে কত আলাদা, এই গল্পের খুকীর চিন্তায় ও ভাষণে তা প্রকাশিত।

তার এই কল্পনা কখনই অবাস্তব অ্যাবসার্ডের জন্ম দিচ্ছে না, কারণ ঘটমান জগতকেই খুকী নিজস্ব ব্যাখ্যায় চিনে নিচ্ছে – মূল ঘটনাটিকে সে বিকৃত করছে না বা পাল্টে দিচ্ছে না। গল্পের একটি বাক্যের বিন্যাসে ব্যাপারটিকে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। 'সেই যে একদিন টিনের তৈরি দুষ্টু পুতুলটা খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল – নিশ্চয় ওরা রাত্রে উঠে মারামারি করেছিল।' বাক্যের প্রথমাংশ ঘটনা, দ্বিতীয়াংশ শিশুমনের কল্পনা। এই বাক্যে তা যেমন পাশাপাশি নিহিত আছে, শিশুমনের ভিতরেই তেমনি ঘটনা ও তৎসম্পর্কিত কল্পনা নির্বিরোধে সহাবস্থান করছে।

'বহুরূপী'র একটি গল্পকে কোনো শ্রেণীভুক্ত করিনি। কারণ সেটি নিজেই একটি স্বতন্ত্র জগৎ; গল্পের নাম 'হ্যাংচু'। সত্যজিৎ রায় এটিকে সুকুমারের 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা' বলে মনে করেছেন (ভূমিকা/সমগ্র শিশু-সাহিত্য: সুকুমার রায়/আনন্দ পাবলিশার্স)।

আমরা জানি যে আজগবি রসের মধ্যে একপ্রকার অসংলগ্নতা থাকে। আমরা এও জানি যে অসংলগ্নতা পাগলামির অন্যতম লক্ষণ। তাহলে আজগবি কোথায় পাগলামি অপেক্ষা স্বতন্ত্র? সেখানেই তা বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র যেখানে সেই অসংলগ্নতাও রসসৃষ্টি করছে।

মন্তব্যটি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখব যে আজগবি রসের কাহিনীতে যে অসংলগ্নতা যুক্ত হচ্ছে, তা আসলে লেখকের সচেতন সতর্ক মনের সুবিন্যস্ত প্রকাশ। যে-মন সাহিত্যে অসংলগ্নতার দ্বারা রসসৃষ্টি করছে, সেই মন মূলত পাগলের নয়। যুক্তিবদ্ধ বাক্যবিন্যাসের অতীতে গিয়ে তিনি আসলে এক ধরনের মজাই সৃষ্টি করতে চাইছেন। "হ্যাংচু" গল্পে সুকুমার রায় এই মজাকে পুরোদস্তুর ধরতে পেরেছেন।

এখানে ভীষণ প্রস্তুতিপূর্ণ সাড়ম্বর রাজসভাকে প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে সামান্য কাকের একটি শব্দ। রাজসভারূপ যাবতীয় প্রচলিত সাম্মানিক প্রতিষ্ঠানের অনেকাংশিক অন্তঃসারশূন্যতাকেই কি লেখক এখানে ধরতে চান নি? শেষ পর্যন্ত কোথাও অবশ্য সুকুমার স্পষ্ট করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বললেই বরং গল্পটির সূক্ষ্ম রসের হানি হত।

গল্পের শেষে এসে যে মন্ত্ররূপ ছড়াটি পাচ্ছি, সেটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় বলছেন 'খাঁটি ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কোথায় বা কেন যে এর সার্থকতা, এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সামান্য অদল-বদল করলেই কেন যে এর অঙ্গহানি হতে বাধ্য, তা বলা খুবই কঠিন। এর অনুকরণ চলে না, এর বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া এর উদ্ভাবন সম্ভব নয়' (ভূমিকা/সমগ্র শিশুসাহিত্য: সুকুমার রায়/আনন্দ পাবলিশার্স)। 'হ্যাংচু' গল্প সম্পর্কে নয়, যেকোনো শ্রেষ্ঠ ননসেন্স বা আজগবি

রসের সৃষ্টি সম্বন্ধেই বোধহয় কথাটা বলা চলে।

সুকুমার রায়ের তৃতীয় ছোটগল্প সংকলন 'অন্যান্য গল্প'। 'অন্যান্য' – এই নামকরণ থেকেই গল্পগুলির চরিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে দুটি ধারণা হওয়া সম্ভব। এক, যাকে ইংরেজিতে 'মিসলেনিয়াস' বলে সেই বিবিধ রসের ও প্রকারের গল্প এগুলি এবং দুই, মূলত সুকুমারের অপ্রধান গল্পগুলিই এখানে সংকলিত করা হয়েছে। বাস্তবিক, 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী' ভিন্ন যাকে বলে প্রথম শ্রেণীর মৌলিক রচনা, তা এখানে আর প্রায় নেই। কল্পনায়, রসিকতায়, প্রতিভার অনন্য বিশিষ্টতায় 'পাগলা দাশু' ও কিয়দংশে 'বহুরূপী' যেরূপ অভিনব হয়ে উঠেছে, এখানে তার পরিচয় খুব উজ্জ্বল বা স্পষ্ট নয়।

'অন্যান্য গল্প'র বেশিরভাগ রচনা 'কথা' শ্রেণীর। উপকথা, পুরাণ, শোককথা, রূপকথা – এবং সর্বোপরি নীতির শিরোপা-বিশিষ্ট নীতিকথাগুলি এখানে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। ছোটগল্পের মধ্যে যেমন পরিচিত বাস্তব জীবনের এক-টুকরো ঘটনা চরিত্রের ভিতর থেকে নিষ্কাশন করে নেয় সাধারণভাবে জীবন-সম্পর্কিত কোনো সমস্যা ও সেই সম্পর্কিত লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে, এখানে তার বদলে রয়েছে অসম্ভব বা অবাস্তব অথচ রঙিন কল্পনাময় এক জগতের ছায়াপাত। এখানে পশুপক্ষী মানুষের মতো ভাবে ও কথা বলে রূপকের মাত্রাটিকেই স্পষ্ট করে দেয়। এখানে ইচ্ছা ও সাধ্যের ভিতর বাস্তবিক দুরূহতার ভেদমাত্রাটি প্রায় নেই। এখানে মানবজীবনের বিভিন্ন প্রবৃত্তি, তার অতিরেক-জাত সমস্যা ও তার সমাধান, সব কিছুকেই কাহিনীর মধ্যে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। তাছাড়া এই 'কথা' জাতীয় গল্পগুলির চরিত্রচিত্রণেও কোনো ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ঘটে না। বিশিষ্টভাবের মূর্তি হিসাবে এরা টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠে বড় জোর। ছোটগল্পের চরিত্রে আলো ও অন্ধকারের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তা-জাত অগ্রগতি, যা অনেকটাই অজানা ও রহস্যময় – তার বদলে এখানে সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের আচরণাদিকেই যেন পূর্ব পরিকল্পিত মনে হয়। চরম অন্যায় ও নগ্ন অপরাধের কাহিনী পড়তে পড়তেও পাঠকের সেই রকম টেনশন-জাত ভাব-সম্পৃক্তি ঘটে না। কারণ তিনি জানেন যে কথার শেষে তার উপযুক্ত সমাধান বা শাস্তি অপেক্ষা করে আছে।

এছাড়া এক জাতের সমস্যা সমাধানের জন্য রচনার বৈশিষ্ট্যও কোথাও তেমন সূচিত হয় না। তার মানে এই নয় যে সব গল্পগুলিতেই একই ধরনের সমস্যা বা অপরাধ এবং তার সমাধান বা শাস্তি অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু একথাও সত্য যে সেই সমস্যা ও তার সমাধানকে, গল্পের মধ্যের অন্যায় ও তার শাস্তিকে, কোথাও খুব বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিবেশন করা হয়নি। নিপুণতা বা বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার পার্থক্য আছে। এবং সেই পার্থক্যের কারণেই একটি লেখা অন্য লেখার থেকে বা একজন লেখক অন্য লেখকের থেকে বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন।

পাঠক হিসাবে আমাদের দুঃখ এই যে সুকুমার রায়ের মতো একজন বিশিষ্ট রসস্রষ্টাও বিষয়গুণের জন্য 'অন্যান্য গল্প'-এ তেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেননি।

এই স্বতন্ত্রহীনতার অন্য প্রধান কারণ এই যে, এই গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই অনুবাদ-জাতীয়। কোথাও কোথাও অবশ্য হুবহু অনুবাদের বদলে মূল গল্পের ছায়াকে অবলম্বন করেছেন লেখক। কিন্তু যেখানে গল্পের বিষয়বস্তু ও ভাববস্তু লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়, সেখানে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা যে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? অথচ সপ্রতাপে আত্মপ্রকাশ করাই সুকুমার রায়ের সাহিত্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এই দ্বৈতভাবের কুণ্ঠা ও দ্বিধা অধিকাংশ গল্পেই ছায়া ফেলেছে।

শিল্পের মধ্যে যতই না কেন রংগরসিকতা করুন, সুকুমার রায় জ্ঞানে ও বিদ্যায় সর্বদা নিজের মননকে চর্চিত করেছিলেন। এবং চর্চার সেই ক্ষেত্রও

বড় সংকীর্ণ ছিল না। হাস্যরসের বিস্তৃত ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞান, রোমাঞ্চকর অভিযান, জীববিদ্যা থেকে শুরু করে ছবি ও টাইপোগ্রাফি – সকল বিষয়ে তিনি আপন চিত্তের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। আগ্রহের ও চর্চার এই বহুমুখিনতা যে রেনেশাঁস মনের লক্ষণ, তাও আমরা জানি। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-লক্ষণের পূর্ণ বিকাশ দেখা গেছে, এক অর্থে সুকুমার রায়ের জীবনে ও সাহিত্যেও তা ধরা পড়েছে।

এই আগ্রহী মননশীল লেখক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গল্প, প্রাচীন পুরাণ, রূপকথা-উপকথা-লোককথার যে-আস্বাদ নিয়েছিলেন, তাকেই প্রসাদের মতো তুলে দিলেন তাঁর 'সন্দেশ'র বালক-পাঠকদের হাতে। দূরপ্রাচ্যের চীন-জাপানী রূপকথা-উপকথা, মধ্যপ্রাচ্যের আরব্য উপন্যাস, বিভিন্ন দেশীয়, য়ুরোপীয় মিথ ও রূপকথার সংগে এদেশীয় পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, কথামালা, জাতকের গল্প প্রভৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

আগেই বলেছি, সর্বক্ষেত্রেই যে অনুবাদ মূলানুযায়ী হয়েছিল, তা নয়। যেমন ধরা যাক 'বুদ্ধিমান শিষ্য' গল্পটি। এটি 'জাতক' থেকে নেওয়া। মূর্খ শিষ্য সবকিছুকেই 'লাংগলের ঈশ'-এর মতো দেখছে। প্রথম দুটি পর্যবেক্ষণকে (সাপ ও হাতি) গুরু সঠিক বলে মেনে নিলেও (সাপের ফণা ও হাতির শুঁড়ের সংগে সাদৃশ্যবশত) তৃতীয় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেই ফাঁকি ধরা পড়ল। যখন শিষ্য গুড়-জল বা দৈ-গুড়কেও ঐ-মতো দেখল। কিন্তু জাতকের গল্পের শেষে গুরু শিষ্যকে লাংগলের দ্বারা চাষবাসের পরামর্শ দিচ্ছেন, সেবাপ্রাপ্তির স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে। সেখানে সুকুমার তাঁর গল্পে শিশুকেই মূল চরিত্রের সম্মান দিয়ে তাকে দিয়েই শেষোক্তি করিয়েছেন 'এদের কিছুই বোকা গেল না। ঐ কথাটাই ত ক'দিন ধরে বলে আসছি, শুনে গুরু রোজই ত খুশী হয়। তাহলে আজকে কেন বলছে 'দূর দূর'। দুত্তারি। এদের কথার কিছুই ঠিক নেই।' অর্থাৎ বোকার কথা গুরুকে যেমন অবাক করেছিল, গুরুর ব্যবহারেও যে বোকা শিষ্য ততটাই হতবাক, তা দেখিয়ে লেখক হাস্যের মাত্রাটি যুক্ত করেছেন।

কিংবা 'নাপিত পন্ডিত' গল্পটি। এটি 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা' বা এদেশে পরিচিত 'আরব্য উপন্যাসে'র একটি গল্পের অনুবাদ। এক ধনীপুত্র কীভাবে কাজীর মেয়ের সংগে অবৈধ প্রণয় করতে গিয়ে নাপিতের বকবকানি ও অতি-আগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত হল, তাকেই এই গল্পে ধরা হয়েছে। সুকুমার অবশ্য অবৈধ প্রণয়কে বিবাহেচ্ছায় রূপান্তরিত করেছেন। তৎকালীন আরবী সমাজের উঁচুমহলে যৌন জীবনের নীতিহীনতা ও চোখ-ঝলসানো আড়ম্বর সবই আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলিতে উদ্ভাসিত। মূলত ছোটদের জন্য লেখা গল্প, তাই ঐভাবের রূপান্তর ঘটিয়ে গল্পগুলির বৌদ্ধিক চমককে অবিকৃত রেখেছেন লেখক। এই গল্প-পাঠের একটি বিশেষত্ব এই যে পাঠক ধনীপুত্রের সংগে নিজেকে এক করে দেখলে এই গল্প একধরনের টেনশন জাগায়। সেক্ষেত্রে নাপিতের প্রচলিত ধূর্তামির সংগেই এই বোকা-সাজা শয়তান নাপিতের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। আর একটু নৈর্ব্যক্তিকভাবে পড়তে পারলেই হাসির বর্ণনাধারায় স্নাত হতে পারা যায়।

'অন্যান্য গল্প'র পরবর্তী গল্পটি 'বুদ্ধিমানের সাজা'। এটিও আরব্য রজনীর গল্প থেকে গৃহীত। নাপিতের ধূর্তামি এখানে ম্লান হয়ে গেছে খলিফার বুদ্ধির কাছে।

'কথামালা'র একটি কথাকে হুবহু তুলে নিয়েছেন লেখক 'টাকার আপদ' গল্পের মধ্যে। গল্পটি পরিসরে ও কাহিনীর দিক দিয়েও খুবই ছোট। গল্পের নামটি কাহিনীর মধ্যে ব্যাখ্যা করতে করতেই কাহিনীর প্রাণ ফুরিয়ে গেছে। টাকার জন্য বাঁচা, না বাঁচার জন্য টাকা – এই নীতিচিন্তাই গল্পের ভাববস্তু। ধনী ব্যবসায়ী অনেক টাকার মালিক হয়েও অসুখী অথচ তার প্রতিবেশী গরীব মুচি সারাদিন পরিশ্রম করে খেয়ে-দেয়ে সুখে ঘুমায়; বড়লোক ব্যবসায়ী মুচিকে কিছু টাকা দান করতেই মুচির মনে টাকা চুরি যাওয়ার চিন্তা এল। দুশ্চিন্তায় ভুগে সে আবার ধনীটিকে টাকা ফেরৎ দিয়ে সুখী হল, এই হল গল্পের বিষয়বস্তু।

এই বইয়ের কোনো কোনো রচনাকে ঠিক গল্প বা কাহিনী আখ্যা দেওয়া যায় না। যেমন 'খুকীর লড়াই দেখা'। এটি একেবারেই সংবাদ-পরিবেশনের

ঘটনাই লেখককে আকৃষ্ট করে থাকবে।

এছাড়া 'ছয় বীর' ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনার বিবরণ। দুশো বছর পূর্বে ইংলন্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ড ফ্রান্সের 'ক্যালে' অবরোধ করলে দুর্গের ছয়জন বীর কীভাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন সকলের স্বার্থে, সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনাই এই গল্পের প্রাণ। তবে এই ছশো সাড়ে ছশো বছরে সেই ঘটনার উপর দিয়ে সময়ের ব্যবধান কিছুটা কল্পনার মায়া রচনা করেছে বৈকি?

হান্স এন্ডারসনের রচিত মায়াময় রূপকথার গল্পগুলি, গ্রীম ভাইদের দ্বারা সংকলিত বিভিন্ন রূপকথা-উপকথার কাহিনী, গ্রীক মিথ, বাইবেলের গল্প, চীন-জাপানী উপকথা, আরব্য রজনীর গল্প – এসবই সুকুমারকে বিদেশী পটভূমিকায় লেখা কাহিনীগুলি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। যদিও হান্স বা গ্রীম ভাইদের কোনো গল্পের অনুবাদ তিনি করেননি, তথাপি হান্সের মায়াময় সৌন্দর্যময় নরম স্বপ্নময় জগতের পরিবেশ 'ভাগ্য তারা'র মতো গল্পের রসপরিবেশের সঙ্গে উপযোগী।

আবার গ্রীক উপকথার অন্যতম নায়ক 'হারকিউলিস'ও তাঁর গল্পের বিষয় হয়েছেন। এটিও ঠিক গল্প নয়, গল্পের ঢঙে বলা জীবনকাহিনী। জীবনী থেকে গল্প জন্মাতে পারে, কিন্তু এখানে সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ নেই, যার দ্বারা বিশাল একটি পরিমন্ডল থেকে এক টুকরো অংশকে বেছে নেওয়া যায়।

সর্বমোট বারোটি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছিলেন হারকিউলিস। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডীর নায়কদের সঙ্গে তাঁর এইখানেই মিল যে বারবার তাঁকেও নিয়তির সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। জুনোর চক্রান্তে পাগলের মতো হয়ে যখন নিজের স্ত্রী-পুত্রকে হত্যা করেন বা সেন্টর (যাদের উপরিভাগ মানুষের মতো, নিম্নাংগ অশ্বের)-হত্যাকালে নিজের গুরু চীরণকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেরে ফেলতে বাধ্য হন, তখন আমরা বুঝতে পারি যে দৈবের বিরুদ্ধে এই অসম যুদ্ধে মানুষের জেতবার কোনো সম্ভাবনা নেই। তথাপি তাকে কাজ করে যেতে হয়, সিসিফাসের মতো গড়িয়ে-পড়া পাথরটিকে ঠেলে তুলতে হয়। 'হারকিউলিয়ান টাস্ক' কথাটার মানে যে কী, তা এই কাহিনী পড়লেই বোঝা যাবে। ফলহীন এই কার্যক্রমকে আমাদের প্রতীকী বলে মনে হয়।

'অর্ফিউস' গল্পটিও বিখ্যাত গ্রীক-মিথ। এই গল্পে দুটি বস্তু প্রমাণিত হয়েছে। এক, মনের অবস্থানুসারেই বহিঃপ্রকাশের তর-তম ঘটে। অর্ফিউসের বীণাধ্বনি আসলে তার চিত্তের প্রকাশ। সুখীমনে একরূপ, আবার দুঃখের দিনে সম্পূর্ণ অন্যরকম। দুই, জুপিটারের পৌত্র অ্যাপোলোর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্ফিউসের ভাগ্য বিশ্ববিধানের অন্তর্ভুক্ত। সে যমপুরী থেকে তাই নিজের পত্নীকে নিয়ে আসতে পারেনি। পিছনে ফেরার ব্যাপারটা আসলে দৈবী ছলনার প্রতীক।

স্ত্রী লিলিংসী। এরা কোনোদিন আয়না বস্তুটি, ফলে আত্মপ্রতিকৃতি দেখেনি। প্রথম আয়নায় নিজেকে দেখার পর কিকিংসুম তার পিতার ছবির কথা ভেবেছে, তার স্ত্রী দেখেছে একটি সুন্দরী রমণীর মুখ, গ্রামের বুড়ো 'বজ্রে' ঠাকুর তাতেই প্রাচীন মহাপুরুষের ছাঁয়া দেখেছে। আয়নায় এইভাবে তারা নিজেদের আবিষ্কার করল। তাদের অজ্ঞানতাজাত কৌতুকের মাত্রা ছাড়াও নিজেদের সম্পর্কে তাদের ধারণাও এর ভিতর প্রকাশিত। এই প্রসংগে মনে পড়ে যায় জাপানী চিত্র-পরিচালক কুরুসোয়ার বিখ্যাত 'রশোমন' চলচ্চিত্রটির কথা। সেখানেও বিভিন্ন লোক একই ঘটনাকে বিভিন্নভাবে দেখে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলছে। আয়নাকে একটি

জড়বস্তু হিসাবে নিলে গল্পদুটির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যদি আয়নাকে একটি প্রতীক হিসাবে নেওয়া যায়, তাহলেই গল্পটির গভীরতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়তে হয়। এছাড়া 'দেবতার দুর্বুদ্ধি' ও 'দেবতার সাজা' গল্পের থর ও লোকি বিভিন্ন জার্মান পৌরাণিক কাহিনীর সুপরিচিত চরিত্র।

'অন্যান্য গল্প'র কয়েকটিতে অবশ্য সুকুমার রায় 'স্বরাজ্যে স্বরাট'। 'রাগের ওষুধ' এমনি একটি গল্প। 'কেদারবাবু বড় রাগী লোক। যখন রেগে বসেন, কান্ডাকান্ড জ্ঞান থাকে না।' মাস্টারমশাই তাকে রাগের মুহূর্তে একশ গুণতে পরামর্শ দিলেন। একদিন খেলুড়েদের গুলি তাঁর পায়ে লাগতেই কেদারবাবু 'রেগে আগুন তেলে বেগুন' হলেন। কিন্তু মাস্টারমশাইর পরামর্শ-মতো তিনি গুণতে শুরু করেন। কিন্তু গণনকালে লোকের উৎসুক্য, উৎপাত ও কৌতুকবোধ তাঁকে আরও চটিয়ে দিল।' তিনি দুই চোখ লাল করে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন 'ছিয়ানব্বুই-সাতানব্বুই-আটানব্বুই-নিরেনব্বুই-একশো – কোন হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যাবাদী বলেছিল একশো গুণলে রাগ থামে?' বলেই ডাইনে বাঁয়ে দুমদাম লাঠির ঘা। বয়স্ক লোকের এবম্বিধ ছেলেমানুষী রাগের প্রকাশ

'পালোয়ান' গল্পটিও সুকুমার রায়ের নিজস্ ঘরানার সৃষ্টি। প্রথমত, পরিবেশের দিক দিয়ে 'স্কু স্টোরি' হওয়ার ফলে 'পাগলা দাশু'কে মনে পে পাঠকের। দ্বিতীয়ত, গল্পকথনের কৌশ সকৌতুকে বর্ণনা করায় এটি আরও আকর্ষণীয় হ উঠেছে। তাছাড়া গল্পের মর‍্যালিটিও ঋজু চরিত্রের। এমনকি শারীরিক বিক্রমও যে প্রধান কৌশলের উপর বা শারীরিক কৌশলের উপ নির্ভর করে না, বরং মানসিক সাহসের উপরই নির্ভ করে, এটিই গল্পের ভাববস্তু।

কিন্তু গল্প জমেছে পরিবেশ তৈরি নৈপুণ্যে। উত্তমপুরুষের জবানীতে গল্পারম্ভ স্কুলের কয়েকজন বন্ধুর কথা। ক্রমশ তৃতী অনুচ্ছেদে এসে বিরুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করেছে লেখক। 'ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলি বেজা ডানপিটে।' এই বাক্যের সংগেই বিবদমা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমশ সার্থক ঘটনা জালে উঠে এল আত্মপক্ষের চারটি ভিতু ও একটি বাঙাল গোঁয়ার চরিত্রের ছেলে। 'ডানপটকান 'পাল্টা রোখ', 'ল্যাংমুচ্‌কি' প্রভৃতি কৌশল 'পালোয়ান'-এর কোনো কাজেই আসেনি চরিত্রবলই জয়যুক্ত করেছে অপটু শরীরে ছেলেটিকে – চরম ঘটনার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হ গেল। 'কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচি না, সেটি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।' বলাই বাহুল অন্য অর্থে, ব্যঙ্গার্থে।

আত্মাভিমান যে মানুষকে কীরূপ অন্ধ করে সাধারণ কান্ডজ্ঞানশূন্য করে তোলে, তার উদাহর 'হাসির গল্প।' ব্যর্থ হাস্যরস সৃষ্টির বিষয়বস্তু এ গল্পে সার্থক হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। পোস অফিসের বড়বাবুর ধারণা যে তিনি মানুষকে হাসি গল্প বলে হাসানোর বিরল ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু হাস্যরস সৃষ্টির কোনো ক্ষমতাই তাঁকে দেননি ঈশ্বর। তার ওপর গল্পের ভান্ডারও তাঁর সীমিত চেনা গল্প শুনে পাঠকের ক্লান্তি আসে, 'কিন্ বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটিকুটি।' কথনশিল্প হিসাবে তাঁর ব্যর্থতার এও এক কারণ। তিনি নিজে অন্তর্ভুক্ত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন গল্প বলার সময় শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর ব্যর্থতা ও শ্রোতৃবর্গে নিষ্ঠুরতা এই গল্পে একটি করুণ রসের আবহাওয় তৈরি করে।

সুকুমার রায়ের 'প্রফেসার হুঁশিয়ার' যদি সত্যজিৎ সৃষ্ট 'প্রফেসার হিজিবিজিবিজ্‌'-এর পূর্বসূরী হন, তবে 'সত্যি' গল্পের প্রফেসা নিধিরামের মধ্যে সত্যজিৎ-সৃষ্ট প্রফেসার শঙ্কু ক্ষীণ মিল পাওয়া অসম্ভব হবে না। শঙ্কুর প্রখ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সাধারণভাবে জ্ঞানদীপ্ত ম শঙ্কুর গল্পগুলিতে একধরনের সিরিয়াস-ভাব যুক্ত করেছে। সর্বদা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষিত না হলেও তাঁর তত্ত্বগুলি সম্ভাব্যতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় না; অথচ বিশ্বাস ও কল্পনার রেখাটিকে বহুদূ টেনে নিয়ে গিয়ে এক আশ্চর্যের জগৎ তৈরি করে শঙ্কু যেখানে পাঠকের শ্রদ্ধার পাত্র, নিধিরা

সেক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার কিম্ভূত প্রচেষ্টায় সরাসরি হাস্যরসের সৃষ্টি করে। সিরিয়াস রসসৃষ্টি করা নির্ধিরাম বা তার স্রষ্টা সুকুমার রায়, কারুরই প্রার্থিত ছিল না।

'ঠুকে মারি আর মুখে মারি' গল্পে নীতিকথাই প্রবল। শরীরের বল অপেক্ষা বুদ্ধিবলের জয়ই গল্পের ভাববস্তু। গল্পের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে দুটি উৎস থেকে: এক, চরিত্রচিত্রণে ব্যবহারিক অতিরেক থেকে ও দুই, অপ্রত্যাশিতের অবতারণা করে। 'ঠুকে মারি'র শারীরিক বল বর্ণনাতেই প্রধানত অতিরেক এসেছে। আর 'মুখে মারি'র স্ত্রী এবং সেয়ানা খোকার জবানীতে ('টুনটুনির বই'-এর 'বাঘখেকো শিয়ালের ছানা' গল্পটিকে মনে পড়ে) এসেছে অপ্রত্যাশিত ও অঘটনের স্বাদ। গল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠুকে-মারির হঠাৎ পলায়ন তার অনার্য-চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছে। যুক্তি ও বিচারবোধের সাহায্যে সে নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়নি। যেভাবে বিরাট বলশালী হওয়া সত্ত্বেও কালকেতু শত্রুর ভয়ে অন্দরে পালিয়েছিল, এও খানিকটা তেমনি। গল্পের শেষাংশ দুর্বল, এই অংশের বিস্তার বলা-বাহুল্য। পাঠক কোনো নতুন তথ্য এখানে পাচ্ছে না।

এছাড়া এই বইতে 'বাজে গল্প' নামে তিনটি গল্পকে রাখা হয়েছে। প্রথম গল্পটি সার্থকনামা। বিশেষত্বহীন গল্প এটি। একটি করে ইন্দ্রিয়ের খুঁত ছিল দুই বন্ধুর। ফলে বহির্পৃথিবীকে তারা দুইভাবে গ্রহণ করেছে। এ-থেকেই ইঙ্গিতময় ভাষা ও ভাব দ্বারা – কোনো মানুষের অভিজ্ঞতাই যে সম্পূর্ণ নয় – এই সাধারণ রূপকের সৃষ্টি হতে পারত; হয়নি।

দ্বিতীয় গল্পটির দুই অংশ। প্রথম অংশে দেখি প্রত্যেকে একটি ছবি দেখে যে-যার মতো প্রশংসা করছে। গল্পের দ্বিতীয়াংশে এসে কিন্তু দেখা গেল যে, সেই প্রশংসাও ভুল ছবি সম্পর্কে। প্রথম দর্শনে তাদের আসল চিন্তা যে কী হয়েছিল, সেই সত্যও এইবারে বেরিয়ে এল। চরিত্রগুলির ভূমিকার পার্থক্য ও ছবিটি ভুল প্রমাণিত হওয়ায় অবস্থার বিভিন্নতা এই গল্পে একধরনের ব্যঙ্গজাত কৌতুকের জন্ম দিয়েছে।

এই নামের তৃতীয় গল্পে দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি লোক একস্থানে জড়ো হয়েছে এবং সেইখানেই একটি ঘটনা ঘটছে। তখন প্রত্যেকেই সেই ঘটনার আংশিক তথ্য জেনে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কেউই পূর্ণ সত্যে পৌঁছতে আগ্রহী হয়নি। রসের চরম (যাকে গল্পের 'কীক্' বলে) ঘটেছে, যখন দেখি যে কিছু না বুঝেই অনাদের কাঁদতে দেখে 'ঠাকুমা' চরিত্রটি এতক্ষণ কেঁদেছিলেন।

উপরোক্ত তিনটি গল্পকে এক বন্ধনীর মধ্যে রাখা যায়; কারণ বিভিন্নভাবে এখানে লেখক একই সত্যের পরীক্ষা করেছেন। খণ্ড ও পূর্ণতা, আংশিক সত্য ও সম্পূর্ণ সত্য, আপেক্ষিকতা, – এই ব্যাপারকেই বিভিন্ন গল্পের ঘটনায় ধরার চেষ্টা হয়েছে।

'দানের হিসাব' গল্পটি এক অর্থে 'পাগলা দাশু'র 'ভুল গল্প'র সমতুল। 'ভুল গল্প'-এ যদি তথ্যভ্রান্তিগত ধাঁধা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে এখানে ধাঁধাটি অঙ্কশাস্ত্রের, হিসাববিদ্যার। কৃপণ ও স্বার্থপর রাজা কীভাবে সন্ন্যাসীর অর্থনৈতিক বুদ্ধির কাছে হার মানলেন, তাই গল্পের বিষয়বস্তু। রাজা যে দরিদ্র জনতারই প্রতিনিধি বা নেতা, একথা ভুলে তিনি শুধু ধনসঞ্চয় করছিলেন প্রজাকে বঞ্চিত করে। অথচ অর্থনীতির একটি প্রচলিত কথাই হল 'মানি ইজ্ হোয়াট মানি ডাজ্'। গরীবকে মেরে গরীবকে সাহায্য করাতেও রাজা ওস্তাদ। শেষে তিরিশ দিনে এক পয়সার দ্বিগুণ-ক্রম কীভাবে 'এক কোটী সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো পনের টাকা পনের আনা তিন পয়সা'য় দাঁড়াল, তাই-ই গল্পটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়মাত্রা যুক্ত করেছে। অর্থাৎ 'ভুল গল্প'র মতো এটি শুধু ভ্রান্তির দলিল নয়, এই গল্পটিতে মানবিকতা ও রাজার কর্তব্য সম্পর্কিত বোধ যুক্ত হয়েছে।

'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'কে বর্তমান আলোচনাস্তরের বাইরে রাখা হল। কারণ যদিও 'অন্যান্য গল্প'র অন্তর্ভুক্ত, তথাপি উক্ত গল্পটি ও 'হযবরল'কে একসঙ্গে আলোচনা করা উচিত। উদ্ভট রসের গল্পের দুটি অনবদ্য অথচ স্বতন্ত্র প্রকাশ হিসাবে এরা পাঠকের মনোযোগ দাবি করে।

আবহমান

অমর মিত্র

রোগা লিকলিকে দেহটা গাছ বেড় দেওয়া দড়ির উপর কোমরে ভর দিয়ে এমনভাবে ঝুলে আছে যেন আকবর মণ্ডলের ছেলে মইদুল মণ্ডলের আকাশে ওড়ার সাধ হয়েছে। শুকনো মাংসহীন দুটো পা খেজুর গাছের কাণ্ড এমনভাবে ছুঁয়ে আছে যেন এই এখনই শুকনো হাত পা দেহ নিয়ে মইদুল উঠে যাবে অঘ্রানের নির্মেঘ নীলিমায়। মইদুল গাছ কাটছিল, দুটো পাতা ঝপ ঝপ নিচে এসে পড়ল।

নিচে গুটি গুটি হাজির হয়েছিল আকবর, সে চিৎকার করল, 'ও হাসান ও হোসেন পাতাগুলোন লে যা, জ্বালন হবে।'

হাসান হোসেন মইদুলের দুই বেটা, একটা তার বিবি সোনাভানের আগের পক্ষ রফিকের, আর একটা এই মইদুলের। হাসান হল গিয়ে মইদুলের হাঁটানো ছেলে, তার এটা প্রথম পক্ষ হলেও, বিবির দ্বিতীয় পক্ষ।

হাসান হোসেন এল না। কোথায় কোন মাঠেঘাটে পথের উপর ধুলোয় পড়ে আছে কে জানে। এদিকে মইদুল খেজুরগাছ কেটে তার গায়ের সাদা মাংস ছুঁড়ে দিচ্ছিল নিচে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তা পড়ছিল আকবরের আশপাশে।

'বাপ মোচ খাবা তো খাও'—চিৎকার করল মইদুল।

আকবর হাঁ করে উপরের দিকে চেয়েছিল। গাছ ছাড়িয়ে ওই চোখ গিয়ে বিঁধেছে আকাশের নীলে। ধূসর নীল সাদায় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। গাছের মোচ নিচে এসে পড়তেই আকবর ছুটে গেল। কুড়িয়ে নিয়ে জবাগাছটার ছাযায় বসে চিবোতে লাগল। খিদে পেয়েছিল খুব, এখন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একি! মইদুল যে নেমে আসছে! আকবর হেঁকে উঠল, 'ও মুইদুল ভাড় পাতপিনে?'

গাছ থেকে ঠিক যেন হনুমানের মতো নেমে এল তার ছেলে। নামতে নামতে বাপের কথার জবাব দিল না। নেমে এল মইদুল, সত্যিই ভাঁড় না পেতে নেমে এল উপর থেকে। দুবার তো কাটা হল, আবার কবে ভাঁড় পাতবে?

আকবর মোচ চিবোতে চিবোতে এগিয়ে গেল ছেলের কাছে, 'পরের ফালায় পাতপি ভাড়?'

মইদুল জবাব দেয় না। পরের ফালা মানে আবার ছদিন বাদে যখন কাটা হবে গাছ, তখন যদি রস হয়। আকবর ছেলের কাছ থেকে মনের মতো জবাব চায়। ছেলে বলল, 'বাপ তোর ওগাছ শুকোয়ে গেছে, ওতে আর রস হবে না।'

আকবর হাঁ করে গাছের দিকে চেয়ে থাকে। মোচগুলো যেন রস-কস শূন্য লাগে চিবোতে গিয়ে। সত্যিই কী ও গাছে আর রস হবে না, কী জানি! সে ঘুরে তাকাল ছেলের দিকে। মইদুল তখন রোদে বসে জিরোচ্ছে, আর গাছের শুকনো মোচ চিবোচ্ছে। কাজকম্মের কোনো হদিশ নেই। এবার কী ভিটে মাটি বেচতে হবে। খরায় এ তল্লাটের সব পুড়ে শেষ। অঘ্রান মাসের মাঠে ধানের গোড়া দেখা যায় না, গোগাড়ির চাকার পথও দেখা যায় না। মাঠে এবার গাড়িই যায়নি। কারো উঠোনে ধানের বোঝা নেই।
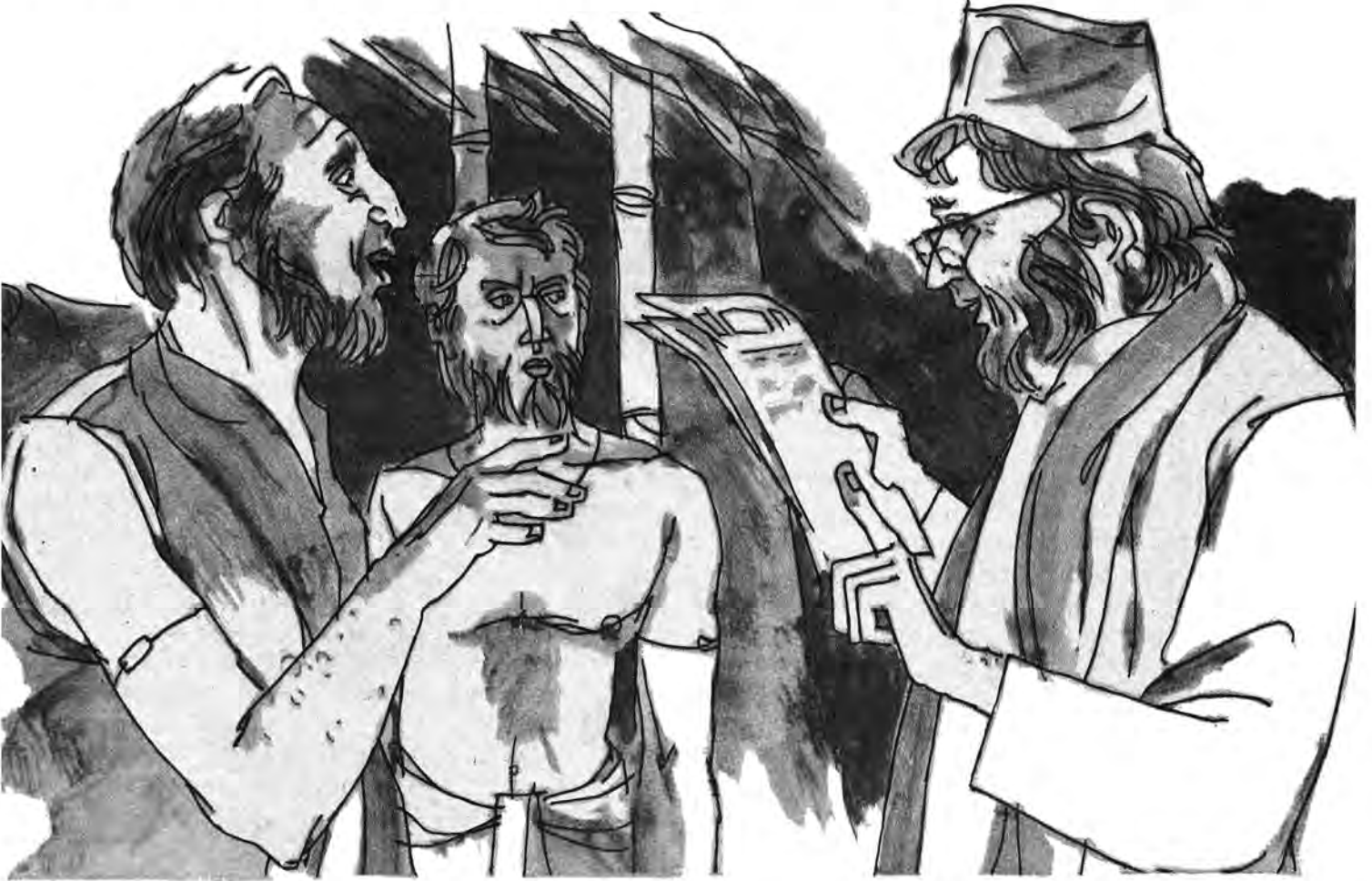
আকবর ছেলের দিকে তাকাল। বুকের হাড় যেন ঠেলে বেরোচ্ছে। হাঁপাচ্ছে আর গাছের মোচ চিবোচ্ছে। কি বলল যেন ? গাছে রস হবে না। কই গাছের মাথা দেখলে তো বোঝা যায় না। খরার জন্য গাছের রসও শুকিয়ে গেল। কিন্তু ছোট ওই দুটো গাছে তো ভাঁড় পেতেছে মইদুল। গাছ দুটো যেন যমজ বামন। বাড় নেই, কিন্তু রস হয় ভালো।

অঘ্রান মাসেই এবার ভাতের টান। বিঘেটাক জমিতে যে আধ-পোড়া ধান হয়েছিল তা মইদুল কেটে নিল। ধান তো নয়, যেন ধানের প্রেত ছায়া যেমন এই মইদুল আর আকবর, এককালে মানুষের মতো ছিল, এখন যেন প্রেতের কথা স্মরণ করায়।

মইদুলের বিবি ঘটিতে করে জল আনল, ঢক ঢক করে খালি পেটে জল খেয়ে বুকের গোড়ায় ব্যথা পেল যেন মইদুল। জিরোতে জিরোতে ছোট ছোট গাছ দুটোকে দেখল। বেলা পড়ে এল। গাছের ছায়া বড় করে বেলা পড়ে এল। শীত তেমন পড়েনি এবার। মইদুল দেখছিল অঘ্রানের বেলা নির নির করে ফুরিয়ে বিন্দু হয়ে যাচ্ছে। আকবর মণ্ডলের ছেলে হেঁকে উঠল, 'কানে শুনতিছিস, তোর কপাল খারাপ বাপ।'

ঠিক তখনই আকবর উঠে দাঁড়ায়। মাথায় এতক্ষণে ঢুকল ব্যাপারটা। বলছে কি বেটা ? ওই যমজ বামন গাছ দুটো তো তার, আর শুকনো মরা গাছটা মইদুলের। এখন কিনা ও মরা গাছটা তার ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

আকবর বলল, 'তুই আবার আগের মতন আরম্ভ করিছিস মইদুল।'

মইদুল চমকে উঠল, 'কি বলতিছিস বাপ ?'

—'যা বলতিছি তা বোঝনের বয়স হয়েছে তোর, বে করিছিস অন্যলোকের বিবিরে, অত বোঝ এটা বোঝ না ?'

মইদুল থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। বিয়েতে বাপের মত ছিল না এটা সত্যি, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়। তার বিবি সে বুঝবে, তাতে কার বাপের কী ! আকবর তার ছেলের সামনে হাত পা নেড়ে বলে, 'ওই শুকনো গাছ তোর, দানপত্তর হেবানামায় তাই আছে, আর ওই যমজ বামন দুটো আমার।'

ছোট ছোট দুটো গাছ যেন অঘ্রানের শেষ বেলার রোদে হাওয়ায় মাথা দুলোচ্ছিল। চিকন সবুজ পাতায় ঝাকড়া মাথা গাছ দুটোকে যমজ মনে হয়। তার গায়ে দু ফালার পর মইদুল একটু আগে ভাঁড় পেতেছে। গাছের মুখ দেখলেই মনে হয় রসবতী। এখন যেমন রোদের গাঢ় লালচে রঙ হয়েছে, সেই রঙই শুষে নিচ্ছে গাছ। ভারি লাল জিরেন রসের স্বোয়াদ হবে খুব। কিন্তু বড় গাছটাকে দেখ ! শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আর ক্ষমতা নেই মাটির খুব গভীরে শিকড় নামানোর। মাটির রসই তো শিকড় বেয়ে উঠে ওর সারা অঙ্গ রসবতী করে তুলবে।

বাপের কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠল মইদুল। বলে কি বুড়ো ? গত বোশেখে না ভাগ হল। ভাগ করে দিল বুড়ো নিজে। সবই দানপত্র করে দেবে ঠিক করেছিল, শুধু কার লাগানি শুনে দশকাঠা জমি আর একটা খেজুর গাছ রেখে দিল নিজের জন্য। ও জিনিস মইদুল পাবে বাপের মাটি নেওয়ার পর। কিছুই রাখত না বাপ, কিন্তু রাখল হায়দার আলির কথা শুনে। হায়দার আলির সঙ্গে খটাখটি আছে মইদুলের। দুজনে শিয়ালদা মার্কেটে বেগুনের কারবার করতে গিয়ে একসঙ্গে ঝাড় খেয়েছিল। বেদম লোকসানে পথে বসে গিয়েছিল মইদুল। সব্বোনাশটা হায়দারই করেছিল। ও একটু আধটু লেখাপড়া জানে। তরতর করে খবরের কাগজ পড়ে, হিসেব করে। মইদুল গাঁয়ে বলল, 'হায়দার আমারে পথে বসালো, টাকা সব ও মেরে দেছে।' হায়দার এই শুনে জবাব দিল, 'কে কারে পথে বসায়, কারবারে লাভ-লুসকান আছে।'

জবাবটা জুতসই হয়নি। হায়দার আলি শোধ নিল অন্যভাবে। না হলে তো সব গুছিয়ে এনেছিল মইদুল। আড়াই বিঘে সম্পত্তি, তাতে ভিটেবাস্তু ধানী জমি গোরস্থান আর গোরস্থানের উপর বাঁশ ঝাড় আছে। আর আছে তিনটে খেজুর গাছ। এই সম্পত্তি বাপের কাছ থেকে লিখে নিতে কোনো কষ্টই হবে না ভেবেছিল। আর বাপও তো বেশ বুড়ো হয়েছে, তার সংসারে খাবে-দাবে আর নাতি কোলে করে চাঁদ দেখাবে, এছাড়া তার কাজ কি ? প্রস্তাব শুনে বুড়ো আকবর তো হেসে কুটি-কুটি, বেশ তাই হবে। ছেলের সংসার তো তাকে গুছিয়ে দিতে হবে। একটা ভুল করেছে মইদুল, বিয়ে করা মেয়েমানুষ বিয়ে করে। আর ভুল যেন না করে। এখন দানপত্র না করে দিলে আকবর মাটি নিলে কত শরীক যে এসে হাজির হবে ঠিক নেই। কথায় বলে মোছলমানের সম্পত্তির সব ভাগ হয়, মুরগির নখ পর্যন্ত। ফারাজের এমনই মহিমা। কে কোত্থেকে ফারাজ নিতে হাজির হবে ! ফারাজ হল সম্পত্তির ভাগ।

দলিল করে নেয়ার মন্ত্রণা দিয়েছিল মইদুলের বিবি। কারবারে লোকসান খাওয়ার পর থেকে বোকা মানুষটাকে সে চালাচ্ছে। কিন্তু সব হয়েও শেষ রক্ষা হল না। বুড়ো আকবর একটু বেঁকে বসল।

আকবর বলল, 'দশকাঠা জমি আর একটা খাজুর গাছ আমার থাকপে, আমি মাটি নিলি ছেলে পাবে, সব ছাড়ব না, শেষ বয়স- !'

হ্যাঁ শেষ বয়স, যদি একটু রস খাবার ইচ্ছে হয়, গুড় করার ইচ্ছে হয় তো ! আর জমি তো লাগবেই। বেগুন লঙ্কা করতে হবে, তা বেচে তামাক বিড়ি, লুঙ্গি এসব হবে। শেষ বয়সে একেবারে ছেলের হাতে পড়া কি ঠিক ?

হায়দার আলি আকবরকে বুঝিয়েছিল, 'তোমার ছাওয়াল তুমি বুঝবা চাচা, আমার কোনো রাগ নেই, কারবারে লুসকান তো আছেই, তাই বলে কড়া মানুষ পাটনারের নামে অপবাদ দ্যায় ! ওর মাথায় কিছু নেই, সব চালাচ্ছে ওর বউ, দুবার বে-করা মেয়েমানুষ, সে বলেছে, তাই আমারে অপবাদ দেছে, বিবি বলেছে তাই দানপত্তর করাচ্ছে তোমার ছাওয়াল, তা কর। কিন্তু ঘরে যার অমন বিবি, সে কি তোমারে কিছু দেবে, ধরোগে—'

আকবর অবাক হয়ে হায়দার আলির কথা শুনেছিল হাটে দাঁড়িয়ে। গাঁয়ের ভিতরে হায়দার আলি বুদ্ধিসুদ্ধিতে নাম করা। উকিল মোক্তারের মতো মন্ত্রণা দিতে পারে। প্যাঁচ-পয়জার ওর মতো কেউ জানে না।

'—হ্যাঁ, ধরো গে ছাওয়ালের হাতটান, সব রস গুড় করে বেচে দেবে, না হয় গাছই রসের সিজিনে বেচে দিল, শেষ বয়সে এটটু রস খাতি ইচ্ছে হলিও, পাবা না।'

শেষ কথাটাই আকবরের অন্তরে লাগল। এরকম খাঁটি কথা কেউ বলেনি। আকবর মণ্ডল বেঁকে বসল। হায়দার আলি প্রতিশোধটা এইভাবেই নিল। এমন বিষ ঢুকেছে বুড়োর মনে, যে যখন তখন হামলা বাধায়। এই যে এবার খরায় সব পুড়ে গেল, এক বিঘের ধান বাঁচল কোনো রকমে, আকবর বলল, ওর থেকে দশ কাঠা তার, অর্ধেক ধান দিতে হবে, ধান বেচবে মইদুলের বাপ।

মইদুল যত বোঝায়, 'বাপ তোর ভুল হচ্ছে, তোর দশ কাঠায় না তুই লঙ্কা বেগুন করলি, শুকোয় পুড়ে বেগুনের গা চামড়া হয়ে গেছে, এ ধান আমার।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সেই মরা বেগুন ক্ষেতে কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে বুড়ো আকবর চিৎকার করতে লাগল। সম্পত্তি হেবানামা করে দিয়ে যেন লোভ বেড়েছে আকবরের। শেষে দশজনকে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয় বুড়োকে। পেটেভাতে তো বাপ আছে তার ঘরে। ধান বেচে কী এণ্ডির চাদর কেনার সময় এখন ! সেকাল আর নেই গো। ওসব হল আর জন্মের কথা। পেটে ভাত এবছর জুটবে না, সে খেয়াল আছে বাপ তোর !

দানপত্র হেবানামায় লেখা আছে দাতা আকবর মণ্ডলের মৃত্যু ইস্তক তাহার যাবতীয় ভরণপোষণের দায় মইদুলের। পিতার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট দশকাঠা জমি ও খেজুর গাছ গ্রহীতা মইদুলের নামে বর্তাইবে ইত্যাদি·····।'

দুই

বিবির নাম সোনাভান। বিবির আগের পক্ষে হাসান এপক্ষে হোসেন, এই দুই ছেলে। একটা হাঁটানো ছেলে নিয়ে মইদুলের ঘরে এসে উঠেছিল সে। সোনাভানের আগের পক্ষ আমিনপুরের রফিক মণ্ডল ভালো নয় মন্দ নয় দিনে দিনে পাগল হয়ে গেল। জমি-জমা আগেই বেচে খেয়ে শেষ করেছিল। পেট চলত না মাছের ভেড়ি পাহারায়। তখন মইদুল ওদিকে যাতায়াত করছে মাছের কারবার করার আশায়।

উপোসে দিন কাটত সোনাভানের। এই সময় রফিকের কাজ গেল। ভাদ্রমাসে ভেড়ির নোনা জল বিদ্যেধরীর খাড়ি পথে বের করে দিয়ে মালিক সেখানে ধান বুনবে। নোনা জল বৃষ্টিতে মিঠে হয়ে

গেছে। আবার মাঘ মাস নাগাদ মাছের চাষ আরম্ভ হবে। চাষের কাজে অন্য মুলুক থেকে সাঁওতালরা এসেছে। রফিক মণ্ডল বেকার হয়ে ঘরে এসে বসল।

লোকে বলে মইদুলের সঙ্গে নাকি সোনাভান বিবির তখন খুব মাখামাখি। মইদুলের ঘরে এসে ওঠার জন্য রফিককে পাগল করে দিল সোনাভান। আলোকলতার রস বেটে খাইয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছিল স্বামীর। ছ'ফুট বাঁশের মতো রফিক মণ্ডল এখন গাঁ-গঞ্জে ঘুরে বেড়ায় আর বলে, মাঘ মাসটা আসুক।

এক হাট লোকের ভিতর তার মাথা সবার উপরে। মাথার উপর বাঁধা ছেঁড়া গামছা যেন পতাকার মতো ওড়ে। স্বামী পাগল হলে সোনাভান বিবি দ্বিতীয় কাজ করে। পরের পক্ষ মইদুলের ঘরে ওঠে। কারবার করতে গিয়ে বিবি নিয়ে ফিরল মইদুল, সঙ্গে একটা হাঁটানো ছেলে। বিবির রূপও তখন দেখার মতো। যেমন রঙ তেমনি স্বাস্থ্য, না খেয়ে খেয়ে অমন রূপ রেখেছিল কিভাবে সেটাও রহস্য। লোকে বলে, স্বামীকে পাগল করে যে মেয়েমানুষ আবার নিকে করে, তার গা গতর থাকবে নাকি অন্যের থাকবে। ওই রূপ আর শরীরই তো ভুলিয়ে ছিল মইদুলকে। লোকে আরও বলে এখন মইদুল চলে ওই সোনাভানের কথায়।

বাপ-বেটা ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে শেষ বেলার রোদে বসেছিল। তখন মইদুল দেখল বিবি হাতছানি দিয়ে ডাকছে ভিটের কোণে দাঁড়িয়ে। মইদুল গুটি গুটি উঠে গেল। আকবর আড়চোখে তা দেখল।

বিবির নামে অনেক কথা শোনে মইদুল। হাটে মাঠে অপবাদ উড়ে বেড়ায়। আর ওই রফিক মণ্ডল না মরা পর্যন্ত লোকের কথা শেষ হবে না। পাঁচ বচ্ছর তো কেটে গেল। লোকের মুখ এখনো বন্ধ হয় না। ইদানীং মইদুলের মনে হয় যা রটে তার কিছুটা বটে। আলোকলতার রস বেটে খাইয়ে সত্যিই বোধহয় পাগল করে দিয়েছিল সোনাভান তার প্রথম পক্ষকে। না হলে পাগল হল কেন হঠাৎ!

আহারে! লোকটাকে হাটে মাঠে দেখলে ইদানীং কষ্ট হয়।

মইদুল ইদানীং তাই বিবির কথায় ওঠে বসে। বিবি বলল, তাই দানপত্র করার ব্যবস্থা করল বাপকে দিয়ে। নাহলে নাকি ও সম্পত্তি থাকত না। মইদুল বিবির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলতিছিস?'

সোনাভান চোখের ইশারা করে, কোঁদল হচ্ছে কেন?

দ্যাখদিনি, মইদুল সাক্ষী মানল বিবিকে, বাপ বলে ও দুটা খাজুর গাছ নাকি ওর, বড় গাছটা নিইল না বাপ!

বিবি মাথা নাড়ে, জানে না, কেননা জমি দানপত্রের আওতায় যাওয়ার এখনো বছর কাটেনি। এই প্রথম শীত এল। ভাগের শীত।

বিবি বলে, 'দলিলে যা আছে তাই হবে।'

—'সে তো শুনতিছে না, বাপের তো বড় গাছটা, কিন্তু মানতেছে না কিছুতেই।'

সোনাভান ঘোমটার আড়ালে বুড়ো শ্বশুরকে দ্যাখে, তারপর বলে, 'ঠিক আছে এটটু রস দেবানে বাপেরে, তাহলি তো হবে!'

—'কি করে হবে, রস আমি যে পেত্যেক দিন ব্যাচপো, তিন তিন ছ টাকা, কেডা দ্যায় বল এরাম অভাবের কালে?'

বিবি চুপ করে থাকল, মাথা দোলাতে লাগল। ঠিকই তো বলেছে মানুষটা। কটা দিন ওই রসই পেট বাঁচাবে। ও থেকে বুড়োর খেয়াল মেটাতে গেলে যে দিনভর উপোস দিতে হবে।

উপোস। শিউরে ওঠে মইদুলের বিউ।

তিন

হাতে পয়সা কড়ি নেই। অথচ কিছু কেনাকাটার তো ইচ্ছে হয়। নাতিটারেও কিছু দিতে ইচ্ছে হয়। আকবর ভেবেছিল রস বেচে শীতটা তোফায় কাটাবে। কিন্তু তা তো হবার নয়। কিন্তু যে যমজ বামনে রস দিচ্ছে সে গাছ দুটো তো তার বটে। দানপত্রে সব লেখা আছে।

কম তো তোরে দিইনি মইদুল। বাকি রেখেছি কি ? বড় ভুল করেছি দিয়ে। সব নিজের তাঁবে রাখলে ঠিক হতো। তখন কী জানতাম এমন হবে। দুটো ভাত ছাড়া আর কিছু পাব না। জানিনে আমি তুই কার বুদ্ধিতে চলিস মইদুল

একটা মানুষকে পাগল করে হাঁটানো ছেলে নিয়ে তোর ঘরে উঠল এসে। তুই ওর গতর দেখে ভুললি মইদুল। 'জেবনের পেথম সাদি কী লোকে এরাম করে, ও করল নিকে, তুই করলি সাদি, মিলল না, মিলল না বলেই তো যত অশান্তি সংসারে

দুপুরভর একা একা বসে আকবর মাথা নাড়তে থাকে। কাল বিকেল থেকে যে গোলমাল লেগেছে তা এখনো চলছে। এখন আকবর তার ছেলেকে বের করতে বলেছে দলিল। দলিলে যা লেখা আছে তাই হবে।

মইদুল ভাবছিল বাপের কী অন্য ইচ্ছে আছে। দলিল বাপের হাতে দেবে না, যদি ছিঁড়ে দেয়। এ নিঘ্‌ঘাত অন্যমানুষের কুমন্ত্রণার জের। নাকি তার বাপ পাগল হয়ে গেল খেজুর গাছের শোকে।

সে নরম হয়ে বলল, 'বাপ ওরাম করিসনে, পরের ফালায় বড় গাছটা কাটি, রস হলিও তো হতি পারে।'

আকবর গুম হয়ে বড় গাছটার দিকে তাকায়। কতকালের গাছ ! সেই ঠাকুদ্দার আমলের। কত রস টেনেছে মাটির। টেনে টেনে শুকিয়ে ফেলেছে মাটির বুক। মাটি এখন দুধশূন্য মা হয়ে ওর নিচে হাঁসফাঁস করছে। আর ওর ভিতরটাও তাই ঝাঁজরা হয়ে গেছে। দেহটা দ্যাখো ! এমন গাছের মাথায়ই তো বাজ পড়ে। গত সনে বর্ষা হয়নি, আসছে সনে কী হয় কে জানে !

—'ঠিক আছে বাপ, যহন তোর খাতি ইচ্ছে হবে— !' মইদুল বাপকে বোঝায়। আকবর তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল।

বিবি ডাকল মইদুলকে। মইদুলের মনে হচ্ছে বাপ তার পাগল হয়ে গেছে। এ তো মাথা ভালোর লক্ষণ নয়। শুধু শুধু খেজুর গাছের পিছনে লাগা। নাকি বাপের মাথায় মরা খেজুর গাছের ভূত চেপেছে। পাগল হলে মানুষের একটা বাই হয়, যেমন হয়েছে তার বিবির আগের পক্ষর, মাঘ মাসটা আসুক··· বাপের তেমনি খেজুর গাছ খেজুর গাছ··। খেজুর গাছ ছাড়া মাথায় কিছু নেই।

চমকে ওঠে মইদুল। তার বিবির কাণ্ড নাকি ! গোপনে আলোকলতার রস খাইয়ে দিল বুড়োকে। তাতেই হিতে বিপরীত হল নাকি ! মইদুল ভয়ে ভয়ে বিবির কাছে যায়।

সোনাভান বাক্স ঘেঁটে দলিল বার করেছে। মইদুলের হাতে দিয়ে বলে, 'নে যাও, দ্যাখো গে কী লেখা আছে, কার কোনডা, ফাঁকি দেচ্ছে কেডা কারে বাপের সঙ্গে বোঝ গে যাও।'

সোনাভানের গলায় ঝাঁজ। দলিল নিয়েই মইদুল ভোঁ ভাঁ। উঠোনে নেমে মনে পড়ে লেখাপড়া তাদের বাপবেটা কেউ জানে না। এখন লোক ডাকতে হবে। লোকে দলিল পড়ে যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে হবে। কী সব্বোনাশ !

চার

বিকেলে আজ দলিল নিয়ে যে কাণ্ড হল তাতে তখন থেকেই মইদুলের মাথায় একটা ব্যাপার খেলছে। বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে, দেখা যাক।

দলিল পড়তে লোকডাকা খুব ঝামেলার। কেউই আসতে চায় না, কেননা এক পক্ষের হয়ে বললে অন্যপক্ষ তার চোদ্দপুরুষ তুলে কথা বলবে। এই নিয়ে লেগে যাবে ধুন্ধুমার।

শেষে এল হায়দার আলি। তাকে ডেকে আনল আকবর নিজেই। হায়দার আলি গম্ভীর মুখে ভিটেয় দাঁড়িয়ে দলিল উল্টে-পাল্টে পড়ে বলল,, জোড়া খেজুরগাছ পড়েছে আকবরের ভাগে, মানে দলিলদাতার ভাগে।

মইদুল তখন বলেছে, 'ঠিক করে পড়।'

—'ঠিকই তো পড়তিছি, নাইলি তুই পড়।'

ছুটে এল আকবর, 'ও বেটা পড়বে কী, ওর বাপের ক্ষমতা আছে দলিল পড়ে।'

বলতে বলতে হায়দার আলির হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয় আকবর। তার চোখের সামনে ঘুষ নিল লোকটা। ঘুষ নিয়ে মিথ্যে বলে গেল।

মইদুল হায়দারকে ধরল, 'তুমি অন্য মানুষের সামনে পড়, গোল ঠেকতেছে আমার।'

হায়দার তার মাথার টুপি ঠিক করতে করতে বলল,. 'টায়েম নেই, হবে না।'

ছেলেকে বাগে পাওয়া গেছে একটা টাকা খরচ করে। যেমন দরকার তেমনি পড়েছে হায়দার, সত্যি মিথ্যে যাহোক।

মইদুল থম মেরে যায়। কী শয়তানিটা না করল তার বাপ। সামনে নিদারুণ দিন। পেট চলবে কিভাবে ঠিক নেই। রস বেচে আয়ের পথ বন্ধ। এ নিয়ে দশজনকে ডাকলে তারা হাসবে।

বলবে, বুড়ো বাপ আর কদিন আছে, দ্যাওনা বেঁটে গাছ দুটো, আসলে সবই তো তোমার বাপের।

সবই কী বাপের। উ হুঁ ! বাপের নয়, তার বাপের, তার বাপের। সম্পত্তি পূর্বপুরুষ থেকে ধাপে ধাপে এসেছে। বরং আগে ছিল অনেক বেশি। কমতে কমতে এখন দু বিঘেয় এসে ঠেকেছে আকবরের কাছে।

মইদুল ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে। গা হাত পা জ্বলে যাচ্ছে যেন। বড় কষ্ট হচ্ছে যমজ গাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে। বাপ বেটায় সন্ধ্যে থেকে আর কথা নেই। বুড়ো আকবর সময় মতো ভাত খেয়ে গেল সোনাভানের কাছে এসে। ভাত খাবে না কেন, বাপের ভরণপোষণের দায় যে ছেলের। খায় দেখ ! বুড়োর পেটে যেন রাক্ষস ঢুকেছে। মইদুল দাওয়ার কোণে দাঁড়িয়ে বাপের ভাত খাওয়া দেখে আর ফোঁসে। বাপ বেঁচে থাকতে সম্পত্তি এরকম করেই চলবে। ইচ্ছে করছে- !

সোনাভানের মুখ ঘোমটার ভিতরে, দেখা যায় না। বাপকে পেট ভরে খাওয়ালো মইদুলের বিবি। আর মইদুল ! সে নামল উঠোনে। ঘুরতে লাগল শীতের অন্ধকারে। যমজ বামন খেজুর গাছ দুটো তার মাথায় মাথায়। মইদুল সেই গাছের সামনে দাঁড়াল।

—টুপ, টুপ, টুপ ফোঁটায় ফোঁটায় রস পড়ছে কাঠির আগা বেয়ে ভাঁড়ের ভিতর। মইদুল রসের গন্ধ পেল। গাছটা যেন অনায়াসে মাটির গভীর থেকে শিকড় দিয়ে রস টানছে। এই খরার দিনেও কেমন রসবতী।

মইদুল ডিঙিয়ে ভাঁড়ের ভিতরে চোখ দিল। অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ভাঁড় বোধহয় অর্ধেক ভরে গেছে। শীতটা একটু কষে নামুক। রস গাঢ় হবে। গাঢ় আর লালচে।

মইদুল ফিরতে ফিরতে ভাবল, বাপ এ রস বেচে দেবে, বেচে ছুনছান করবে টাকাগুলো। এই অভাবের দিন ! সে চুল ছিঁড়তে লাগল। বাপ ঠিক অন্য মানুষের কথায় চলছে।

অথচ ! মইদুল ভাবল সম্পত্তি কী বাপের !

পাঁচ

সম্পত্তি কী বাপের ! বাপের নামে বটে, কিন্তু এ জমি কী বাপ গতরে খেটে করেছে। বাপ অবশ্যগতরে খেটেছে খুব। কিন্তু জমি করতে পারেনি, বরং মূল সম্পত্তি থেকে দু'বিঘে বেচে দিয়েছে।

কবে কোনকালে, মইদুল কেন তার বাপ আকবর কেন, কেউ দেখেনি, কে করেছিল এই সম্পত্তি। তার নাম কেউ জানে না। শুধু জন্মের পর আকবর দেখেছিল তার বাপের ক'বিঘে জমি, বাঁশঝাড় আছে। মইদুলও তাই দেখেছে। আসলে এ বংশের কোন পুরুষ যে গতরে খেটে মস্ত এই পৃথিবীর এতটুকু অধিকার করেছিল তা কেউ জানে না। যখন যে ওয়ারিশ হয়, তার হয় সম্পত্তি। যেমন আকবরের, আকবরের পর তার ছেলের।

রাতদুপুরে মইদুলের ঘুম আসে না। মাথাটা দপ দপ করে বাপের কথা ভেবে। এতবড় আকাল আর অভাবের দিনে একটু সমঝে চলতে হবে না ! মইদুল কাঠ হয়ে শুয়েছিল বিছানায়। না পেরে উঠে বসে। কী যেন মাথায় খেলছে, কী যেন ! মইদুলের গলা শুকিয়ে যায়। বুক ধড়ফড় করে।

সে বিবির গায়ে ধাক্কা দেয়, ও সুনাভান, সুনাভান !

সোনাভান একটু তন্দ্রায় যেন ডুবেছিল, ও চোখ

খুলেছে। দেখে হাঁটুর ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে মূর্তিমান অন্ধকার হয়ে বসে আছে মইদুল। সোনাভান উঠে বসে।

'কি বলতিছ?'

মইদুল ঢোক গেলে। ওর দুটো চোখ বিভ্রান্তের মতো অন্ধকারে বিবির মুখে স্থির হয়। মইদুল হাঁসফাঁস করে। কী যেন বলবে, বলতে পারে না।

'কষ্ট হচ্ছে?' সোনাভান ওর গায়ে হাত দেয়।

মইদুল হাঁপাতে থাকে, 'আমি কী বুড়োর হাঁটানো ছেলে বাপের হাঁটানো ছেলে! বাপ এরাম করতিছে কেন?'

সোনাভান চুপ করে থাকে। কি বলবে? অভাবে ঝাঁঝরা হয়ে গেল সব। কী যে আরম্ভ হয়েছে। সোনাভান মুখ নিচু করে। চুপচাপ কী যেন ভাবে।

মইদুল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'তুই পারবি।'

মইদুলের কণ্ঠস্বরে সোনাভান কী ভীষণ চমকায়, 'কি বলতিছ?'

মইদুল হাঁসফাঁস করতে করতে বলে, 'পারবিনে তুই, আগের পক্ষডারে যেমন করি দিইলি, পাগল, হ্যাঁ পাগল, রফিক ভাইরি, তেমনি পারবিনে বাপেরে— !'

মইদুল এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামে।

সোনাভান নিশ্চুপ, কথা বলে না। অন্ধকারে নৈঃশব্দ ভারী হয়।

মইদুল এবার সোনাভানের হাত ধরে, 'জবাব দিচ্ছিসনে কেন, বাপ থাকতি বাঁচপোনা, চারজনা খেতি, বাপেরে আলোকলতার রস বেটে খাউয়ে দে......।'

মইদুলের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যায়। ও আর বলতে পারে না। কিন্তু বিবি চুপচাপ কেন। এ কী! বিবি কাঁদছে কেন! মইদুল অন্ধকারে বিব্রত, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

মইদুলের বিবি কেঁদে উঠেছে। দুটো হাত ধরেছে মইদুলের। মইদুল কেমন যেন হয়ে যায়। বুঝতে পারছে না কী হল! তেমন কঠিন কাজ কী এটা! বাপ তার বাপের সম্পত্তি নিয়ে কী ফ্যাসাদেই না ফেলেছে তাকে। অভাবের হাত থেকে বাঁচতে হলে এ ছাড়া আর কোনো উপায় আছে?

'এমনি না পারিস, ভাতের সঙ্গে মিশোয়ে দে, আমি আর পারিনে সুনাভান, একটা কিছু কর, না হলে বাঁচি কি করে?' ঘষ ঘষ করে মইদুলের কণ্ঠস্বর।

সোনাভান মুখ তুলল। অন্ধকারে ওর দুটো চোখে জল যেন মুক্তো বিন্দুর মতো টলটল করে। পানপাতার মতো গড়ন ও মুখের। অন্ধকারে সোনাভানের মুখ যেন আরো অন্ধকার হয়ে যায়। থমথমে নৈঃশব্দে দুজনে পাথর।

সোনাভান ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, 'কি বলতিছ মিঞা তুমি।'

মইদুল এবার চুপচাপ।

'কি বলতিছ বল, আলোকলতার রস— !'

মইদুল চুপচাপ, মাথাও নাড়ে না।

'ও রস খেলি পাগল হয়?' সোনাভান জিজ্ঞেস করে।

মইদুল অস্ফুট কী যেন উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকায়।

'কেডা পাগল হয়েছে ও রস খেয়ে?' সোনাভান আবার জিজ্ঞেস করে।

মইদুল বিড়বিড় করল, 'কেন রফিকভাই, তাই নিকে হল তোর আমার সঙ্গে।'

শীত যেন ক্রমশ জমাট বাঁধছিল পাথরের মতো। যেভাবে মাটি জমে জমে কাল থেকে কালান্তরে শিলা হয়, সেভাবে শীত এই দীর্ঘরাতে ক্রমশ শক্ত কঠিন, দেহ বিদীর্ণ করা এবং দুজনের মনও সেই রকম।

মইদুল যেন কী এক জালে পড়ে গেছে। ও সোনাভানকে আবার বুঝাতে যায় ওর যুক্তি, আকাল অভাবের কথা। কিন্তু সোনাভান! সোনাভান স্থির হয়ে হয়ে একেবারে নিশ্চল। শেষে আর পারে না, আবার কেঁদে ওঠে।

মইদুল বুঝতে পারে না কিছুই। সে দু' হাঁটুর ভিতরে মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ করে থাকে। মাথাটা যেন ঘুরছে। কী ভীষণ ঘুরছে। কী যে হচ্ছে ভিতরে কে বুঝবে। মইদুল ছটফট করে। আর সোনাভান! ফিসফিসিয়ে কেঁদে ওঠে মইদুলের বিবি, 'পেটের জ্বালায় অভাবে তুমার রফিক ভাই পাগল হলি আমি ভাতের জন্যি তুমার এহেনে এসে উঠিছি মিঞা, তারে আমি পাগল করি নাই। বিশ্বাস কর আমি তারে আলোকলতার রস খাওয়াই নাই, অভাবে নিকে করলাম, হায়— মানুষ কী মানুষের জেবন নষ্ট করতি পারে!'

মইদুল শুনে পাথর হয়। অভাবে রফিক মণ্ডল পাগল হয়েছিল! আর সে! সে কী পাগল হল দুটো গাছের জন্য! পাগল করে দিতে যাচ্ছিল বুড়ো বাপকে। টলমল করছিল মইদুল।

সোনাভানের তখন মনে পড়ছিল রফিক পাগলের কথা। সে এক চরম অভাবী জীবনের স্মৃতি! হাতপা কোলে করে আশ্বিন মাসের বড় বেলায় সন্ধ্যে নামাত লোকটা, নিরন্তর কুৎসিত ঝগড়া মারামারিতে দিন কাটত। কে কাকে দোষারোপ করে ঠিক নেই। এইভাবে দিন দিন লোকটার মাথা খারাপ হতে লাগল। বাচ্চা আর নিজেকে বাঁচাতে সোনাভান তখন মইদুলের দিকে ঝুঁকেছে। নিন্দুকে বলল আলোকলতার রস বেটে খাইয়েছে রফিকের বিবি। একথা সত্য না মিথ্যা তা জানে আকাশের নক্ষত্র, তারা জানে কোনটা সত্য! এখনো রাত নিশুতি হলে সে পাগলের জন্য তার যে ঘুম আসে না। উঠে বসে। বাইরের উঠোনে নিঝুম বসে থাকে। মাথায় তখন হাজার প্রদীপজ্বলা আকাশ। ওই আকাশের নিচে কোথাও হয়ত শুয়ে আছে সেই দীর্ঘদেহী পাগল! তার দুচোখ নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘোরে। কবে আসবে সেই মাঘ মাস মাছেরা আবার খেলা করবে বিদ্যেধরীর নোনাজল আর ভেড়িতে। নির্জনে নিঝুমে নক্ষত্ররা সাক্ষী হয় রাত জাগার। মইদুল মিঞা কী জানে এসব! মানুষ অভাবে পাগল হয়।

মইদুল অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে, 'ও সুনাভান, দুটো গাছের জন্যি কী আমার মাথা খারাপ হল!'

সোনাভান ফিসফিস করে, 'মাথা খারাপ কী গাছের জন্যি হয়, যার জন্যি হয় তার নাম অভাব, শুকনো রস কস ছাড়া মরা গাছের মতো, দ্যাখো নাই উঠানে দাঁড়ায় আছে, লম্বা সিড়িঙ্গে, মাথা তুলেছে উপরে।'

মইদুল সোনাভানকে অন্ধকারে দেখতে পায় না। কান্নার শব্দ শোনে। ঠিক তখনই ঘরের বাইরে কে যেন গলা খাঁকারি দেয়। পায়ের শব্দ হয় দরজার কাছে।

—'ও, মইদুল, তোর বিবি কাঁদে কেন?'

বুড়ো আকবরের গলা। মইদুল চটকরে উঠে দাঁড়ায়, 'কেডা বাপ আলি?'

—'হ্যাঁ, তোর বিবি যেন কান্দে, শুনলাম যেন!'

মইদুল দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, বিড়বিড় করে, 'বাপ, বিবি আমার কানতেছে মরা খাজুর গাছটার জন্যি, বড় মায়া ওর, গাছ মরলিও কাঁদে।'

আকবর দাওয়ায় বসে পড়ে। উঠোনের সেই লম্বা গাছটার দিকে তাকায়। সোনাভান নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বাইরে শুধু পিতাপুত্র। ভূত অন্ধকারে গাছটা যেন ভয়ের।

'বাপ, ঘুমোতি যা, জোড়াগাছদুটো তোর হবে, বাঁচপি যদ্দিন রস খাবি, আমার গতর আছে!' আকবর মাথা নাড়ে, 'তঞ্চকতা করিছি, ঘুম কী আর আসপে, বুড়ো বয়সে কেন এরাম করতি গেলাম!'

পিতাপুত্র চুপচাপ বসে থাকল দাওয়ায়। আজ নক্ষত্র সাক্ষী রেখে দুজনেই রাতভর জেগে থাকবে। এরা জানল না দাওয়ার অন্য কোণে এসে বসল সোনাভান। তার চোখ আকাশে যেখানে প্রতিবিম্বিত হয় আর এক মানুষের চোখ। □

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক

ভবতোষ দত্ত ▫ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বিপ্লব দাশগুপ্ত ▫ নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দুটি সংখ্যা ধরে আমরা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে চারজন স্বক্ষেত্রে বিশিষ্ট অভিজ্ঞ মানুষের আলোচনা পড়েছি, এবার তার শেষাংশ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা বিপ্লব দাশগুপ্তের সামাজিক ব্যাখ্যার ধরন হয়ত ভিন্ন, নির্মলা ব্যানার্জী ও ডঃ ভবতোষ দত্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে—কিন্তু সকলেই, নিজের মতো করেই, স্বীকার করেন একটা পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান কাঠামোতে আর চলছে না।

চূড়ান্ত একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার সরিয়ে দেওয়া হল, সেই সময় সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণার অনেক আগে চিফ সেক্রেটারি জানতেন যে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি পুলিস, মিলিটারি সব বিভিন্ন জায়গায় ঠিক ঠিক বসিয়ে দিলেন, তারপর আসল নির্দেশ এল। অর্থাৎ ঐ যে মুহূর্তটা যখন চিফ সেক্রেটারি জানতে পেরেছেন এবং আসল ঘোষণা হয়েছে এই দুটোর মধ্যে যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়, ঐ সময় চিফ সেক্রেটারি কার প্রতি অনুগত ছিলেন? তিনি নিশ্চয়ই কেন্দ্রের প্রতি অনুগত ছিলেন, রাজ্য সরকারের প্রতি ছিলেন না। কাজেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের মধ্যে যখনই এ ধরনের কোনো প্রশ্ন আসছে তখনই আমরা দেখছি একটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে ঐ প্রশাসনের লোকরা থাকছেন। এবং তাঁরাও ব্যক্তি, তাঁদেরও নিজেদের কতকগুলো নিজস্ব স্বার্থের প্রশ্ন আছে—খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু এর ফলে আমরা দেখছি যে, কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। এবং রাজ্য সরকার তার নিজের নীতি অনুযায়ী ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। কাজেই এখানেও ঐ প্রশ্নটা চলে আসছে। আমি জানি না, আমেরিকাতে এটা আছে বলে আমার মনে হয় না, অস্ট্রেলিয়াতে আছে বলে মনে হয় না, ইংল্যান্ডে আছে বলে মনে হয় না—একটা ক্যাডার কেন সমস্ত জায়গাতে থাকবে। সব জায়গাতেই তারা একভাবে চালাবে, এটা আমি সঠিক পদ্ধতি বলে ভাবি না। এছাড়া আরেকটা প্রশ্ন আমার মনে হয়েছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের থেকেও এটা একটা বড় প্রশ্ন। কারণ, আজকে যদি ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ভারতবর্ষ হিসেবে, তাহলে একদিক দিয়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে কিছুটা সাহায্য করতে হবে। এইজন্য করতে হবে যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতি আস্থা যদি না দেখানো যায় তাহলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে আমরা আমাদের সঙ্গে রাখতে পারব না। অন্যদিকে সর্বভারতীয় একটা জাতীয়তাবোধও তৈরি করার প্রয়োজন আছে। আবার দুটো যে একসঙ্গে তৈরি হতে পারে না এমন নয়। অনেক জায়গাতেই হতে পারে। অধ্যাপক দত্ত, আমার মাস্টারমশাই, উনি সুইজারল্যান্ডের কথা বলেছেন—আমি বহুবার সুইজারল্যান্ডে গেছি, আমি দেখেছি যে ওখানে একই সঙ্গে জার্মান এবং সুইস চলে, একই সঙ্গে ইটালিয়ান এবং সুইস—কোনো তফাৎ নেই।

ডঃ দত্ত অর্থাৎ ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ।

দাশগুপ্ত ফ্রেঞ্চ বলব না, সুইস বলব।

ডঃ দত্ত ও সুইস, হ্যাঁ হ্যাঁ সুইস।

দাশগুপ্ত একই সঙ্গে জার্মান এবং সুইস, ইটালিয়ান এবং সুইস, ফ্রেঞ্চ এবং সুইস চলে।

ডঃ দত্ত হ্যাঁ আমি জানি। জার্মান স্পিকিং সুইস।

দাশগুপ্ত অর্থাৎ একই সঙ্গে একটা জাতিগত বোধ রয়েছে, আবার সর্ব দেশভিত্তিক একটা বোধ রয়েছে, দুটোই একই সঙ্গে থাকা সম্ভবপর। আমি আমেরিকাতেও দেখেছি, সেখানে পোলিশ আমেরিকান, বাড়িতে পোলিশ শেখাচ্ছে, তার সঙ্গে মার্কিন জাতীয়তাবোধের কোনো বিরোধ নেই। দুটোই তার একসঙ্গে থাকে। কাজেই মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব, একই সঙ্গে দুটো তিনটে স্তরে, বিভিন্ন স্তরের আনুগত্য। কাজেই এটা যদি আমরা মেনেও নিই, তাহলে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি। সেইজন্য এখানে আমাদের ভাবার দরকার আছে। সবচেয়ে যেটা বড় বলে মনে হচ্ছে আমার, এগুলো ছাড়া, সেটা হল, যাঁরা নিম্ন স্তরে আছেন, তাঁরা কতটা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে ভাবেন, এটা ভাবার প্রয়োজন আছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে, আমি এটা গর্ব করে বলতে পারি, বাইরে থেকে যে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসেন, তাঁদের এখানে চাকরির সুযোগের কোনো অসুবিধে নেই। যেকোনো জায়গায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তাঁরা নাম লেখাতে পারেন। এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি হয় না। কিন্তু, ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের কথা জানি, যেখানে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে হলে লিখতে হয় যে তুমি বাইরে থেকে এসেছ কি না। বাইরে থেকে এলে সেখানে সুযোগ পাওয়া যায় না। তাছাড়া দাঙ্গা হাঙ্গামা আমরা দেখছি। আসামে বিশেষ করে, এবং অন্যত্রও আমরা দেখছি। এখানে সর্বভারতীয় দলগুলোর একটা কর্তব্য আছে। তাদের দলের যে শাখাগুলো, আঞ্চলিক ভিত্তিতে যখন "সন্স অব দ্য সয়েল" এই ধরনের যুক্তি দেয়, তখন সেই যুক্তিকে

তাদের খণ্ডন করা উচিত যে, সন্স অব দ্য সয়েল কিছু নয়, এরা ভারতবর্ষেরই সন্তান, এদের ভূমিটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। এই যে চিন্তা, এই চিন্তা যদি আমরা সার্বিকভাবে তৈরি করতে পারি, তাহলে সর্বভারতীয় সংহতি সম্ভব। কিন্তু এখানে দুঃখের সঙ্গে আমরা দেখি, যে-দল সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রিকতার কথা বলে, যে-দল সবচেয়ে বেশি জাতীয় সংহতির কথা বলে, সেই দলই কিন্তু আবার শিবসেনাকে উৎসাহ দেয়, সেই দলই আবার আঞ্চলিকভাবে কিছু সুবিধে পাবার জন্য, আঞ্চলিকতার চেতনায় সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টা করে। তারা যে বিপদেও পড়ে সেটা অন্য জিনিস। কিন্তু ঐ স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে গিয়ে, আদর্শবোধ নীতিকে বিসর্জন দিয়ে, গোটা দেশকে তারা ডোবায়।

কাজেই আমরা যে আলোচনা করছি, এই আলোচনাটারও প্রয়োজন আছে যে, ভাষাভিত্তিক চেতনা যদি একটা স্তর পর্যন্ত থাকে তাহলে ক্ষতি নেই ; তার ওপরে জাতীয়তাবাদী বৃহত্তর চেতনা থাকতেই পারে। দুটোই হতে পারে—একটা বৃহত্তর একটা ক্ষুদ্রতর। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর আনুগত্য যে বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর আনুগত্য থেকে বৃহত্তর আনুগত্য বৃহত্তর, এই চেতনা যদি সর্বভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি করতে পারেন, তাহলে পরেই এই জিনিসটা করা যায়। এটুকুই আমার বক্তব্য।

ভঃ দত্ত—.........তাহলে এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল, তা থেকে কতকগুলো সমস্যা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আমি অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে দুটো বিষয় তুলব, একটা হল যে এইমাত্র ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত যা বললেন, আমাদের সংবিধানের রাজনৈতিক ধারাগুলোর বিষয়ে, গভর্নরের নিয়োগ, গভর্নরের ক্ষমতা, ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় সার্ভিস ইত্যাদি নিয়ে, তাঁর কী মত। এবং দ্বিতীয়ত, যেটা উনি নিজেই আগে বলেছিলেন যে, আর্থনীতিক ক্ষমতার আর একটু বিকেন্দ্রীকরণ হলে উনি খুশি হন, সেটাতে উনি ঠিক কোন জিনিসটার ওপর জোর দিচ্ছেন। এই দুটো প্রশ্ন নিয়ে আপনি যদি একটু আলোচনা করেন, তাহলে ভালো হয়।

দেবীপ্রসাদ ডঃ দত্ত ও অন্য যাঁরা আমার কথা আগে শুনেছেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমি এই সমস্যাটাকে ত্রিস্তরে ভাগ করে আলোচনা করেছিলাম—সাংবিধানিক এবং আইনগত, দ্বিতীয় রাজনৈতিক, তৃতীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক। দেখা যায়, যত পার্থক্য ও তাপ প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরে হয় এবং তাই সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন বিতর্কে বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু সমস্যাটা নিহিত মূলত সমাজে ও সংস্কৃতিতে। রাজামান্নার কমিটির সঙ্গে শীতলবাদের বিতর্কের প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম, সংস্কৃতি ও সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষ একটা রাষ্ট্র, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে এখনও গড়ে উঠছে। ফলে কতকগুলো জিনিস হয়ত আমি তাত্ত্বিক

জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ-এর কাজ দেবীবাবু ভেতর থেকে দেখেছেন, আমি বাইরে থেকে দেখেছি। রবার স্ট্যাম্প মারা ব্যতীত প্রকৃত অর্থে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। পরিকল্পনা কমিশনের কোনো প্রস্তাবকেই খারিজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

ডঃ ভবতোষ দত্ত

আলোচনায়, সেমিনারে বলব খারাপ। কিন্তু আমাকে যদি কেউ বলে, বাস্তবিকভাবে এই খারাপ নিরসন করার জন্য তুমি কী কর, তাহলে আমার চিন্তা হবে। আজকে কংগ্রেস কমিউনিস্ট বা অন্য যে পার্টিই যাদব অঞ্চলে গিয়ে যাদব হয়, রাজপুত যেখানে সেখানে রাজপুত করে, মুসলমান যেখানে মুসলমান করে। এবং বিভিন্ন দলের এ ব্যাপারে একটা ঐক্য আছে। ত্রিস্তরের শেষ স্তর, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্তর অর্থাৎ লোকের ভেতরেই প্রতিফলিত হচ্ছে সামাজিক টানাপোড়েনের চেহারা। ফলে, সমাজে যে সমস্যা, যে দ্বিধা, তা বোঝা যায়। যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি অনেককে, তাদের আমি বলি, কংগ্রেস তো করে আমি জানি। কিন্তু কংগ্রেসের চাইতে তো তোমার পার্টি বেশি আদর্শবাদী, তুমি যাদবের সঙ্গে খাতির কর কেন, তুমি মুসলিম লিগের সঙ্গে যাও কেন, কংগ্রেস-শিবসেনার কথা তো আমি জানি, কিন্তু তুমি কর কেন। সেই জন্য আমি বিতর্ক করতে চাই না—এইসব ব্যাপার আমি বুঝতে চাই। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমার প্রাথমিক কাজ তর্ক করা নয়—প্রথমে বোঝা, পরে আলোচনা করা। কেননা, রাজনৈতিক সহনশীলতা দরকার। আমরা দেখছি যে সংবিধান একই রয়ে গেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা এসে দেখলাম, যেমন গভর্নরের ভূমিকা, আমরা দেখেছি এবং বলেছি যে '৬৭ থেকে এই সংবিধানে গভর্নরের ভূমিকা, আমার মতে, অবাঞ্ছিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সংবিধান একই আছে, '৮০ থেকে '৮৩তে কই অবাঞ্ছিত অপসারণ তো অত হচ্ছে না। পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন-মতাবলম্বী সব গভর্নর করে গেছে এবং তাঁরা রাজনৈতিক দিক থেকে পুরোপুরি কংগ্রেস (ই) বিরোধী— কিন্তু তাঁরা তো রয়েছেন, দু'একজন বাদে। ফলে আমি বলছিলাম যে দলমত সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা, এটা সত্যিই দরকার '৬৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত, আমার মনে হয়েছে, কংগ্রেস দল যা শিখেছে, '৮০ থেকে '৮৩তে তা প্রতিফলিত।

ফলে আমার নিজের মনে হচ্ছে অনেক সময় যা শিক্ষণীয় তা মানুষ শিখতে চায় না জ্ঞানীগুণী লোকের কথা থেকে। অভিজ্ঞতার ধাক্কা থেকে শেখে অনেক সময়। রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে বিপ্লববাবু যা বলেছেন—অনেক সময়ই আমার এই কথা মনে হয়েছে। অনুভবের তীব্রতা বা প্রকাশ নিশ্চয় আমার ভিন্ন হবে। কিন্তু আমি বুঝতে চেয়েছি যে কেন কংগ্রেস '৮০ সালে এসে যে সব গভর্নরদের সরিয়ে দিতে পারত, সরায়নি। সহিষ্ণুতা বেড়েছে। সরানোর প্রয়োজনও নেই। ১৯৬৭ থেকে '৭১-এ যে মতবিনিময় ছিল না কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে, তা শুরু হয়েছে। এগিয়েছে কতটা, তা সময়ের প্রশ্ন। আমি বারবার বলছিলাম যে একটা জাতি যেটা সংস্কৃতি, সামাজিক দিক থেকে দেশ, রাজনৈতিক অর্থে নয়, তার জীবনে ৩৬ বছর একটা বিশাল বছর নয়। সেইজন্যে রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার তুলনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতে একেবারে মেলে না। তার কারণ কিছুটা বলেছেন আমার পূর্ববর্তী বক্তারা। ১৭৭৮ বা ১৭৭৯ থেকে ১৯৮০, এই যদি বলি আমেরিকার ইতিহাস তাহলে তারা অনেক খোলা মনে সময় নিয়ে তাদের দেশকে গড়ে তুলতে পেরেছে। আমেরিকার সমাজ, নিজের মধ্যে যে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠি আছে তাকে মানিয়ে নেবার কৌশল ২০০ বছরে শিখে নিয়েছে। বিভিন্ন সমাজের যেসব দল, তার মধ্যে ঝগড়া হতে পারে। আজকে আসামের বহু জায়গায় অসমীয়ারা মানুষ হিসেবে বাঙালীকে ভালোবাসে। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হয়েছে—অসমীয়া, মহারাষ্ট্র, নেপাল, ট্রাইবাল লোকদের এই বিভিন্ন স্বার্থ লোকদের একত্রিত করতে পারছে না। ভারতবর্ষে আজ এইরকম। মহারাষ্ট্রের লোক গুজরাটের লোকদের তাড়িয়ে

দেয়, ঘৃণা করে, তা নয়। '৫৭-'৫৮ আন্দোলন তা নয়। কিন্তু বস্তুত তাই প্রতিভাত হয়েছে।

আমেরিকাতে সব সময় সংখ্যালঘু দলকে, বিবদমান গোষ্ঠীকে যে তারা প্রকৃত অধিকার দিয়েছে তা নয়, সেইরকম করলে আমি সন্তুষ্ট হব। কিন্তু এটুকু বলব, যে ভেতরের কতকগুলো সুবিধে তারা দিতে পারে, যেটা আমরা হরিজনদের দিতে পারছি না। আজও, আমি রাষ্ট্রসংঘে বিশ বছর চাকরি করেছেন, একজন আই· সি· এস, তাঁর যদি বাইশটা ফ্ল্যাট থাকে মাদ্রাজে, তার বিশটা ব্রাহ্মণকে দিয়ে আর দুটো ফাঁকা রাখেন, তাও অব্রাহ্মণকে দেবেন না। এই যে সামাজিক মানসিকতা, এটা সুশিক্ষিত আই· সিএস· বিশ বছর আমেরিকায় থেকে বদলাতে পারেন না।

রাশিয়া বা চীনের উদাহরণ অন্যদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা পার্টি সেখানে আছে। সেইজন্য সমাজ এবং প্রশাসনের টেনশন সেটা সংবিধানেই একরকমভাবে চেপে দেবার বা এড়িয়ে যাবার একটা কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে সেখানে। ভারতবর্ষে দমনের পর্বটিকেই দেখি। সেজন্য আমরা '৬৭কে বলি প্রপাতকাল। '৬৭-এর আগে এই টেনশন বা দমন ছিল না তা নয়—কিন্তু বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু এই দমন নীতি থাকলেও চীনে বা রাশিয়ায় বেরিয়ে পড়তে পারে না। ফলে এক দলের শাসন বা একভাষী ব্যবস্থায় অনেক সময় কেন্দ্র রাজ্য বা আন্তঃসামাজিক স্বার্থ ও দলের ঝগড়া সহযোগিতায় বা জোর করে বদলে দেয়, তা না হলে দমন করে, তা না হলে মেনে নেয়। সুতরাং সেই জায়গায় আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, রাশিয়ার তুলনা ঠিক নয় আমাদের প্রসঙ্গে। ফলে আমরা যে পরীক্ষাটা করছি সেটা সত্যই নতুন।

আসলে এর সামাজিক সমস্যাটা আমাকে বুঝতে হবে। প্রতিতুলনায় আমাদের কোনো লাভ নেই। আমাদের দেখা দরকার সেই সব অঞ্চল যারা উদারনৈতিক ভিত্তিতে শুরু করেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। আমি এগুলো বুঝতে চাই। রাশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার সুবিধে আমাদের নেই।

আমাদের দেশে 'ট্যাক্স বেস'-টিও খুব সীমিত। ফলে কর সংগ্রহ নিয়ে অনেক গোলমাল হয়। যাদের কর দেবার তারা দেয়ও না। যেমন সবকটি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদই দেউলে। আসলে, পরিশ্রমের কথা বলে পাইয়ে দেবার একটা ব্যাপার আছে। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাঠামো কর সংগ্রহ ও পরিকল্পনার ব্যাপারে ঔদাসীন্য ও অদক্ষতা আছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ বা সারসংক্রান্ত ভরতুকি দেবার ব্যাপারটাও আমি বুঝি না। কৃষিকর বা সেচ কর ধরতে গিয়ে অনেক সময় কংগ্রেস ধাক্কা খেয়েছে। কারণ, ভোট চলে যাবে। কেউই ঘাঁটাতে চায় না। তাছাড়া ভোটদাতাদের মানসিকতাও বোঝা দরকার—নকশালবাড়ি হবার পর কলকাতার সব ভোট কংগ্রেসের দিকে চলে গেল। বামফ্রন্ট ভালোই চালাচ্ছে—তাহলে কলকাতায় কংগ্রেসের ভোট কেন বাড়ল? এগুলো বুঝতে হবে। আর

মহারাষ্ট্র থেকে যখন পশ্চিমবঙ্গে এলাম, কোনো অসুবিধেই হয়নি, মনে হয়েছিল একই দেশ। কিন্তু গত তিরিশ বছর ধরে, এই সংহতিকে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়বার যে সুযোগ, তা আমরা ব্যবহার করিনি। আমরা চেষ্টাও করিনি।

নির্মলা ব্যানার্জী

অনুদান তুলে নেবার ক্ষমতাও কারও নেই। আমি বলতে চাই যে-সব জায়গায় কর আদায় করবার সুযোগ আছে, অথচ আদায় হচ্ছে না, সে সব জায়গায় অনুকূল অবস্থায় আদায় করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়েই রাজ্য সরকার ঋণও তুলতে পারে। এটা করা যায়।

সারকারিয়া কমিশন যে অবস্থায় তৈরি হল, আমার মনে হয়, তারা বোধহয় কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি তলিয়ে দেখবে। রাজ্যগুলোর প্রকৃত চাহিদাগুলো বিচার করে কমিশন দেখতে পারে আর্থিক সংস্থান সংগ্রহের যে ব্যবস্থা আছে, তা পর্যাপ্ত কি না। কারণ এটা তো জাতীয় উন্নতির প্রশ্ন—সামাজিক বিকাশের ব্যাপার।

বিপ্লব দাশগুপ্ত আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, সবচেয়ে পরে এসে সবচেয়ে আগে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় যে কথাগুলো বললেন মন দিয়ে শুনলাম। আমার মনে হচ্ছে যে, ওঁর আলোচনাটা অনেক ছড়িয়ে গেছে এবং সেই সমস্ত দিক বিচার করবার সুযোগ এখানে নেই। একদলীয় ব্যবস্থা বা বহুদলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, দলের সংখ্যাটা বড় না। কারণ আমেরিকায় দুটো দল থাকলেও, তারা আসলে একটা দলেরই মতো; ইংল্যান্ডে বা জার্মানির অবস্থাও সমান। মনে হতে পারে, কংগ্রেস ও জনতা দুটো দল হলেও একই শ্রেণীশক্তির প্রতিনিধিত্ব করে তারা।

রাজ্যপালের প্রসঙ্গে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় যা বলেছেন, ১৯৮০ সালের পর থেকে অন্যভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁদের, এটা তো ঠিক নয়, কারণ হরিয়ানার ঘটনা তারপরেই ঘটে। বা টি· এন· সিং-কেও তো বাধ্য করা হল পদত্যাগ করতে। তামিলনাড়ুতেও একই ব্যাপার দেখা গেছে। তাই রাজ্যপালদের সম্পর্কে ১৯৮০ সালের পর থেকে কেন্দ্রের সহনশীলতা বেড়েছে, তত্ত্ব হিসেবে এটাকে আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।

টাকা পয়সার ব্যাপারে ওঁর মত, কর সংগ্রহের ব্যাপারে সবসময় সবাই জোর দেন না, এই দুর্বলতা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কর থেকে পাওয়া অর্থের বেশির ভাগটাই কেন্দ্র পায়, রাজ্যের ভাগ্যে যদি নামমাত্র থাকে, তাহলে কেন্দ্র তার সেই আর্থনীতিক ক্ষমতা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে, বৈষম্যমূলকভাবে। অতীতেও হয়েছে, এখনও চলছে। তাই পুনর্বন্টনের ব্যাপারটা আমরা এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই।

আমার শেষ কথা হল, আমাদের বিপদ দুধরনের—এক, অতিকেন্দ্রিকতা ও দুই, বিচ্ছিন্নতাবাদ। অতিকেন্দ্রিকতার প্রকাশ আমরা, অর্থনৈতিক অস্ত্র ছাড়াও, দেখতে পাই নানা আইনকানুনে, এসমা, নাসা-র মতো অর্ডিন্যান্সে। আর বিচ্ছিন্নতাবাদ তো এখন আসাম ও পাঞ্জাবকে প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে। বিচ্ছিন্নতাবাদকে ঠেকানো যাচ্ছে না, কারণ কেন্দ্র নীতিগত কোনো নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। কেন্দ্রকে কেউ ভালোবাসে না, শ্রদ্ধাও করে না। বৈদেশিক শক্তির হাত এর পেছনে আছে হয়ত। কিন্তু ওদের সুযোগ তো কেন্দ্রই করে দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী নানা শক্তির সঙ্গে সুবিধেমাফিক আপস করে।

নির্মলা ব্যানার্জী দেবীবাবুর সঙ্গে আমার কোনো অমত নেই। কিন্তু মনে হয়, অনেক সুবিচারী মানুষ এই মুহূর্তে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেন, তা আমার কাছেও স্পষ্ট নয় মহারাষ্ট্র থেকে যখন পশ্চিমবঙ্গে এলাম, কোনো অসুবিধেই হয়নি, মনে হয়েছিল একই দেশ। কিন্তু গত তিরিশ বছর ধরে, এই সংহতিকে কাজে লাগিয়ে দেশ গড়বার যে সুযোগ, তা আমরা ব্যবহার করিনি। আমরা চেষ্টাও করিনি। দেবীবাবুর মতে '৬৭ সালের পর থেকে যে রাজনৈতিক বুদ্ধির বিকাশ, অর্থনীতির ক্ষেত্রে তেমন

কোনো দৃঢ় তা আমরা লক্ষ্য করছি না। আর্থনীতিক সমস্যার বিষয়ে সচেতনতাই নেই। সে দিক থেকে দেখলে, সমস্যাটা সাংবিধানিক, না আমাদের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক বোধেরই সংকট, সেটা ভাববার ব্যাপার। দেবীবাবুর মতে আমাদের দেশের করদাতাদের সংখ্যা খুব কম, সেটা কি ঠিক, কারণ আমাদের কর থেকে আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে অপ্রত্যক্ষ কর থেকে। গরীব লোকেরাও দেয়। হয়ত কৃষি কর বা সেচ করের ক্ষেত্রে দেবীবাবু যা বলছেন তেমনই ঘটছে। কিন্তু করদানের ভিত্তিটা তো কেন্দ্রই ছোট করে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য কাজের ভাগটা এখন এমন যে, অপ্রীতিকর সব দায়িত্বই রাজ্যের ঘাড়ে দিয়ে কেন্দ্র এড়িয়ে যেতে পারে। সেদিক থেকে রাজ্যগুলোকে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় অনেক সরাসরিভাবে, লোকদের রোজকার ঝামেলা মেটানো আর কি। এই ভাগটা যতদিন না ঢেলে সাজানো যাচ্ছে, ততদিন ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগটাও রয়ে যাবে।

ডঃ ভবতোষ দত্ত আমি তিনটে বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছি। এতক্ষণ শুনে আমার এগুলোকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। প্রথমত, বর্তমান সংবিধান না বদলেও এর মধ্যেই অনেক কিছু করা যায়। কোনো কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে বর্তমান সংবিধানকে ব্যবহার করেই রাজ্য সরকারগুলোকে জব্দ করতে পারেন। আমরা সাধারণত জানি, সংবিধানসম্মত উপায়ে রাজ্যশাসন সম্ভব হচ্ছে না, রাজ্যপালের কাছ থেকে এমন রিপোর্ট গেলেই তবে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা যাবে। ছোট দুটি শব্দ আছে 'অর আদারওয়াইজ'। এই 'অর আদারওয়াইজ'-এর সুযোগ কংগ্রেস সরকার, নেহরু থাকতেই নিয়েছিল এবং জনতা সরকারের আমলে মোরারজীও তা ব্যবহার করেছেন। রাজ্যসরকার হটাতে ব্যবহার করবার রাজনৈতিক যুক্তি নিয়ে আমি কিছু বলছি না, কিন্তু নৈতিক যুক্তি ছিল না।

যদি কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমি রাজ্যগুলোকে জব্দ করতে চাই, তাহলে আগামী বাজেটে আমি আয়করের হারটাকে যথাসম্ভব কমিয়ে সার-চার্জটা দারুণ বাড়িয়ে দিতে পারি। কেন্দ্রীয় শুল্কহার ঠিক রেখে অতিরিক্ত শুল্কহার কমিয়ে দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শুল্ক কমিয়ে সরকারি উদ্যোগজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানো যেতে পারে। তেলের ওপর শুল্ক কমিয়েও তেলের দাম বাড়ানো অর্থাৎ অসদিচ্ছা থাকলে এই সংবিধানেই কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতা অনেক বেশি হতে পারে। সদিচ্ছা থাকলে ঠিক এর উল্টোও হবার সম্ভাবনা আছে।

রাজ্যের ঋণ করবার ক্ষমতা সংবিধানে স্বীকৃত। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে যতক্ষণ রাজ্যের ঋণ আছে, ততক্ষণ কেন্দ্রের অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো রাজ্য ঋণ করতে পারবে না। আর কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ তো সবসময়ই। অর্থাৎ সেখানেও একটা নির্ভরতা।

রাজ্যপালের নিয়োগের ব্যাপারে একটা কনভেনশন হয়েছিল, আইনে নেই, নেহরু তা করেছিলেন যে, রাজ্যপাল নিয়োগের আগে রাজ্যগুলোর সম্মতি আছে কি না, তা দেখা হবে। এটা করা হয়েছে সর্বদা। কিন্তু এখন থেকে কেন্দ্র, সংবিধান অনুসারেই, রাজ্যের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করে না আর। অথচ শুধু কনভেনশনের ওপর ভিত্তি করেই ইংল্যান্ড চলছে। আমাদেরও এমনি সুযোগ আছে কনভেনশন তৈরির।

কতকগুলো পরিবর্তন বোধহয় দরকার। সেইটে বলেই আমি শেষ করব। একটা হল—৩৫৬ ধারা। একটা রাজ্যের ভার নিয়ে নেওয়া, রাষ্ট্রপতির শাসন জারি—এটাকে অত সহজে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

যে ধারায়, কোনো আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্র বলতে পারে কোনো রাজ্যকে, এটা চালু করতে তুমি বাধ্য, সেটাও বদলানো প্রয়োজন। উদাহরণ দিচ্ছি যে, যদি কাল কেন্দ্রে এমন আইন হয় যাতে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তাহলে অবস্থাটা কী সাংঘাতিক হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় আইন মেনে নেওয়া অনেক সময়ই রাজ্য সরকারের পক্ষে কঠিন। তাই এ ব্যাপারটার খানিকটা পরিবর্তন, আমি তুলে দিতে বলছি না, বোধহয় দরকার।

আর যে ক্ষেত্রে খুব বড় রকমের পরিবর্তন প্রয়োজন, তা হল অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঠিক মতো কাজ করছে না। সপ্তম অর্থ কমিশনের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম, তাঁরা কোনোরকমে সমস্যাটা সমাধান করেছিলেন কেন্দ্রীয় শুল্কহার একলাফে ২০ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে বাড়িয়ে। আমি তাঁদের বলেছিলাম, এভাবে ক্রমাগত বাড়াতে থাকলে তো শেষে আয়করের মতো অবস্থা হবে— 'বেসিক ইনকাম ট্যাক্স' সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো উৎসাহই থাকবে না। এটা বন্ধ করবার উপায় হল ২৭৫ ধারা অনুযায়ী দেয় অনুদানের ভাগটা বাড়ানো। অনুদান দেওয়া নৈতিক দিক থেকে ঠিক নয়—কিন্তু সমস্যা মোকাবিলায় তা করা যায়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনকে যেকোনো কর ভাগ করে দেবার কথা বলতে পারে। অর্থাৎ ২৬৮ থেকে ২৮২ পর্যন্ত যে ধারা, এগুলোতে আর চলছে না, এগুলো বদলে নেওয়া দরকার। এবং নতুন কোনো কর বসাবার ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া যাবে কি না, সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

অনেক সময় পুরানো কর নতুন খোলস নিয়ে আসে। যেমন অকট্রয়। অকট্রয়কে আমি খুব ভালো কর বলব না, করের মধ্যে এটাজাতে অনেক নিচু। কিন্তু এর থেকে বেরুবারও তো কোনো রাস্তা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এগুলোর পুনর্বিবেচনাও করা যেতে পারে।

এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ কমিশনের মধ্যে দায়িত্বে যে ভাগ—যেমন পরিকল্পিত ব্যয়ের দিকটা দেখবে পরিকল্পনা কমিশন আর পরিকল্পনার বাইরে (নন-প্ল্যান) ব্যয়ের দিকটা বিচার করবে অর্থ কমিশন, এটা বদলাবার প্রস্তাব কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার মানেননি, যদিও সংবিধানে এমন কোনো বিভাগ আমরা দেখি না। অথচ যেকোনো রাজ্যকে জিগ্যেস করলেই জানা যাবে, পরিকল্পনা কমিশনের চাইতে অর্থকমিশনের ওপর তারা নির্ভর করে বেশি।

আন্তঃরাজ্য কাউন্সিল কার্যকর হয়নি। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ-এর কাজ (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল) দেবীবাবু ভেতর থেকে দেখেছেন, আমি বাইরে থেকে দেখেছি। রবার স্ট্যাম্প মারা ব্যতীত প্রকৃত অর্থে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। পরিকল্পনা কমিশনের কোনো প্রস্তাবকেই খারিজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ পরিকল্পনা কমিশন ক্যাবিনেটকে দিয়ে পাশ করিয়ে নিলে এন· ডি· সি-র ভূমিকা প্রায় অবান্তর হয়ে যায়।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, এগুলো দিয়ে সমস্যার সমাধান আর সম্ভব নয়। কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই দরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে। এবং যে যে বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য এক মত পোষণ করে, ভাষা বা প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও, কিন্তু মূল ক্ষেত্রে বিভেদ না থাকলে সে বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমেও সমাধান করা যায়—এই বলেই আমি শেষ করছি।□

আগামী সংখ্যায় গোলটেবিল: জাতীয় সংহতির সাম্প্রতিক সমস্যা।
আলোচনা করেছেন: পি· এন· হাকসার, নিখিল চক্রবর্তী
ডঃ খুসরু, ডঃ নাজমা হেপতুল্লা
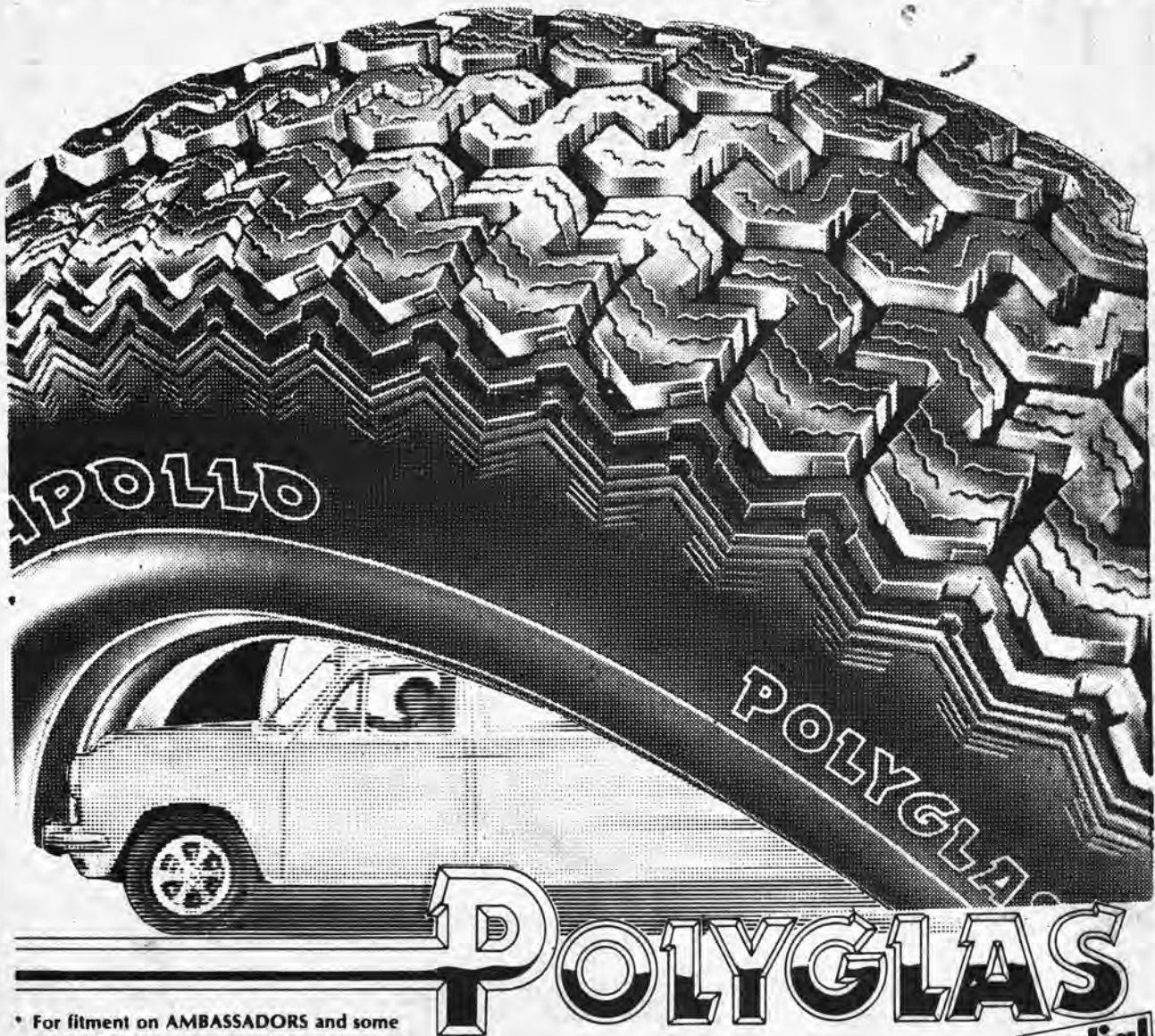
রথীন মৈত্র

বাংলা চিত্রকলার পালা বদল

অতনু বসু
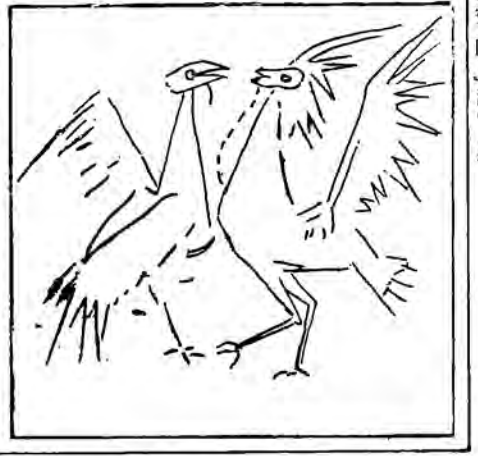
ক্যালকাটা গ্রুপের সূচনার আগে-আগে সময়টা ছিল এইরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটা এমনকি কলকাতাতেও এসে পড়েছে। পরোক্ষভাবে হলেও আমরা শুনতে পাচ্ছি যুদ্ধের আওয়াজ। ব্ল্যাকআউট রাত্রি, রাস্তাঘাটে গোরা সৈন্যের চলাফেরা, আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ, মাঝে-সাঝে দু-একটা নিরীহ বোমাও। চারদিকে সন্ত্রাস ও উদ্বেগ। বাংলাদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা তখন ফ্যাসিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে এই কলকাতাতেই, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের হাহাকার। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নিরন্ন গ্রামীণ মানুষের মিছিল। ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি। পথে মানুষের শব।

বাংলার তরুণ শিল্পীদের চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো ভাসছে এই সব দৃশ্য। উদ্বেগ ও শঙ্কা তাঁদেরও মনে—কিন্তু তাকে ঝেড়ে ফেলে রঙ-তুলি-ক্যানভাস হাতে নিয়ে তাঁরা সন্ধান করে চলেছেন। অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যে আত্মসমর্পণ নয়—শিল্পের রূপাবয়বকে খোঁজা এবং সেই সঙ্গে চারপাশের বাস্তবের চেহারাটাকে।

শিল্পের জগৎটা কীরকম ছিল? অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বেঙ্গল স্কুলের দাপট তখন দেশে। অথচ তার স্নিগ্ধ ও সুকুমার শিল্পরূপ সময়ের দিক থেকে অনেকটাই কী বেমানান হয়ে যায়নি? তরুণ শিল্পীদের তো মনে হতেই পারে বর্ণহীন, কিছুটা অবান্তর, অন্তত এই পরিবেশে। আগের যুগের নিশ্চিন্ততাকে ভেঙে দিয়েছে যুদ্ধের ও দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা। তাছাড়া আরও নানা ঘটনাই তো ঘটছে চারপাশে। দ্রুত পালটে যাচ্ছে সারা বিশ্বের, স্বদেশেরও—সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানুষের মন।

মোটামুটি এরকমই কোনো একটা সময়ে কলকাতা শহরের একই পাড়ার দুই তরুণ শিল্পী'র মাথায় কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল—সামাজিক পটপরিবর্তনের এই ধাক্কা এবং শিল্পের নিত্যনতুন আবিষ্কারের অস্থিরতাকে মেলানো যাবে কীভাবে? এই দুই বন্ধুর একজনের নাম সুভো ঠাকুর। এবং আরেকজন রথীন মৈত্র।

রথীন মৈত্র'র স্টুডিওতে বসে কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিল যেন এখনও সেই দাঙ্গার চেহারাটা বাইরে বেরুলেই চোখে পড়বে, এমন তার বর্ণনা। 'তখন কেবল ভাবছি স্টিরিওটাইপ ছবিই আঁকব না পারিপার্শ্বিক অবস্থার ছোঁয়া থাকবে তাতে? আমি আর সুভো তখনই মিট করলাম নীরদ, প্রদোষ, গোপাল, প্রাণকৃষ্ণ, পরিতোষ প্রমুখের সঙ্গে। ওরাও এভাবেই চিন্তা করছে আর ছবির নতুন নতুন চেহারাটাও যেন মনে মনে তৈরি করে ফেলছে সবাই।' এইভাবেই সকলের দেখাশোনা ও আড্ডা হতো প্রায়ই, যা পরে 'ক্যালকাটা গ্রুপ।' প্রতি সপ্তাহে নতুন ছবি প্রদর্শিত হতো। আড্ডা যখন জমাট তাকে আরও অলংকারে ভূষিত করলেন আস্তে আস্তে বহু সাহিত্যিক-শিল্পরসিক-কবি প্রমুখেরা। এসব নক্ষত্রেরা হলেন বিষ্ণু দে, হিরণকুমার সান্যাল, নীহাররঞ্জন রায়, ও. সি. গাঙ্গুলী, বিনয়কৃষ্ণ দও। বুদ্ধদেব বসু একটু পরে আলোকিত করেছেন এই আড্ডাকে। অনেকটা যেন সেই ইমপ্রেশনিস্ট বা মানে, মনে, রেনোয়াঁ দেগা প্রমুখদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, মালার্মের মেশামিশি। এখন এদেশে সেসব শুধুই স্মৃতি। রথীন মৈত্র'রা ভাগ্যবান। এঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক শায়েদ শারওয়ার্দি, পরিচয়-এর সম্পাদক সুধীন দত্ত, কিংবা রথীন মৈত্র'র দাদা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, গোপাল হালদার, এমন কি ধ্রুবতারাসদৃশ স্টেলা ক্রামরিশেরও। ১৯৪৩ সালে এইভাবে জন্মেছিল তাঁদের তখনকার এবং আমাদের এখনকার গর্ব ও অহঙ্কারের 'ক্যালকাটা গ্রুপ।'

সেই সময় পাশাপাশি প্রবহমান দুটি স্রোতের ধারা—পাশ্চাত্য আকাদেমিক রীতি ও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য বাংলা কলম। রথীনবাবু বললেন, 'দুই ধারাতেই কি রকম একটা একঘেয়েমি ছিল। অবনীন্দ্র ধারায় একমাত্র নন্দলালের কাজে বেশ সজীবতা ছিল।' ক্যালকাটা গ্রুপ অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত বাংলা কলমের রীতি প্রকরণকে সেভাবে সমর্থন না জানালেও ব্যক্তিগত বিরোধিতা করেননি কারোর প্রতি। নন্দলালকে পরবর্তীকালে মর্যাদার আসন দিতে কার্পণ্যও ছিল না তাঁদের। বললেন 'অন্যদিকে পাশ্চাত্য আকাদেমিক ধারাটাও যেন গতানুগতিকভাবে এগোচ্ছিল। সেই একই প্রতিকৃতি স্টিল-লাইফ। ওঁদের মধ্যে অতুল বসুই যা একটু সক্রিয় ছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় পশ্চিমী শিল্প জগতের যে বিরাট পরিবর্তন তার গনগনে আঁচের সামান্য আলোও এসে পড়েনি এঁদের কাজে। এঁরা একটু কনজারভেটিভ ছিলেন, ওসবের মধ্যে যেতে চাননি। যুদ্ধের প্রবল ধাক্কাটাও অনুভব করেননি ওঁরা।'
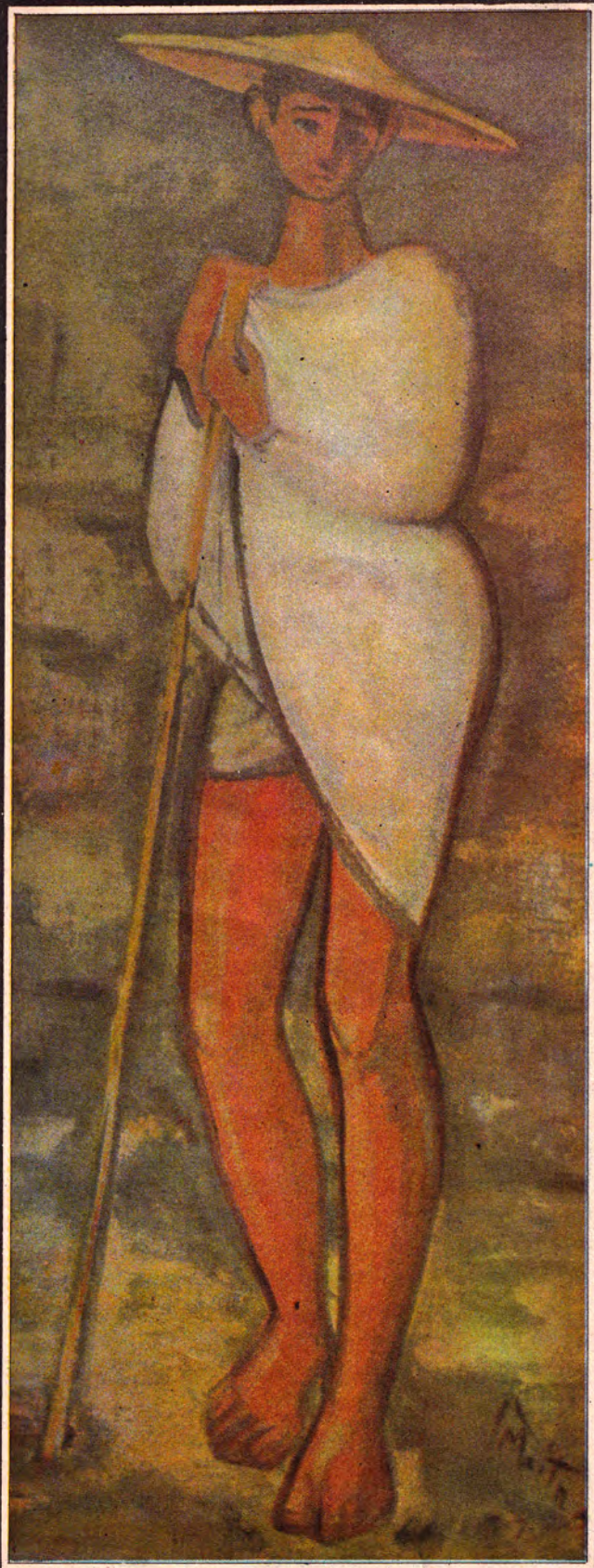
রথীন মৈত্রর ছবি

১· রাখাল বালক   ২ সান্ধ্য উপাসনা
৩ ওরা জাল ফেলে

ফটো □ সোমনাথ ঘোষ
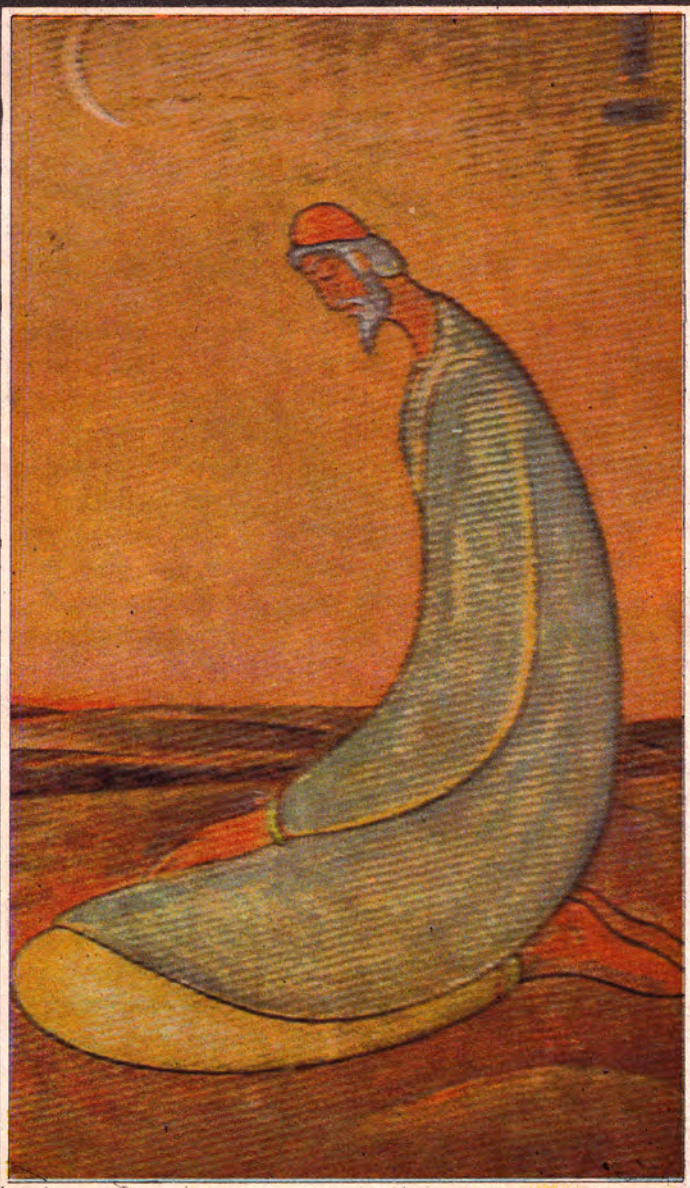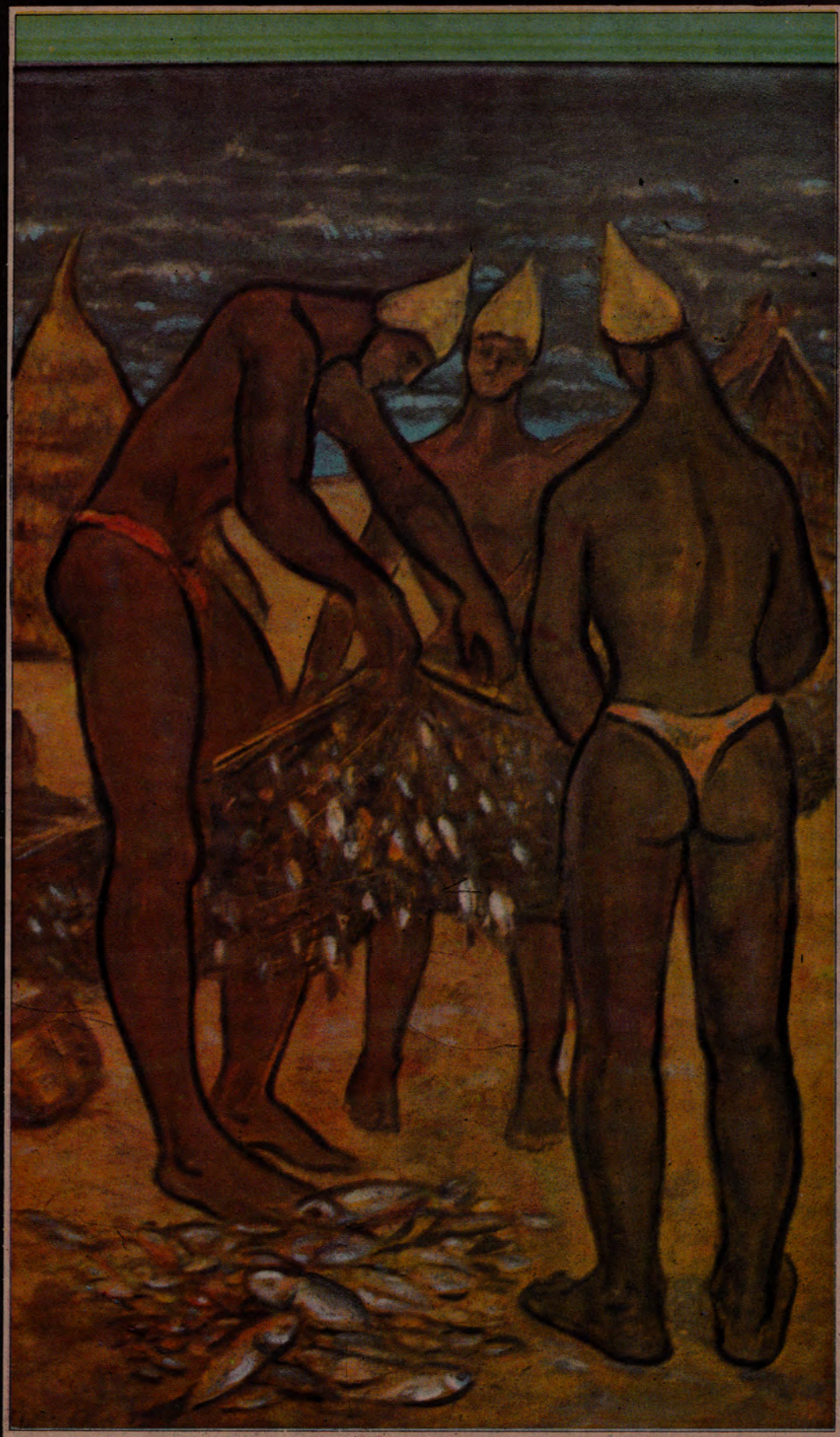
এইভাবে কথার পিঠে কথা জুড়তে জুড়তে নানা প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে আমরা। রথীন মৈত্র'র সামনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন এইভাবে ঝুলিয়ে দিলাম ঃ

পাশ্চাত্য শিল্পকলা, সে কিউবিস্ট, পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট বা ইমপ্রেশনিস্ট যাই হোক, এ জাতীয় ছবির সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎকার কিভাবে? কোনো প্রদর্শনী, ছাপানো বইপত্রের ছবি ? বা বিদেশাগত শিল্পীদের মারফৎ ?

উত্তরটা এইভাবে এল 'শিল্পের জগতে ইওরোপের আকাদমির মুভমেন্টের পরে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল মোটামুটিভাবে তার অনেকটা বইপত্র-পত্রিকা থেকে জেনেছি। সঠিক পরিচিত হলাম যুদ্ধের সময় কিছু বিদেশী শিল্পী-সাহিত্যিক যাঁরা এসেছিলেন এখানে তাঁদের মারফৎ। কবি-সাহিত্যিক মার্টিন কার্কম্যান, কবি মিলার, লন্ডন গ্রুপের সদস্য ব্রিটিশ ভাস্কর ম্যাক উইলিয়মস ও আরো অনেকে তখন এসেছিলেন। সঙ্গে এনেছিলেন ওখানকার আপ-টু-ডেট বইপত্র, ছবির চমৎকার সব প্রিন্টস। আমাদের ৫ নম্বর এস· আর· দাস রোডের বাড়িতে তখন এঁরা আসতেন, সমকালীন পাশ্চাত্য শিল্পকলা সম্পর্কে বহু আলোচনা এঁদের মুখ থেকেই তখন আমরা শুনতাম। যামিনী রায়ের কাছেও এঁরা যেতেন আর বিষ্ণুবাবুর বাড়িতেও হতো এসব আলোচনা। আসলে যামিনীবাবুরা খুব কম্যুনিকেট করতে পারতেন।

'অবশ্য কাজ তখন আমরা যা করছিলাম তাতে পুরোপুরি একটা স্বাধীনতার হাওয়া বাতাস ছিল। নিজের বৈশিষ্ট্য খোঁজার জন্যে তখন বাইরের থেকে ধার করার প্রচেষ্টা একদিকে, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করারও ঝোঁক, তারপর মেলানো। তবে পরিচয়টা বিদেশী চিত্রকলার সঙ্গে এভাবে হলেও আরও কিছু কথা বলতেই হয়। যেমন তুমি বললে কোনো প্রভাব বা শিল্প আন্দোলনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল কিনা—ধরো যার যেমন মেন্টাল মেক-আপ সে সেভাবেই গ্রহণ করেছে। নীরদ যেমন একটু সেজানের দিকে ঝুঁকছিল। আবার গোপাল ফভিস্টদের কালার নিয়েছে, অন্যদিকে জাপানী হকুসাই শিল্পীদের কাছ থেকেও প্রেরণা পেয়েছিল। প্রদোষ একমাত্র বিদেশে গিয়েছিল বলে ওদের কাজের সঙ্গে ওয়াকিবহাল ছিল। সেইরকম এক একজন বেছে নিয়েছিল কেউ মদিল্লিয়ানি, কেউ মাতিস, কেউ পিকাসো ইত্যাদিকে।

'তবে তখন পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের নিয়ে আলোচনা হতো খুব। আমার যেটা মনে আছে—ওদের কালার, ফর্ম, নব্য আবিষ্কারের যে নেশা ওদের মধ্যে জেগেছিল তা খুব ভাল লাগত। পাশাপাশি আমাদের এখনকার লোকশিল্প, বাঁকুড়ার খেলনা, আশুতোষ মিউজিয়ামে নানারকম দেশীয় শিল্পসামগ্রী দেখার একটা অনুসন্ধিৎসু মন ছিল। সব মিলিয়ে একটা নতুন আবিষ্কারের নেশায় খুব উদ্বুদ্ধ ছিলাম।'

ইনফ্লুয়েন্স-এর কথা তুলতেই জানতে পারলাম রথীন মৈত্রকে তেমনভাবে প্রভাবিত না করলেও ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল যে তিনজনের কাজ তাঁরা হলেন এল গ্রেকো, মদিল্লিয়ানি ও মাতিস। আর ভাস্কর্যে অবিস্মরণীয় হেনরী মুর। রথীন মৈত্র'র তখনকার ছবিতে, এঁদের প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। বললেন, 'আমি ওঁদের এসেন্সটা নিয়েছি কিন্তু ভারতীয়ত্বকে রেখেই।'

বেঙ্গল স্কুল ও পাশ্চাত্যের ইমপ্রেশনিজম থেকে পরবর্তী সমস্ত শিল্প আন্দোলনের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার দাবি করেছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপ। বর্জনের দিকে ততটা স্পৃহা নেই। গ্রহণ ও বর্জন—এমন কি হয়ত গ্রহণের দিকেই বেশি ঝোঁক। এই সময় রথীন মৈত্র'র ভালো লাগত তাঁদের কাজ, বিশেষ করে যাঁরা নতুন অবদান আনতে সক্রিয় ছিলেন চিত্রকলায়। যেমন অমৃতা শেরগিল, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর।

যুদ্ধোত্তর কালে ক্যালকাটা গ্রুপ বিপুলভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল ১৯৪৪এ। তখন বম্বেতে প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই অজস্র সাড়া। ক্যালকাটা গ্রুপের সেই বিখ্যাত প্রদর্শনী দেখতে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন এখনকার স্মরণীয় শিল্পীরা, তখন নিশ্চয়ই নবীন, কে· কে· হেব্বার, রাজা, বেন্দ্রে, হুসেন, চাভদা, আরা প্রমুখরা। আর প্রশংসার ফুলে ধন্য হয়েছিল ক্যালকাটা গ্রুপ। ডঃ মুলকরাজ আনন্দও তখন এঁদের সাহায্য করেছিলেন। নতুন ছবির গায়ে গায়ে এইভাবে লটকে দেয়া হয়েছি এক একটা ঝলমলে প্রশংসার মেডেল। ত ' সেসব ছবির মাধ্যম অধিকাংশই ছিল টেম্পারা বিষয় অতি সাধারণ। ট্রাফিক পুলিস, রিফিউজি, নৌকাবাইচ, ফেস্টিভ্যাল, রেস্তরাঁ থেকে দৈনন্দিন জীবন থেকে খুঁটে নেওয়া প্রচুর ঘটনাবলী।

প্রশ্ন রেখেছিলাম ঃ যুদ্ধ দাঙ্গার মধ্যে আশা নিরাশা দ্বন্দ্ব আর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার জোয়ারে যখন আপনারা ভাসমান তখনকার প্রধান সমস্যাটা কি ছিল ?

—'সমস্যা ? দেখ আমাদের কাছে তখন একটাই কথা যে সমস্যা যেটুকু তা আমরা তুলে ধরব তুলির সাহায্যে ক্যানভাসের বুকে। প্রদোষ তখন লেবার ট্রাবল নিয়ে জড়িয়ে। সর্বহারাদের নিয়েও আমরা কাজ করেছি তখন প্রতিনিয়ত। কিন্তু সব সময়ই একটা দোলাচল ছিল। পথটা হঠাৎ বা সহজভাবে তৈরি করে নেওয়া তো যায় না! আসলে যুদ্ধের যে প্রতিক্রিয়া তখন সর্বত্র তার মধ্যে থেকেই সমস্যাগুলো উঠে এসেছিল।'

পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের পরম্পরা, বিমূর্ত রূপারোপ রথীন মৈত্রকে নাড়া দিলেও সেসব ছাড়িয়ে তাঁর ছবিতে গ্রাম্য লৌকিক অনুষঙ্গ, লোকায়ত শিল্পের ছায়াসম্পাত ঘটেছিল। এর কারণ যামিনী রায়ের সংস্পর্শ। তিনি বললেন, 'যামিনীদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি সেইসময়। আর প্রায়ই যামিনীদার ছবির বিষয় থেকে শুরু করে রঙ, রেখা, সর্বোপরি রচনা আমাকে নাড়া দিত। ওঁর বাড়ি যেতাম আর কাজ দেখতাম, প্রচুর আড্ডা হতো। বিষ্ণুবাবু, দাদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), কবি চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় আসতেন। হয়ত অনেকটা ওই সময়ে যামিনীদার সান্নিধ্য ছাড়তে পারিনি বলেই আমার কাজে লোকায়ত শিল্পানুষঙ্গ বা পটের

বিষ্ণু দে

তরুণ চিত্রকর এবং ভাস্করদের দল, যাঁরা নিজেদের ক্যালকাটা গ্রুপ বলে পরিচয় দেন, তাঁরা যে অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন, তার কারণ তাঁদের কাজে দেখা গেছে আমাদের শিল্পজগতের সেই দুর্লভ ব্যাপারটি—রূপাবয়ব বা ফর্মের চেতনা, যা অ্যাবস্ট্রাকশনকে ভয় পায় না। আমাদের দেশে, বর্তমানে, ন্যাচারালিস্টিক

আর্টের যে স্থূল উৎস রয়েছে, তার কথা ভাবলে পূর্বের ঐ প্রবণতার 'প্রগতিশীল' চরিত্র স্বতঃপ্রকাশ—দৈনন্দিন জীবনসম্ভোগী চিত্ররচনার আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ স্টাইলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথ কোনো সময়েই তা রুদ্ধ করে না। বস্তুত, এই গ্রুপের কোনো-কোনো সভ্যদের কাজের মধ্যে এই দুই ঝোঁকেরই টানাপোড়েন দেখি—যেমন নীরদ মজুমদার ও রথীন মৈত্র'র মধ্যে।...

...রথীন মৈত্র শুরু করলেন অন্যভাবে। আকাদেমিক শিক্ষা আয়ত্ত করেই রথীন

সরলীকরণের ছাপ পড়েছিল।' যদিও জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখি, সরীসৃপ-বনজঙ্গল ইত্যাদি এসেছিল তখন তাঁর দ্বিমাত্রিক পট জুড়ে। আর ছিল রঙের উজ্জ্বলতা। নিসর্গ থেকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে চলে এসেছিলেন তখন ছবির মাধ্যমে, ছবির বিষয় ও রচনার সাহায্যে অত্যন্ত সাবলীলভাবেই।

পাঠকের এ প্রসঙ্গে স্মরণ থাকতে পারে, বিষ্ণু দের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সন্দ্বীপের চর'-এর সেই অসামান্য প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন রথীন মৈত্র। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়ানো বলিষ্ঠ একজন মানুষ

মাধ্যমে। যেমন দেশের প্রসঙ্গ উঠতে, বলছিলেন, 'আমাদের দেশে যামিনীদা ছাড়াও আগে গগনেন্দ্রনাথকে খুব ভাল লাগত। গগনেন্দ্রনাথের কিউবিজম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তখনকার সমাজকে ব্যঙ্গ করে যে কার্টুন তিনি এঁকেছিলেন ওই ধরনের পাওয়ারফুল কাজ কেউ করেনি।'

রথীন মৈত্র'র পূর্বাপর কাজের প্রদর্শনী শেষ হল আকাদমিতে। তাঁর প্রথম দিককার যেসব অনবদ্য কাজ নিয়ে নানা প্রশ্ন, তারই একটি হল বিশাল থামের মতো পা-ওয়ালা জেলের দল, সমুদ্রতীরে নুলিয়াদের মাছ ধরার দৃশ্য। এছাড়া করুণ বালক,

কোথায় আছে সেইসব অফুরন্ত ছন্দ ও ঝংকার। কাছে দাঁড়ালেই বাজবে, ক্রমাগত বাজবে। আক্ষেপ করে বললেন, 'আমার ছবি মনে হয় বেশির ভাগ লোক মূল্যায়ন করতে পারেনি ঠিকঠিক। অনেকেই বলেন, আমি দুর্ভিক্ষের ছবিই এঁকেছি, মৃতদেহর ছবি নিয়ে মেতে আছি। আসলে চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে তাই আমি আহরণ করে নিজের মতো কাজে লাগাই ছবিতে। আমার ছবির মূল জিনিস ছন্দ, রং, সংগীত। এগুলো অনেকেই ধরতে পারেনি।'

ফিরে গেলাম ক্যালকাটা গ্রুপে। শেষের দিকের অবস্থায়। যদিও পরে অনেক পাল্টেছিল। তবুও

মৈত্র তেল রঙয়ের দক্ষতার সুনির্দিষ্ট একটা স্তরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর পোর্ট্রেটগুলিতে আছে তাঁর কবজির দ্বিধাহীন প্রতিশ্রুতি এবং দৃষ্টির নিশ্চয়তা। সম্প্রতি তিনি টেম্পারা এবং টেম্পারার উপর তেল রঙয়ের কাজ করে চলেছেন। নীরদ মজুমদারের কঠিন ঘনত্ব এবং প্রাণকৃষ্ণ পালের সুকুমার স্পর্শ—এ দুয়ের মাঝখানে রথীনের কাজ। যদিও কোনো অর্থেই রথীন ব্যাখ্যানমূলক কিংবা মিনিয়েচার ছবি-আঁকিয়ে নন—তবু অলঙ্কৃত মোটিফ ব্যবহারে কখনই তিনি পিছপা হন না। আমি অবশ্য অলঙ্করণ শব্দটি ব্যবহার করছি মাতিসের কথা মনে রেখেই, এবং রথীনের মোটিফ বেরিয়ে আসে রঙের সেই উপরিতল প্রয়োগেই, আর সুনিশ্চিত রেখার ধ্রুপদী সুরপ্রবাহে। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো সাহিত্যিক সংজ্ঞা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না এবং যা তিনি গড়েন তার ফলাফল নিয়ে একটুও মাথা ঘামান না। মানুষটি মুক্তমন, বিনীত, খাঁটি আর্টিস্ট যাকে বলে। তাঁর কাজেও অসামান্য প্রগতির সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। ইতিমধ্যে তাঁর দুর্ভিক্ষ-বিষয়ক ছবির রেখা-সারল্য ও জোর, কিংবা 'বিশ্রামরত চাষী' বা 'মাঝি' বা 'তিনজনের পরিবার' জাতীয় ছবিতে রঙের চিত্রধর্মী ব্যবহার, কিংবা ভয়ানক সেই পরিত্যক্ত মা ও শিশুর ছবিটি—সমস্তই এই তরুণ চিত্রশিল্পীর ক্ষমতারই প্রমাণ।

আর তিনি তো এখন ক্যালকাটা গ্রুপের সম্পাদকও।

['দি পিপল' পত্রিকার ২২ মে, ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ]

এই স্কেচটিও রথীন মৈত্র বিষ্ণু দে'র বাড়িতে বসেই এঁকেছিলেন। ছাত্র রথীন শিক্ষক বিষ্ণু দে'র কাছে তখন ইংরিজি সাহিত্য পড়ছেন।

রথীন মৈত্র'র কাজের পরম্পরা যখন অনেকটা আস্বাদিত হয়ে গেছে, দেখা হয়ে গেছে তাঁর নানা ধরনের ছবি, হঠাৎই সুররিয়েলিস্ট ছবি দেখে তাই তাঁকে প্রশ্নবাণ কেন ওই ছবি আপনি এঁকেছিলেন, কোনো প্রতিক্রিয়া অথবা প্রভাব? বললেন, 'আমার সুররিয়েলিস্ট ছবি "ব্লুহর্স" অবশ্য ক্যালকাটা গ্রুপের অনেক আগের আঁকা। আসলে রিয়েলিজম না এঁকে সুররিয়েলিজম চালানো যায়, কিন্তু ফাঁকিটা এতে একটু বেশি ধরা পড়ে। পরে অবশ্য আমি সালভাদোর দালির ছবি দেখেছি। হঠাৎ একটা শক্ বলতে পার, ভাবায়, কিন্তু নাড়া দেয় না। তারও আগে দাদাবাদ, পপ আর্টও দেখা হয়ে গেছে—ওসব একেবারেই আলোড়িত করে না।' বললাম জার্মান এক্সপ্রেশনিজম? রথীন মৈত্রের চটপট উত্তর 'দু একজনের কাজ দারুণ, এছাড়া ধর পল ক্লী বা মার্কের ছবি আমার খুব ভালো লাগে। মুঙ্ক-এর 'দ্য ক্রাই'ও সাংঘাতিক ভালো ছবি। পিকাসোর ব্লু প্রিয়ড ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল আমায়। আর ব্রাক-পিকাসোকে আমি স্টাডিও করেছি প্রচুর। আবার গোইয়া'র কাজও আমাকে নাড়া দেয়, গোইয়া গ্রেট আর্টিস্ট।'—এইভাবে বেশ কিছু ভালো লাগা শিল্পী তাঁর ঠোঁটে এসে গেলেন কয়েকটি রাতের ঘুম কাড়া ভুবন বিখ্যাত ছবির নিঃসঙ্গ নীল চোখের যিশু, সাঁওতাল রমণীদের নাচ বারবার আমাদের মোহিত করেছে। যুদ্ধের সময় আঁকা মুসলমানের নমাজ পড়ার একটি অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন তিনি — বাঁ দিকের ওপরে সরু কাস্তের মতো একফালি সাদা চাঁদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাঁটুগেড়ে বসা দীর্ঘায়ত একজন মুসলমানকে এঁকেছেন একটি অসামান্য ছন্দে। যা একই সঙ্গে মোহিত করেছে বর্ণের ধূসর ও উজ্জ্বলতায় এমনকি তার অসাধারণ কম্পোজিসনে। এ ছবির প্রতিটি রেখার গভীরে যেন অজস্র সিম্ফনি, অফুরন্ত সুর কিন্তু অদ্ভুত রকমের নীরবতায় যা আমাদের আপ্লুত করে।'গোপালপুরের নুলিয়াদের যেভাবে দেখেছি, যেন পাথরে কোঁদা ওদের চেহারা। আর ওই পা, গোটা শরীরের জীবনী শক্তিটাই মনে হয় ওই পা দুটোর ওপর। ওই বিশাল চেহারাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওই দুটো পা-এর স্থাপত্য। তাই পা-এর ওপরেই ওরকম জোর দিয়েছি।' এ কথা বলে রথীন মৈত্র সেই সময় এর আঁকা হলুদ পুরানো খাতায় করা নুলিয়া জেলেদের কয়েকটি অসামান্য স্কেচ দেখালেন কলমে আঁকা। গোপালপুরের সমুদ্র উঠে এসেছে খাতার হলুদে আর জীবন্ত সব নুলিয়ারাও। এলোমেলো বাতাস, মাছের আঁশটে গন্ধ, চকচকে আঁশ, রৌদ্রের হাইলাইট সব ওই খাতায় যা পরে রঙিন হয়েছে ক্যানভাস জুড়ে। রথীন মৈত্রর ছবি দেখতে দেখতে সব কিছু ছাড়িয়েও রঙের হারমনি ও সংগীতে নিঃসন্দেহে আপ্লুত হওয়া যায়। কষ্ট করে খুঁজতে হয় না

ক্যালকাটা গ্রুপ একটা ঐতিহাসিক সত্য। ক্যালকাটা গ্রুপের পরে দিল্লীতে পঞ্চাশ সালে শিল্পীচক্র হয়েছিল। দু-দলেরই লক্ষ্যের দিক থেকে চমৎকার মিল ছিল। ওরা পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত তখন, কলকাতায় এসে কলোনি করে গ্রুপ গড়েছেন। ছিলেন কানওয়াল কৃষ্ণ, ভবেশ সান্যাল প্রমুখেরা। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে গড়ে উঠেছিল স্কাল্পটার্স গিল্ড, চিন্তামণি কর প্রমুখের নেতৃত্বে।

শেষের দিকে প্রশ্নগুলো হয়ত এলোমেলোই হয়ে পড়ছিল। কিন্তু শিল্পী সাজিয়ে নিচ্ছিলেন তাকে নিজের মতো করেই। যেমন প্রশ্ন ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনে পল ক্লী, কান্ডিনস্কির ছবির প্রদর্শনী নিশ্চয়ই দেখেছিলেন — তার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল? উত্তর 'ওটা আনফরচুনেটলি দেখতে পাইনি, তবে তারপরে আমি কান্ডিনস্কি সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেছি, দেখেছিও। আমার নিজের কাছে একটা নতুন জগতের পথিক তিনি। ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল একসময়।'

আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের সম্পর্কে রথীন মৈত্র অত্যন্ত আশাবাদী। বললেন, 'দেশে এই মুহূর্তে বেশ কিছু ইয়াং ট্যালেন্ট আছেন। ওরা যদি একটু ধীর স্থির হয়ে কাজ করেন, আমার মনে হয়, ভারতের অন্য প্রান্তের নামী শিল্পীদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। ক্ষমতা যা আছে তার সদ্ব্যবহার হয় কিনা সেটাই এখন দেখবার।' □

চসাদ

বিমল বসু

আফ্রিকার প্রায় মাঝখানে চসাদ। ফরাসী-উপনিবেশ এই ছোট্ট দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৬০-এ। এর চারপাশে ছয় দেশ — লিবিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, মি-এ-আর ও সুদান। মাত্র ৪০ লক্ষ লোকের এই প্রায়-মরূদ্যান রাজনীতির দিক থেকে প্রধান খবর হয়ে উঠেছে।

চসাদ-এর উত্তর দিকটা মুসলিম অধ্যুষিত ও দক্ষিণ দিক খ্রিস্টান-প্রধান। ১৯৮০ সালে এক আন্তর্জাতিক আলোচনার ফলে গোকুনিকে রাষ্ট্রপতি করে এক সরকার তৈরি হয় দজামেনাতে। গোকুনির পেছনে লিবিয়ার সমর্থন ছিল।

কিন্তু গোকুনিকে দক্ষিণ-প্রদেশ স্বীকার করেনি। তাই গোকুনি, এখন লিবিয়ার সাহায্য নিয়ে সৈন্যদলসহ দক্ষিণের দিকে এগোচ্ছেন। ১৯৭৮ সালের এপ্রিলেও তিনি এ-রকম এগিয়েছিলেন। তখন ফরাসীরা এসে তাঁকে আটকেছিল। এবারও ফরাসীরা বলেছে, দরকারে তারা বসে থাকবে না। আবার, লিবিয়াও বলেছে, ফরাসী-হস্তক্ষেপকে তারা বিদেশী হস্তক্ষেপ বলে মনে করবে।

ভারতের টি-বোর্ডের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীবিমল বসু চসাদে গিয়েছিলেন। তাঁর চসাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এই প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশটি সম্পর্কে আমাদের অনেক নতুন তথ্য দেবে।

চসাদ যাবার প্রস্তাবে স্বভাবতঃই রোমাঞ্চ বোধ করছিলাম। একটি নতুন দেশ দেখা হবে বলে তো বটেই ; দেশটি অত্যন্ত অপরিচিত বলেও। চসাদ রাজ্যের নাম শুনেছি, মানচিত্রে দেখেছি— আফ্রিকার মধ্যস্থলে, কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাইনি, যাঁর কাছ থেকে এই দেশ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি। সুতরাং প্রস্তাবটি আসবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

ইংরাজীতে লেখে 'CHAD'। তবে দেশটা ফরাসী প্রভাবান্বিত বলে বানান লেখা হয় 'TCHAD'। 'চ' ও 'স' মিলিয়ে একটি শব্দ বার করতে হয় প্রকৃত উচ্চারণটি করবার জন্য। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে এই শব্দটি না থাকার দরুণ আমাদের মুখে শোনায় অনেকটা বাড়ির ছাদের মতো।

কায়রো থেকে খার্তুম হয়ে ছাদ যেতে হবে। শুনলাম ছাদের রাজধানী জামেনায় (N' Djamena) সপ্তাহে একদিন প্লেন যায়। সেই প্লেনখানাই আবার নানা জায়গা ঘুরে সাতদিন পরে জামেনা হয়ে খার্তুম ফিরে আসে। অর্থাৎ জামেনায় একবার পৌঁছলে সাতদিনের জন্য ফেরবার রাস্তা বন্ধ। একেবারে বন্ধ বলা যায়, কেননা জামেনা থেকে প্যারী যাবার সুবন্দোবস্ত আছে। তবে সে অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। যে রাজ্য সম্বন্ধে কোনো খবরই জানা নেই, সেখানে পুরো একটি সপ্তাহ কাটানো যে খুব সুখকর হবে না, তার প্রথম ইঙ্গিত পেয়েছিলাম কায়রো এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে টিকিট কাটতে গিয়ে। এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মচারী জামেনার নাম শুনে একবার কাউন্টার থেকে মুখ তুলে তাকালেন। কায়রো থেকে এখানে ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করি বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল এবং আমি যে ভারতীয় তাও তিনি জানেন। ভদ্রলোক কাউন্টার থেকে মুখ তুলে একটু মুচকি হেসে বললেন — 'আমি মিশরীয়, বিশ বছর কায়রো এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে কাজ করছি, আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয়কে জামেনার টিকিট কাটতে দেখিনি। আপনার কাছে আমার নতুন অভিজ্ঞতা হল। আমিও একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ওখানে কি ভারতীয়দের বিশেষ কোনো অসুবিধা আছে ?' তিনি বললেন, 'না সেরকম কিছু জানা নেই, আদতে ও জায়গাটা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই।' টিকিটখানা হাতে নিয়ে ভাবলাম — মধ্য আফ্রিকার কোন গভীর অরণ্যের অন্ধকারে প্রবেশ করতে যাচ্ছি ? — কে জানে ?

ছাদ দেশটি আফ্রিকার একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত। চারদিকে মরুভূমি আর জঙ্গল লেক ছাদ নামক হ্রদটিকে ঘিরে রয়েছে। আফ্রিকার পূর্ব ও পশ্চিম দুই উপকূল থেকেই দূরে ও বিচ্ছিন্ন। Landlocked দেশ। ইউরোপীয়রা বহুকাল ধরে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে হানা দিয়েছে, কিন্তু ছাদ অঞ্চলে পৌঁছতে পেরেছে অনেক পরে। আজ আমরা মানচিত্রে ছাদ বলে যে দেশের সীমারেখা চিহ্নিত দেখি — তা খুব হালের। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশের সন্ধানে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল আত্মসাৎ করতে শুরু করেছে, তখন ফরাসীরা পশ্চিম উপকূলের কিছুটা অংশ নিয়ে শুরু করে মধ্য আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করে বসেছিল। ১৯২৪ সালে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করে, এই বিস্তৃত অঞ্চলকে French Equatorial Territory আখ্যা দিয়ে এক সীমারেখা টেনে দিল। পরে ১৯৪৬ সালে, ফরাসী শাসকরা তাঁদের শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে, চারটি ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে নিল। তারই একটি আজকের ছাদ।

খার্তুমের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের উপর ছাদের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব। তাই আশা ছিল, খার্তুমের ভারতীয় দূতাবাসে ছাদ সম্বন্ধে খোঁজখবর পাব। তেমন সুবিধা কিছু হল না। বরং জানা গেল যে ভারত সরকারের ট্যুরিং অফিসারদের জন্য দৈনিক খরচ বরাদ্দই এখনো স্থির হয়নি। আমি যাব শুনে বরং তাঁরা আমার ঘাড়ে কিছু কাজ চাপিয়ে দিলেন। বলে দিলেন ভালো করে জেনে আসতে যে ওখানকার হোটেলের খরচ-খরচা কি রকম, যার

ভিত্তিতে সরকার দৈনিক বরাদ্দ স্থির করতে পারেন। যতই খবরাখবরের অভাব আবিষ্কার করছি ততই মনের অন্যকোণে Adventure নাড়া দিচ্ছে। তবু এখানে একটা হোটেলের নাম জানা গেল। আর জানা আছে একটি মাত্র ভদ্রলোকের নাম, যাঁর সঙ্গে কায়রোতে সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তাঁকে অবিশ্যি একটা খবর পাঠানো হয়েছে। তবে ওখানে খবর পৌঁছানো খুব কঠিন, সুতরাং সে খবর পেয়েছে বলে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

পরদিন ভোর সাতটায় খার্তুম থেকে জামেনা অভিমুখে প্লেন ছাড়বার কথা। পিঠে একটা পুরানো ব্যথা খচ্‌খচ্ করছে। একটা জানা ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে হবে। ওষুধটা কিনতে অনেক ঘুরতে হল। আরও দুচারটে টুকিটাকি কাজ সেরে বেলা তিনটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছানো গেল। হোটেলে চাবি নিতে গিয়ে তার সঙ্গে পেলাম একটি Message। সুদান এয়ারওয়েজ খবর দিয়েছে প্লেন বার ঘন্টা লেট। অর্থাৎ সকাল সাতটায় নয়, সন্ধ্যা সাতটায় প্লেন ছাড়বে। সারাদিন গড়িয়ে কাটিয়ে বিকেল পাঁচটা নাগাদ এয়ার পোর্টে গিয়ে হাজির হয়েই শোনা গেল যে সাতটায় নয় রাত দশটায় প্লেন ছাড়বে। অগত্যা এয়ারপোর্ট রেস্তোরায় বসে বসে চা কফি ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আটটা নাগাদ ভিতরে ঢুকে Duty Free shop-এ জিনিসপত্র দেখছি। Loudspeaker-এ ঘোষণা শুনলাম দশটা নয় রাত বারটায় প্লেনখানা ছাড়বে। তখন বসে বসে ঝিমানো ছাড়া আর কিছুই করবার মতো উৎসাহ পাচ্ছি না।

হঠাৎ চোখে পড়ল একজন সর্দারজী Duty Free Shop-এ হুইসকি কিনছেন। ভাবলাম যাক, অন্তত একজন ভারতীয় সহযাত্রীকে পাওয়া গেল। খুব উৎসাহিত হয়ে, আমার বিখ্যাত হিন্দিতে সর্দারজীর সঙ্গে খুব দোস্তীভাবে আলাপ করতে শুরু করলাম। উনি নাকি আমাকে অনেক আগেই দেখেছেন তবে ভারতীয় বলে মনে হয়নি, মনে করেছেন আফ্রিকারই কোনো দেশের অধিবাসী। আশ্চর্য কিছু নয়, আমার গায়ের রং দেখে এরকম অনেকেই ভাবতে পারেন। সর্দারজীদের ঐ এক মস্ত সুবিধা। পাগড়ি দেখলে আর এরকম ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। দেশী লোক পেয়ে মনের আনন্দে দুজনেই খুব কথা বলছি। দেখলাম, সর্দারজী দুটো Scotch whisky কিনে ব্যাগে পুরলেন। তারপর আমরা দুজন গিয়ে একটা লম্বা সিটে পাশাপাশি বসলাম। বীয়ারের টিন বের করতে করতে বললেন, 'আইয়ে বীয়ার পীজিয়ে।' আমি বললাম, 'মাপ করুন, এখন বীয়ার খেলে আমার পেটের মধ্যে ভুটভাট শুরু হবে। তা আপনি খান আমি বসছি আপনার সঙ্গে।' সর্দারজী ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'আরে ভুটভাট কেয়া, ইয়ে ডাচ বীয়ার হ্যায়, কুছ নেই হোগা।' বলতে বলতে দুটো টিন খুলে ফেলেছে। অগত্যা নিতেই হল। পরে অবিশ্যি জানলাম যে দুটো বীয়ারের টিন খালি করে ব্যাগে একটু জায়গা সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে আর একটি whisky ঢোকাবেন। এমন সৎ ইচ্ছায় আর বাধা দেবার সাহস হল না। বীয়ার খেতে খেতে নানা কথা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি জামেনাতেই থাকেন না অল্পদিনের জন্য যাচ্ছেন।' সর্দারজী অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এয়ার ইন্ডিয়ার ভদ্রলোকের এই রকম চাউনি ছিল। পরে বললেন, 'ওখানে কেন যাচ্ছেন, ওখানে কোনো মানুষ যায়— আরে রামচন্দ্র! উধার কোই বিজনেস নেহি হোগা।' লজ্জায় ও ভয়ে হাত থেকে বীয়ারের টিনটা পড়ে গেল। গল্পে আছে যে সর্দারজী দেখা যায় না এমন জায়গা পৃথিবীতে নেই। এমন কি, শোনা যায়, তেনজিং নাকি এভারেস্টে উঠে দেখেছিল যে, একজন সর্দারজী সিরিশ কাগজ দিয়ে একটা মোটরের প্লাগ ঘষছে। সেই সর্দারজী যদি জামেনা সম্বন্ধে এরকম উক্তি করেন, তবে যে-আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে এবং ঝোলভাত খেয়ে মানুষ হলাম, তার যে কী অবস্থা হতে পারে — পাঠক অনুমান করে নিন।

রাত একটা নাগাদ প্লেন সত্যি সত্যি ছাড়ল। আমরা দুজন পাশাপাশি বসলাম। বচন সিং যাবেন কানো লাগোস, লন্ডন, প্যারী, বম্বে। আমি আগে নামব। সিটে গিয়ে ঠিক হয়ে বসতেই ঘুমে আমার চোখ ভেঙে এল। খাবার চেষ্টা না করে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ প্লেন এসে জামেনায় নামল। বচন সিং-এর সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বেরিয়ে এলাম। আমরা মাত্র ছজন যাত্রী জামেনায় নামলাম। গভীর অন্ধকার। এয়ার পোর্টে একটি আলো টিমটিম করছে। কোনোপ্রকার কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা যে যার মতো বেরিয়ে এসে কাস্‌টমস্ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসার নেই। সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। খানিকক্ষণ পরে একজন কোর্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে এসে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দিলেন। ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। গেটের বাইরে এসে দেখি ট্যাক্সি বা কোনোপ্রকার যানবাহন নেই। দুখানা ট্যাক্সি ছিল অন্য যাত্রীরা নিয়ে চলে গেছে। হতাশ হয়ে আবার স্যুটকেসটা টানতে টানতে গেটের মধ্যে ঢুকলাম।

কায়রোতে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী। ভাবলাম, ছোট জায়গা হয়ত ভদ্রলোকের নাম বললে কেউ কেউ চিনতে পারবে। একজন এয়ার লাইনসের কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ্যাডামহ্যাগী বলে কোনো ব্যবসায়ীকে জানে কিনা। সে ভদ্রলোক হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ রকম নাম সে জীবনেও শোনেনি। উপায়ান্তর না দেখে ব্যাগ খুলে ওঁর নাম ঠিকানা বের করলাম। টেলিফোন করবার জন্য বুথের দিকে এগোতে দেখি একজন কর্মচারী বুথে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমার অনুরোধ তার কাছে বোধগম্য হল না। আমার ঘড়িতে তখন সাড়ে চারটে। এখানকার লোকাল টাইম ঘণ্টা খানেক কম হবে। আস্তে আস্তে সব লোকজন চলে গেল। কেবল মেন গেটের ধারে একটি লোক ঘুমুচ্ছে। হয়ত পাহারাদার হবে। বাকি রাতটা এয়ার পোর্টেই কাটাতে হবে মনে করে বসার মতো একটা জায়গা খুঁজছি। না পেয়ে গেটের ধারে এসে দাঁড়ালাম। পাহারাদারটি যেখানে শুয়েছিল, তার কাছাকাছি স্যুটকেসটা রেখে তার উপর বসলাম। এয়ার পোর্টে জনপ্রাণী নেই। দূরে ব্যাগেজ কাউন্টারের কাছে একটি আলো টিমটিম করে জ্বলছে। আর কোনো আলো নেই। বাইরে গভীর অন্ধকার। একটানা ঝি ঝি পোকার ডাক যেন নৈঃশব্দকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে। মাঝে মাঝে একটা রাতজাগা পাখির বিকট একঘেয়ে আর্তনাদ সমস্ত অস্তিত্বকে ধাক্কা দিচ্ছে। পিছনে দূরে একটি টিমটিমে আলো আর সামনে এই গভীর অন্ধকার।

এই দেশ বহুকাল গভীর অন্ধকারেই ছিল। আফ্রিকার উত্তরভাগ অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বহুকাল ধরে ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। কদাচিৎ পদক্ষেপও হয়েছে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল জুড়ে দুর্গম সাহারা মরুভূমি ভেদ করে আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। পূর্বাঞ্চলে মিশরের প্রাণবাহী নীল নদী বয়ে সুদানের নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত অতীতে গ্রীক ও রোমানরা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। নীল উপত্যকা অঞ্চলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার নিদর্শন এখনো

বর্তমান। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকরা তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল লোহিত সাগর বরাবর পূর্বপ্রান্তে। এদিকে আরবরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, সভ্যতায় ও সামরিক শক্তিতে এত তেজস্বী হয়ে উঠল যে, সপ্তম শতাব্দীতে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল থেকে গ্রীক ও রোমান প্রভাব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সে আধিপত্য বেশিদিন রক্ষা করতে পারেনি। পর্তুগীজরা ক্রমশ বিভিন্ন স্থানে দুর্গ রচনা করে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ করে আরবদের আধিপত্য থেকে বিচ্যুত করতে থাকে। পর্তুগীজদের পক্ষেও মরুভূমি ভেদ করে আফ্রিকার মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি।

ওদিকে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। ইউরোপীয়রা স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে করায়ত্ত করে নিচ্ছে বিস্তৃত অঞ্চল। যে যত জমি চাও নাও, চাষবাস কর। কিন্তু চাষবাসের জন্য চাই প্রচুর জনমজুর। পর্তুগীজরা তখন এই চাহিদা মেটাবার প্রেরণায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নোঙর ফেলতে শুরু করল। জাহাজ ভেড়াবার মতো বন্দর পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে কূল দেখা যায়, সেখানেই জাহাজ মাটিতে আটকে যায়। অন্যত্র জঙ্গল। কিন্তু পর্তুগীজরা নাছোড়বান্দা। বহুদিনের চেষ্টায় কেপভার্দা নামক স্থানে বন্দর প্রতিষ্ঠা করে প্রথম তাদের প্রতিপত্তি স্থাপন করল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। পরে ১৪৬২ সালে ভালোভাবে ঘাঁটি স্থাপন করল এলমিনাতে। এখানে জাহাজ ভেড়াবার সুযোগ করে নিয়ে, সোনা, আইভরি, মশলা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করল। তার থেকেও বড় সুযোগ হল রাতের অন্ধকারে নিরীহ আফ্রিকাবাসীদের বলপূর্বক জাহাজে তুলে, আমেরিকায় নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করা। বিনা পয়সার পণ্য। লাভের গোনাগুনতি নেই। ক্রমশই প্রলোভন বেড়ে যেতে লাগল। তীরে নেমে ছোটখাট সংঘর্ষ শুরু করল। গোলাগুলির সামনে নিরীহ অপ্রস্তুত আফ্রিকাবাসীরা অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করতে লাগল। যুদ্ধে পরাস্ত বন্দীদের তখন শৃঙ্খলিত অবস্থায়, অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত করে নৃশংসভাবে আমেরিকার উপকূলে নিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করতে লাগল। ক্রমশ উপকূলবর্তী দলপতিদের সহায়তায় হাজারে হাজারে মানুষ ক্রয় করে জাহাজে তুলতে লাগল।

পর্তুগীজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংরাজ ও ওলন্দাজরাও এই লাভজনক ব্যবসায় অগ্রসর হল। ব্যবসায়ে ভাগীদার জোটার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখা যেতে লাগল। জাহাজভর্তি ক্রীতদাস আমেরিকার উপকূলে নিয়ে এসে প্রচার করা হতো — অতজন তাগড়াই নিগ্রো সম্পূর্ণ নীরোগ ও কর্মক্ষম—বিক্রয়ার্থে হাজির করা গেল। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতারা ছুটে আসে। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে, দরদাম হয়, শেষে আশাতীত লাভে পণ্য বিক্রয় হয়। বিক্রেতারা ক্রমশ পণ্যের সংখ্যার চেয়ে গুণের দিকে নজর দিতে শুরু করল। উপকূলবর্তী দালালরা তখন সে চাহিদা মেটাবার জন্য অভ্যন্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেত, আর বেছে বেছে স্বাস্থ্যবান স্ত্রী-পুরুষদের বন্দী করে এনে বন্দরের গুদামে মজুত রাখত। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই পণ্য তুলে দেওয়া হতো। ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তরের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল।

১৫৭৫ থেকে ১৫৯১ সালের মধ্যে পর্তুগীজরা এক লক্ষের বেশি আফ্রিকাবাসী এই অঞ্চল থেকে চালান করেছে। পরে যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজরাও এই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করল, তখন বছরে ষাট থেকে সত্তর হাজার আফ্রিকাবাসী আমেরিকায় রপ্তানি হয়। ক্রমাগত কয়েক শতাব্দী ধরে দেশের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের এভাবে বলপূর্বক উৎখাত করবার জন্য, এই সমস্ত অঞ্চল নিতান্ত অসহায় ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। জলাভাব, দুরারোগ্য ব্যাধি, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও বিষাক্ত পোকামাকড় দেশকে একেবারে ছারখার করে দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেনে শিল্পবিপ্লব শুরু হতেই এই দাসব্যবসার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকে। শিল্পের প্রসারের জন্য চাই কাঁচামাল। আর কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য চাই সুশৃঙ্খল উপনিবেশ। যোগানদারী উপনিবেশ স্থাপন করতে হলে দেশের শ্রমশক্তিকে উৎপাটন করলে চলবে না। বরং সামাজিক সুব্যবস্থার মাধ্যমে এই শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো প্রয়োজন। বিবিধ শস্য ফলানো চাই। খনিজ দ্রব্য আহরণ করা চাই।

লণ্ডনে আফ্রিকান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের অভিযান শুরু হল। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিও ইংল্যাণ্ডের এই যুক্তির মূল্য বিবেচনা করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ইংরাজ, ফরাসী, স্প্যানিস, জার্মান সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কে আগেভাগে গিয়ে আফ্রিকার কোন অঞ্চল অধিকার করে বসতে পারে। এই সময় ক্ল্যাপার্টন নামক একজন দুর্ধর্ষ ইংরাজ, ত্রিপলি থেকে অভিযান চালিয়ে মরুপথে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে লেক ছাদ পৌঁছান। ছাদে এই প্রথম ইউরোপীয় পদক্ষেপ।

জ্যামো এয়ারপোর্ট অঞ্চলের অন্ধকার ভেঙে জ্বলজ্বলে হেডলাইটের আলো চোখে পড়তে চমক ভাঙল। অদূরে একটা সাদা গাড়ি পার্ক করেছে। গাড়িটার ভিতরে একজন লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। লাইটারের আলোতে মনে হল যেন মিস্টার হ্যাগীকে দেখলাম। মরিয়া হয়ে চিৎকার করতে শুরু করলাম — 'মিঃ হ্যাগী, মিঃ হ্যাগী' বলে। গাড়ি থেকে একজন নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'Are you looking for আদমাজী ?' মুহূর্তে বুঝতে পারলাম উচ্চারণ বিভ্রাটের জন্য নিজেই বিপদ ডেকে এনেছি। নতুবা অনেক আগে হয়ত সুরাহা হতে পারত। Adam Hagi-কে সারাজীবন মিঃ হ্যাগী বলে চিৎকার করলেও খুঁজে বার করা যেত না। আদমাজী গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ওঁর লোকজনরা আমার মালপত্র টানাটানি করে গাড়িতে তুলতে লাগলেন। আদমাজী আমাকে ফরাসী ভাষায় অনেক কিছু বলে যেতে লাগলেন। আমিও তাঁকে ইংরাজীতে অনেক কিছু বলতে লাগলাম। কেউ কারুর কথা বুঝলাম না। তবে মোটামুটি একটা আণ্ডারস্টাডিং হল যে, এখন আর সময় নষ্ট না করে সোজা হোটেলে পৌঁছানো দরকার। ল্যঁচাদিয়ে হোটেলে একটা খবর পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং সেখানে যাবার ব্যবস্থা হল। ওখানে গিয়ে দেখা গেল, তারা আমার কোনো খবর পায়নি এবং কোনো রুম খালি নেই। সুতরাং পত্রপাঠ বিদায়। অন্য হোটেলে চেষ্টা করতে হবে।

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলেও শরীরে ক্লান্তি আর নেই। মনে অসম্ভব বল পাচ্ছি। আদমাজীকে এবার গাজী গাজী করে ধরেছি। যা হয় ব্যবস্থা কর, তোমাকে আর ছাড়ছি না। কোনো কথা না বলে, সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। অন্য হোটেলের সন্ধানে গাড়ি চলল। আকারে ইঙ্গিতে নানা রকম কথা চলল। আমি মনে মনে নাকিসুরে একটু ছড়া গাঁথতে লাগলাম, কিন্তু শেষে দুটো লাইন কিছুতেই মেলাতে পারছি না। শেষের লাইন দুটো নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলাম। ছড়াটি এই

আদম আজী আদম আজী
ভালোয় ভালোয় হও গো রাজি
কোনো হোটেলে জায়গা করে দাও তো আজি।
নইলে আমি বঙ্গপাজি
গাজি গাজি করে তোমার বাড়িতে গিয়ে
আস্তানা গাড়ব কিন্তু—বলে দিচ্ছি হ্যাঁ—।

বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে ছন্দ মেলাতে চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে গাড়িটা একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। আমার এখন আর টেনশন নেই। আস্তে আস্তে নেমে দেখছি ওঁরা রিসেপশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি একখানা সিগারেট ধরিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রের শোভা দেখছি। বেশ কিছুটা সময় চলে গেল। দুপক্ষের কথাবার্তা বেশ জোর চলছে শুনতে পাচ্ছি। রুম থাকলে এত কথাবার্তার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং অনুমান করে নিলাম যে ঘটনা তেমন আশাপ্রদ নয়। একটু এগিয়ে গেলাম। এবার দেখছি আদমাজী নিজেই সাঙ্গপাঙ্গদের সরিয়ে দিয়ে রিসেপশনিষ্টের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে মুখখানা হাসিহাসি করে বাঁ পকেট থেকে একতাড়া নোট তুলে বুক পকেটে রাখলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না। ঐ একটি মুভমেন্টেই সব কথার অবসান। ওঁর যা বলবার বলা হয়ে গেছে। রিসেপশনিষ্টের যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়ল। নাম ধাম পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি লিখিয়ে রুমে চলে গেলাম। আমি বাক্স ইত্যাদি গোছাতে গোছাতেই আদমাজী এসে হাজির। ফরাসীতে অনেক কথা বললেন—তবে বুঝলাম—'মনি' 'মনি'। 'মনি' দিয়ে দুনিয়ার

অনেক কাজ হাসিল করা যায়। আমি একটু বিজ্ঞের মত হাসলাম। আজী বললেন, 'এখন রেষ্ট নাও, কাল সকাল ন'টায় আসব।' এতক্ষণে একটা আস্তানা পেয়ে আমার বেশ মেজাজ এসে গেছে। আমি বললাম, 'আমাকে যেন এগারটার আগে বিরক্ত করা না হয়। রাত তখন আর বেশি নেই। সেই যে বিছানায় পড়লাম, আর পরদিন দশটা।

ফরাসীদের শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের থেকে অন্যরকম। এঁরা স্থানীয় শাসনযন্ত্রের উপর বিশেষ জোর না দিয়ে, ঔপনিবেশিক অঞ্চলকে মূল ফরাসীদেশেরই অংশ করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। পারী শহর উপনিবেশেরও প্রাণ হবে। ১৯৪৬ সালে ফ্রেঞ্চ ইকুয়েটোরিয়াল টেরিটোরীকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—গাবন, কঙ্গো, Central African Agency ও ছাদ। এরা সকলেই ফরাসীর অন্তর্গত এক একটি আলাদা রাজ্য। French National Assembly-তে ৬২৭ জন সভ্যের মধ্যে ৩২ জন এই অঞ্চলের প্রতিনিধি। ফরাসী শাসন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল উপনিবেশকে ফরাসীদেশের অন্তর্গত করে নেওয়া। পরে ১৯৬০ সালে, এসব রাজ্য স্বাধীন হয়েও ফরাসীদেশ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছিল না। ফরাসী প্রভাবের বাইরে যেতে না পেরে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। কিন্তু ইংরাজদের শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসনযন্ত্র এমন শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল যে, উপনিবেশ স্বাধীন হবার পর সে সব রাজ্যকে বৃটেনের প্রভাবে রাখবার জন্য কেবল মাত্র Commonwealth নামক প্রতিষ্ঠানের ক্ষীণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠে চায়ের সঙ্গে যথারীতি খবরের কাগজ চাইলাম। পেলাম একখানা বাসী 'La Monde'। কেননা, ছাদে কোনো সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয় না। সকালের সংবাদপত্রখানার জন্য ছাদের অধিবাসীরা পারীর প্লেন অবতরণের অপেক্ষায় থাকেন। দুপুরে আদমাজী খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল। আরও খবর পেলাম যে, ভোজসভায় দুচারজন মন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন। অত ধনী, তার উপর আবার মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকবেন শুনে মনে (মানে জিভে) খুব উৎসাহ বোধ করছিলাম। ফরাসী কায়দা-কানুনে অভ্যস্ত যখন, নিশ্চয় সেরা সেরা Wine, Champagne ইত্যাদি থাকবে। তাড়াহুড়া করে নিজের কাজকর্ম সেরে হোটেলে এসে, ভালো স্যুট ইত্যাদি পরে তৈরি হয়ে আছি। বেলা দেড়টা নাগাদ আজী নিজেই বিরাট একখানা গাড়ি নিয়ে এলেন। বড় বাঁধানো রাস্তা দিয়ে মিনিট পাঁচেক গিয়েই কাঁচা রাস্তা ধরল। মাটির রাস্তা, এবড়োখেবড়ো, ক্রমে সরু থেকে সরুতর হয়ে এসেছে। দুধারে সারি সারি মাটির ঘর। একটু দূরে দূরে নানা আকারের হাঁড়ি কলসী নিয়ে রাস্তার জলের কলকে কেন্দ্র করে বহু লোকের ভীড়। খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল রাস্তা ভেঙে একাকার হয়ে আছে। গাড়ি আর এগোয় না। আজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এবার ব্যাক করে অন্য রাস্তা ধরা হল। সেও তথৈবচঃ। যাহোক, কোনো রকমে বাড়ি পৌছানো গেল।

একতলা বাড়ি। উঠোন পেরিয়ে একটা বেশ বড় ঘরে নিয়ে গেল। ঘর জুড়ে একখানা কার্পেট পাতা। এককোণে একটা টেবিলের উপর একটি টেলিফোন। আর এককোণে খানকয়েক সোফা চেয়ার ইত্যাদি ভিড় করে রাখা। সারা ঘরে আর কিছু নেই। একটা এয়ার কণ্ডিশনার বসানো আছে, তবে সেটা চলে না। আমি কোণে একটা চেয়ার দখল করে বসলাম। অতিথিরাও একে একে আসতে শুরু করলেন। সকলেই আলখাল্লার মতো স্থানীয় পোশাক পরিহিত। ফরাসীতে কথা বলেন। কিছুক্ষণ পরে জনাচারেক লোক, একটা বিরাট চাদর ও কিছু প্লেট গ্লাস চামচ ইত্যাদি এনে ঘরের মাঝখানে কার্পেটের উপর রাখল। তারপর একটা প্রকাণ্ড থালায় বিভিন্ন খাবার সাজিয়ে দু'তিনজনে ধরে ধরে নিয়ে এসে মাঝখানে রেখে গেল। সকলে সেই থালার চারপাশে বসে পড়লেন এবং যে যার মতো নিজের প্লেটে বড় থালার থেকে হাত দিয়ে খাবার তুলে নিতে লাগলেন। খেতে খেতে আবার সেই হাতে বড় থালার থেকে খাবার তুলতে লাগলেন। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। প্রথমতঃ আমার স্যুট ইত্যাদি পরে ঐভাবে বসে খাওয়া বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তারপর এভাবে তুলে তুলে নিতেও একটু অসুবিধা হচ্ছে। আমি যে খুব এঁটো মানি তা নয়। তবে খাওয়া হাত দিয়েই আবার খাবার তুলে নেওয়া ব্যাপারটা খুব ভালো লাগছিল না। আমি একটু কম খাচ্ছি দেখে আমার পাশের ভদ্রলোক একটা রোষ্ট মুরগী তুলে দুহাত দিয়ে ছিঁড়ে আধখানা আমার প্লেটে দিলেন। এই কাণ্ডটা কিন্তু খাওয়া-হাতেই করলেন। খেলাম। ইতিমধ্যে কয়েকটা রাবার ফোমের তাকিয়া এল। খাবার পর সকলেই আরাম করে বসলেন, কেউ বা শুয়েই পড়লেন। মহিলারা কেউ সদরে আসেন না। পর্দানশীন। মিষ্টি এল। একজন মিষ্টি খাবার আগেই হাত ধুয়ে এসে নামাজ পড়ে নিলেন। French Wine-এর নাম গন্ধও নেই। বহির্জীবনে ফরাসী প্রভাব থাকলেও, সামাজিক জীবনে পরিপূর্ণ মুসলিম প্রথায় চলেন দেখে বেশ ভালো লাগল। তবে ধনীদেরও জীবন যাত্রার style পরিশীলিত নয় দেখে দুঃখ পেলাম।

কাজের ব্যাপারে ঘুরতে ঘুরতে একজন ডাচ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি পরদিন সকালে তাঁর অফিসে যাবার জন্য খুব অনুরোধ করলেন। অফিসটা বেশি দূর নয়, আমার হোটেল থেকে চার পাঁচ কিলোমিটার হবে। কথায় কথায় একটা বেজে গেল। দুপুরে একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। উঠে পড়তে হল।

সেখানে গিয়ে দেখি কয়েকজন মন্ত্রী আছেন আর কিছু সরকারি কর্মচারীও আছেন। একজনের সঙ্গে পরিচয় হল—তিনি Minister of Justice। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। দেখলে মনে হয় সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছে। অবিশ্যি মন্ত্রীদের কারুর বয়সই ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। কিন্তু ইনি তারমধ্যেও ব্যতিক্রম। আমাদের দেশে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে যত বয়স বাড়ে ততই মন্ত্রিত্ব পদের যোগ্যতা বাড়ে। মন্ত্রীদের এত কম বয়সের কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, ফরাসীরা যখন ১৯৬০ সালে শাসনভার এদেশের লোকেদের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—তখন বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তি খুবই কম পাওয়া যায়। শিক্ষার প্রসার তেমন হয়নি। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেওয়ার মত উপযুক্ত লোকের অভাবে তাঁরা মুস্কিলে পড়ে গেল। তখন শিক্ষিত যুব সমাজেরই নিতে হল এই গুরু দায়িত্ব। প্রাক্তন মন্ত্রীর ফরাসী স্ত্রী একবার এসে করমর্দন করে গেলেন বটে সকলের সঙ্গে, কিন্তু একসঙ্গে খেতে বসলেন না। খাবার সময় সামাজিক রীতি অনুযায়ী তিনি পর্দানশীন হয়ে গেলেন।

আমি ওদের কথায় তেমন যোগদান করতে পারছি না দেখে আমাকে অন্যভাবে entertain করার প্রচেষ্টায় রেডিওটা চালিয়ে দেওয়া হল। রেডিওতে তখন একটা দারুণ বাজে গান হচ্ছিল। আমি একটু উসখুস করছি দেখে একজন বললেন পারী ধর। ধরা গেল না। টি ভি এ রাজ্যে নেই। সুতরাং ঐ গানই শুনতে হল খানিকক্ষণ ধরে। ইতিমধ্যে খাবার এসে গেল। গানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল। তিনটে নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যের সময় ভাবছি একটা সিনেমায় গেলে হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে শহরে মাত্র দুটি সিনেমা হাউস। এবং সেখানে বহু পুরানো ফরাসী ছবি চলছে। আর উৎসাহ পেলাম না। থিয়েটার বা গান বাজনার আসর নেই। গায়ক অভিনেতা বা লেখক শ্রেণীর লোকেরা একটু উচ্চস্তরে উঠলেই পারী চলে যান। এঁদের সব কিছুতেই পারী। পারীই ওঁদের প্রাণ।

অগত্যা হোটেলের বাগানে একটা টেবিল নিয়ে বসলাম। আমি বসে আছি দেখে সামনের খালি চেয়ারে কেউ বসছে না। আমার নিতান্ত ইচ্ছা ওখানে ইংরাজী জানা কেউ বসুক। দুচারটে কথাবার্তা বলা যায়। একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক ঘুরঘুর করছেন। বসবার জায়গা পাচ্ছেন না। আমি ডেকে আমার টেবিলে বসালাম। জিজ্ঞাসা করলাম ইংরাজী জানেন কিনা। বললেন, 'জানি তবে অভ্যাস নেই'। ভাবলাম ওতেই হবে। ওঁর সঙ্গে একটু গায়ে পড়ে খাতির করবার জন্য ওঁকে একটা ড্রিঙ্ক অফার করলাম। না না করল বটে, তবে আমি বয়সের অজুহাতে মানিয়ে নিলাম। ভাবলাম—সন্ধ্যেবেলাটা ওর সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। নাম জিজ্ঞাসা করলাম—বলে মহম্মদ সৈয়দ। দেশ—ভারতবর্ষ। আমি তো উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। তবে চাঁদ! ইংরাজী বলবার অভ্যাস না থাকে তো হিন্দি বল।

মহম্মদ বলল হিন্দি একেবারেই বলতে পারে না, তবে অল্পবিস্তর ইংরাজী যা বলতে পারে তাতেই বেশ কথাবার্তা চলতে লাগল। মহম্মদের মা তামিল বাবা ফরাসী। ওর মা বাবার পণ্ডিচেরীতে বিয়ে হয়। পণ্ডিচেরীতেই মহম্মদের বাল্যকাল কেটেছে। পনেরো বছর অবধি মহম্মদ পণ্ডিচেরীতেই পড়াশুনা করেছে ফরাসী স্কুলে। মা বাবার মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় মহম্মদের বাবা ফরাসীদেশে চলে যান। মা পণ্ডিচেরীতেই থাকেন। মহম্মদ স্কুল পাশ করে পারী চলে যায়। সেখানে গিয়ে আরও কিসব পড়াশুনা করে। সেই থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত ফরাসী দেশেই আছে। ফরাসী ন্যাশনাল হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় হাবভাব চাল-চলনে একেবারে ফরাসী হয়ে গেছে। ওখানকার মিলিটারিতে কাজ করে সেই কাজেই এখানে এসেছে।

আমি ভারতীয় জানতে পেরে ওর মনের মধ্যে বেশ একটা আলোড়ন চলছে বুঝতে পারছি। বারবার বলছে কতদিন মাকে দেখিনি—খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। তিন মাসের ছুটির দরখাস্ত করেছি যদি পাই তবে সোজা ইণ্ডিয়া চলে যাব। দেখছি মার কথা বলতে বলতে মহম্মদের চোখ দুটো ভিজে আসছে। বীয়ারের গ্লাসটা তুলে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সামলে নিল কোনোমতে। আমি একটু সান্ত্বনার সুরে বললাম—মহম্মদ তুমি মুষড়ে পড়ছ কেন। ছুটি যখন তোমার পাওনা আছে তুমি নিশ্চয় পাবে। ইণ্ডিয়া ঘুরে মার সঙ্গে দেখা করে এসো। মহম্মদ বলল—ছুটি তো অনেক পাওনা আছে, তাতে কী হবে, ওঁরা এখন এখান থেকে ছাড়বে না। প্রচুর ফরাসী সৈন্য তলব করে এখানে আনা হয়েছে। আমরা সব এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছি। আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে আগুন জ্বলছে—এ আগুন সহজে নিভবে না। কাজেই ছাড়া পাবার আশাও খুব শীঘ্র নেই। কয়েকদিন আগে খবর পেয়েছি যে মা'র শরীর খুব খারাপ।

কাল খুব ভোরেই দু'শ কিলোমিটার দূরে ওঁর ক্যাম্পে চলে যেতে হবে বলে আজ আর বেশি রাত করবে না। খানিকক্ষণ বীয়ারের গ্লাস হাতে নিয়ে দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম। বুঝতে পারছি ওঁর মনের ভিতর নানা রকম তোলপাড় হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমিও তেমন কথা পাচ্ছি না। হঠাৎ গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক করে রেখে বলল—আপনি কখনো সম্বর খেয়েছেন? কেন খাব না। সম্বর আমার খুব প্রিয়। যতবার দক্ষিণ ভারতে গেছি খুব মজা করে সম্বর খেয়েছি। মহম্মদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল—'আমার মা যা সম্বর রাঁধেন—অপূর্ব। সেই কবে খেয়েছি—এখনো ভুলতে পারছি না।' বলতে বলতে গুড নাইট বলে উঠে দাঁড়াল। এমন সময় একজন আর্মি ড্রাইভার এসে ওকে কী বলে চলে গেল। ড্রাইভার চলে যেতে মহম্মদ আমাকে বলল—কাল সকালে নয় আজ ডিনারের পরই রওনা হতে হবে। জরুরী ডাক—চললাম।

মহম্মদ চলে গেল—পিছন থেকে দেখছিলাম একজন স্বাস্থ্যবান ফরাসী সৈন্য—কর্তব্যের আহ্বানে এগিয়ে যাচ্ছে। বসে বসে ভাবছিলাম—মা'র হাতের রান্না সম্বর কী আর মহম্মদের কপালে কোনোদিন জুটবে? □

এগার দিনে পাঁচটি দেশ / নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিকতম ইউরোপ সফরের — ৮ জুন থেকে ১৯ জুন, — দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM)সদ্য নির্বাচিত সভানেত্রী হিসাবে তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্পর্কে ইউরোপের কয়েকটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পরিচিত করা, মত বিনিময় ও ঐকমত্যের এলাকা প্রসারিত করা। দুই, ভারতের সংকট-জর্জর অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙ্গা করে তোলার জন্য আগামী মাস ও বছর-গুলিতে কিছু অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। অপ্রত্যাশিত ভাবে ইউরোপ সফরে তাঁর কিছু 'খুচরো' কাজ এসে পড়ে। সেটি হল ইউরোপের রাজনৈতিক মহলে, সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির মোকাবিলা করা।

শ্রীমতী গান্ধীর এই সফর যেমন রাজনৈতিক মহলে সাড়া জাগানোর মতো ছিল না, তেমনই আবার রাষ্ট্রনেতাদের রুটিনমাফিক শুভেচ্ছা সফরও এটি ছিল না। তাঁর সফরের গুরুত্বকে তাই হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ যেসব নীতির কথা সর্বোচ্চ কূটনৈতিক স্তর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি তেমন পাকাপোক্ত ছিল না।

ভারতের দূতাবাস ও কূটনীতিকরা দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে কতটা কালিমাখা হল, হয়েছে বা হতে পারে সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দেননি। সর্বত্র আসাম ও পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে যত প্রশ্ন করা হয়েছে, যত ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বৈদেশিক প্রচার দপ্তরের কর্মকর্তারা হয় কাজে গাফিলতি দেখিয়েছেন, নয়ত তাঁরা নিজেরাও দ্বিধাগ্রস্ত বলে দায়সারা গোছের কাজ করে গেছেন। যে আসাম ও পাঞ্জাবের সংকটের পিছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে বলে সরকার ও বিরোধী পক্ষের অনেকেই একমত, বিদেশী দূতাবাসগুলি ততটা সম্ভবত বিশ্বাস করেন না। এমনও হতে পারে মোরারজি দেশাই সি·আই·এ·'র পে-রোলে ছিলেন — মার্কিন সাংবাদিক হার্শের এই তথ্যের প্রতিবাদে আরেক জন যে এম·জে·দেশাইয়ের মার্কিন ডলার নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির খবর ফাঁস হয়েছে, তেমন সব কর্তাব্যক্তি বিদেশ দপ্তর ও দূতাবাসগুলিতে বিরল সংখ্যক হয়ে যাননি। যাই হোক শ্রীমতী গান্ধীকে অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যা দেশের প্রশাসনিক স্বাস্থ্যের পরিচয় দেয় না। তাঁর সফররত দেশগুলিতে অনুকূল প্রচারে জমি যে পাকা হয়নি, এবারের সফর তা প্রমাণ করেছে।

শ্রীমতী গান্ধীর সফরের এই দিকটা প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি বহির্ভূত বলে গৌণ ধরে নিয়ে মূল উদ্দেশ্যের একটা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এগারো দিনের এই সফরে তিনি ঘুরেছেন পাঁচটি দেশ, যথাক্রমে যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও অস্ট্রিয়া। আর সর্বত্র সম্বর্ধনা পেয়েছেন প্রচুর। তবে সেটা যতটা ব্যক্তিগত, ততটা দেশগত কারণে নয়।

ইউরোপ সফরে শ্রীমতী গান্ধীর দেওয়া তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। তার মধ্যেই সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সমকালীন চিন্তার একটা ছবি পাওয়া যায়।

(১) ৮ জুন বেলগ্রেডে প্রদত্ত 'শান্তি ও বিকাশ' শীর্ষক দ্বিতীয় রাউল প্রেবিশ্চ বক্তৃতায় জোটনিরপেক্ষ সপ্তম শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত অর্থনৈতিক প্রস্তাবের এক ব্যাখ্যা রয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে যে চিন্তাভাবনা এখন সবচেয়ে জরুরী, সভানেত্রী হিসাবে তিনি তারই পর্যালোচনা করেছেন। সেইজন্য বেলগ্রেডে যে ষষ্ঠ আঙ্কটাডের অধিবেশন চলছিল তাতে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এই বলে অস্বীকৃতি জানান যে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।

(২) ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহ্যাগেনে 'কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন'য়ে প্রদত্ত বক্তৃতাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাতে ভারতের মিশ্র অর্থনীতির গুণকীর্তন, পরিকল্পনার গতিমন্থরতার কারণ, বেসরকারি শিল্প-উদ্যোগকে সাহায্য

করার জন্য সরকারের তৎপরতা, বিদেশী পুঁজি লগ্নীর জন্য উদাত্ত আহ্বান ইত্যাদি বেশ গুছিয়ে বলা হয়েছে।

ভারতে সমাজতন্ত্র যে দারিদ্র্য দূরীকরণে কয়েক শতাব্দী পার করে দেবে, বক্তৃতা থেকে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ যে বেসরকারি মালিকদের নির্বুদ্ধিতার জন্য করতে হচ্ছে তার ইঙ্গিতও বক্তৃতায় স্পষ্ট। ফিক্কি এবং নানা চেম্বার অব কমার্সের কর্মকর্তাদের বুকে বলবৃদ্ধি করার মতো প্রচুর মালমশলা এতে আছে। কিন্তু দেশে সেকথা না বলে বিদেশে কথাগুলি বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

শ্রীমতী গান্ধী আই·এম·এফ·এর টাকা নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের বদলে আরো গভীর সংকটে দেশকে টেনে এনেছেন। অচিরে ঋণশোধ নয়, সুদের বোঝা, ডেট সার্ভিসিংয়ের দায় নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। তিনি তাই চেয়েছেন এই সব দেশগুলি যদি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিষদ, এড ইন্ডিয়া কনসর্টিয়ামের সভায় ভারতের অনুকূলে মতামত গঠন করতে কিংবা দ্বিপাক্ষিক কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৩) ১৮ জুন অষ্ট্রিয়ার আল্পবাকে "পশ্চিম ইউরোপ ও ভারত" শীর্ষক 'ডায়ালগ কংগ্রেসে' প্রদত্ত বক্তৃতায় ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ স্থাপনে দেশী ও বিদেশী মনীষীদের ভূমিকা এবং নেহরু পরিবারের বিশেষ অবদানের কথা বলা হয়েছে। শেষোক্ত বিষয়ের সম্ভাব্য অর্থ যা হতে পারে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটার কোনো কারণ নেই।

শ্রীমতী গান্ধী যুগোস্লাভিয়া বাদে পশ্চিম ইউরোপের যে চারটি দেশ সফর করেছেন সমকালীন ইউরোপীয় রাজনীতিতে তারা কেবল ভৌগলিক দিক থেকে নয়, গুরুত্বের বিচারেও পেরিফেরাল কান্ট্রি, প্রত্যন্ত সীমার দেশ। সেখানে সরকারের অর্থনৈতিক চিন্তার রূপরেখাটি তুলে ধরার একটা উদ্দেশ্য — উইলিয়ামসবার্গে সমবেত সাতটি ধনী দেশের আলোচনায় নিজের পরোক্ষ উপস্থিতি প্রমাণ করা। ঐ সময়ে ফরাসী রাষ্ট্রপতি মিত্তেরাঁর সঙ্গে পত্রবিনিময় তার প্রমাণ। আরেকটি উদ্দেশ্য, ইউরোপের মাঝারি ধনী দেশগুলিকে ভারতের অর্থনৈতিক সংকট মোচনে টেনে আনা, যাতে তারা একক বা যৌথভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

আর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নতুন সভানেত্রী যে এবারের জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে এক শীর্ষ সম্মেলন ঘটাতে চান, তিনি যে সত্যই নতুন কিছু করতে চান, সেটাও বোধহয় আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। □

বাণিজ্য — বিশেষ প্রতিনিধি

ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের সমস্যা নিয়ে এক সমীক্ষার সময় বিশেষজ্ঞরা নানা অসঙ্গতি দেখে তা দূর করতে কার্যকরী কিছু সুপারিশ করেছেন সম্প্রতি।

ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি কী? সমীক্ষকদের মতে, যাদের চা-বাগান সর্বোচ্চ ১০০ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারাই ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী। এই হিসেবে দার্জিলিং, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে এ ধরনের চা উৎপাদনকারীর সংখ্যা যথাক্রমে চব্বিশ, চার ও সাত।

টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান জয়ন্ত সান্যাল পরিচালিত এই সমীক্ষা চলাকালীন, বাস্তবতার চাপে সর্বোচ্চ ২০০ হেক্টরের চা-বাগানকেও ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের কোঠায় ধরতে হয়েছে। অবশ্য চা উৎপাদনের একটা মাপকাঠি নির্ধারিত ছিল — সমতলে হেক্টর প্রতি ৩·৫ লক্ষ কেজি ও পাহাড়ে হেক্টর প্রতি ১·৫ লক্ষ কেজি।

সমীক্ষকদের মতে, জাতীয় মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি যদিও বাঞ্ছিত নয়, তবুও ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী হিসেবে নির্ধারিত নির্দিষ্ট আয়তনের একটু বড় বাগানকেও ক্ষুদ্রায়তন বাগানের সুযোগ সুবিধে দেওয়া যেতে পারে।

এসব বাগানের অধিকাংশই পুরোনো। উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান পরিমাণ ও প্রাচীন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থনীতিক দিক থেকে অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। প্রতিটি বাগানেই স্থায়ী শ্রমিকদল থাকে, কিন্তু সেই আবাসিক শ্রমিক বাহিনীকে কাজে লাগাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের আপাতত কোনো পথ নেই। তাই এই বাগানগুলোকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার দক্ষ পরিচালনা।

ছোট চা-বাগানগুলোর পক্ষে নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থা করা আর্থনীতিক সঙ্গতির বাইরে। তাই তাদের প্রধানত কাঁচাপাতা বিক্রির ওপরই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কাঁচাপাতার মূল্য নির্ধারণের বর্তমান পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রমিকের পাতা তোলবার দক্ষতা ও গুণাগুণ ধরা হয় না এবং আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, অযত্ন উৎপাদন ও অদক্ষ বিক্রির পরিণাম হিসেবে ক্ষতি কিন্তু বহন করতে হয় কাঁচাপাতার মূল সরবরাহকারীকে।

সমীক্ষকরা তাই বলছেন যে, কাঁচাপাতা উৎপাদকের পক্ষে অনুকূল ও লাভজনক মূল্য নির্ধারণের জন্য টি-বোর্ডের অধীনে একটি স্থায়ী কমিটি থাকা একান্ত দরকার।

ছোট উৎপাদনকারীরা যেসব এলাকায় বেশি, সেসব এলাকার উন্নতির জন্য টি-বোর্ড ও চা সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাহায্য ছাড়াও উপযুক্ত সার, চারা ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির সুলভ যোগান আবশ্যিক। সমীক্ষকদের মতে, বেশ কিছু জমি—যেখানে আনারসের চাষ হোত—চা উৎপাদনের কাজে ইদানীং ব্যবহৃত হবার ঝোঁক উৎসাহব্যঞ্জক।

ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষকরা তিন রকম সুপারিশ করেছেন—বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ইন্দোনেশিয় সরকারের ধাঁচে একটি মূল প্রতিষ্ঠান গড়া, একটি সমবায় চা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও কাঁচাপাতার বিক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ সাহায্য নেওয়া। বিশেষজ্ঞরা তাঁদের রিপোর্টে বিশেষভাবে সমবায় চা উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন — সরকারি বা আধা সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায়, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে কোনো একটি বা ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কয়েকজনের পক্ষেও নিজস্ব আধুনিক প্রযুক্তির উৎপাদন কেন্দ্র করা সম্ভব নয়।

দশ বছরের এক দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে দার্জিলিং চা-বাগানগুলোর ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগে খরচা হবে ৪৩ কোটি টাকা। নাবার্ড বা সাহায্যকারী ব্যাঙ্ক কর্তৃক দেয় ঋণের পাঁচ শতাংশের ওপর সুদের ক্ষেত্রে অনুদান এই কর্মসূচীর প্রধান অংশ। সমীক্ষকদের মতে, দার্জিলিং-এর ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদেরও এই কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে।

সমস্ত চা উৎপাদনকারী অঞ্চলই খুঁটিয়ে দেখে এই দল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একটি সংহত জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এখন প্রয়োজন, বিশেষ বিশেষ এলাকার চাহিদা অনুযায়ী রাজ্যভিত্তিক পরিকল্পনার

সলিল চৌধুরী

জীবন উজ্জীবন

চা-বাগানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে মিকির পাহাড়ে মধ্যরাতে একটা পাখি ডাকতো ঠিক মেয়ে মানুষের কান্নার মতো। সেই কান্না সারা পাহাড় বেড়িয়ে যেত মাইলের পর মাইল। যেদিনই ঐ পাখি ডাকতো হাসপাতালে কেউ না কেউ রোগী মরতো। এর কখনো কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। বাবাও আমার মনে হতো ঐ পাখিটাকে ভয় পেতেন। ঐ পাখির ডাক শুনলে হাসপাতালের রোগীরা সব ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত—বলাবলি করতো আজ কাকে নেবে কে জানে। এবং সত্যিই একজন না একজন মারা যেত। এই অলৌকিক ব্যাপারটা বাবাকে এত বিব্রত করতো যে উনি রীতিমতো নিজের ওপরই রেগে যেতেন যেন ওর অক্ষমতার জন্যই রুগীটা মারা গেল। বাবা যেন নিজেকেই নিজে বোঝাবার জন্য বলতেন—হাসপাতালে এমারজেন্সী ওয়ার্ডে প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো রুগী থাকেই। এদের কুসংস্কার এত গভীর এবং এত ভয় পায় যে ডাক শুনে সিরিয়াস দুর্বল রোগী হার্টফেল করে মারা যায়। জগার কাছে শুনেছি সে এবং কেউ কেউ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে নাকি ঐ পাখিটাকে দেখেছে। বিরাট কালো রঙের পাখি সাদা সাদা গোল গোল চোখ আর মাথায় একরাশ মেয়েদের মতো খোলা চুল। বাবা হেসে বলতেন ন্যাচারাল সায়েন্সে এ জাতীয় কোনো পাখির অস্তিত্বই নেই, ওটা গুল। মা বলতেন একবার নাকি হাসপাতালে সিরিয়াস কোনো রুগী ছিল না। ঐ পাখিটা ডাকল আর ডিসেন্ট্রি ওয়ার্ডে একটা রুগী গলায় দড়ি দিয়ে মরল। বাবা উড়িয়ে দিতেন ও বেটা মেনটালি ডিরেস্‌জড আধপাগল ছিল।

পাখিটা না ডাকলেও ও আত্মহত্যা করত। একবার এমন ঘটনা ঘটল যে বাবা অবধি তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে চুপ করে গেলেন। সালটা হবে ১৯৩৭-৩৮, ঠিক মনে নেই। আমার দাদু মানে মার বাবা বেনারসে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন ডবল নিউমোনিয়ায়। টেলিগ্রাম করা হল কেমন আছে জানান। সপ্তাহ খানেক পরে খবর এল দাদু অনেক ভালো আছেন, পরের সপ্তায় দেশে ফিরবেন। মা যেন চিন্তা না করেন। ঘটনাটা ঘটল সেই দিন সন্ধ্যায়। হলঘরে আমরা সবাই গল্প করছি। মা একা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। আমাদের রান্নাঘরটা ছিল হলঘরের দরজার বাইরে একটা চওড়া দাবা পেরিয়ে উঠোনের বাঁপাশে। হঠাৎ মার প্রচণ্ড আর্তনাদ—বাবা—চমকে উঠে এক দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন—হাতে খুন্তি তখনও শক্ত করে ধরা। ধরাধরি করে মাকে এনে বিছানায় শুইয়ে জলের ঝাপটা, স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি দিয়ে জ্ঞান ফেরাতেই মার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—বাবা গো—তুমি কেন অমন করলে? বাবার অনেক সান্ত্বনা এবং অভয়ের পর মা যা বললেন তা হল এই। রান্না করতে করতে হঠাৎ পিছনে যেন শুনতে পেলেন দাদুর গলা—'ভুমা!' আমার মায়ের নাম ছিল বিভাবতী আর ডাক নাম ভুমা। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখেন দরজায় দাদু দাঁড়িয়ে। মা ভাবলেন হয়ত হঠাৎ অবাক করে দেবেন বলে না বলে কয়ে দাদু আসামে চলে এসেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে মা সবে বলতে গেলেন—'তুমি হঠাৎ!' চেহারাটা মিলিয়ে গেল। চিৎকার করে মা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাবা অনেক বোঝালেন, দুশ্চিন্তা থেকে মানুষ ওরকম হ্যালুসিনেসন্ দেখে, ওটা কিছু নয়। পরের দিনও সারা দিনরাত মার কেঁদে কেঁদেই গেল 'আমি কেন বাবাকে দেখলুম!' তার পরের দিন এল টেলিগ্রাম। শনিবার রাত্রি নটা পনের মিনিটে দাদু মারা গেছেন। আর শনিবার রাত্রেই নটা পনের মিনিটে মা দাদুকে দেখেছিলেন। এর কি ব্যাখ্যা? সিক্সথ্ সেন্স—টেলিপ্যাথি ইত্যাদি আমি আর দাদা ব্যাখ্যা করতে গেলাম। বাবা গুম মেরে গেলেন। পরে একসময় বলেছিলেন—দেখ! একটা কোকিলেই বসন্ত হয় না। লক্ষকোটি ঘটনার মধ্যে একটা বুদ্ধির অতীত অলৌকিক কিছু যদি ঘটেই থাকে তারও নিশ্চয় কোনো কারণ আছে যেটা আমরা জানি না—যেমন আমরা এখনও ক্যানসারের কারণ জানি না। তাই নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বাবা শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখতে পারেননি। ভাগ্য নিয়তি 'অদৃষ্ট'কে বাদ দিয়ে বহু কিছু অঘটন বা অপ্রত্যাশিতকে ব্যাখ্যা করার রাস্তা খুঁজে পেতেন না। বিশেষ করে আমার দাদা ও আমাকে বাবা যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন আমরা তার ধার কাছ দিয়ে না যাওয়ায় তাঁর প্রচণ্ড আশাভঙ্গ হয়েছিল। দাদাকে ডাক্তার করার জন্য বাবা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন। স্কুল জীবনে লেখাপড়ায় দাদা ছিলেন অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। তাছাড়া লেখায় অভিনয়ে সঙ্গীতে দাদার বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আমার চেয়েও দাদার ওপর মা বাবার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। সেই দাদা যখন শেষ পর্যন্ত কি জানি কি কারণে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে রেলে কেরানির চাকরি নিলেন বাবা এটা দাদার 'কপালের লিখন' ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইলেন না। আমার সম্বন্ধেও একই কথা। আমার ঠাকুরদাদা

রামতারণ চৌধুরী সেকালের খুব নামজাদা উকিল ছিলেন। বারুইপুর কোর্টে প্র্যাকটিশ করতেন। শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের কোর্টেও তিনি ওকালতি করেছিলেন। সে যাই হোক বাবার ইচ্ছে ছিল আমি ঠাকুরদাদার নাম রাখব অর্থাৎ বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার হব। সেই আমি যখন সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলুম, বাবা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। গানবাজনা ভালো কিন্তু তাকে যারা পেশা করে তারা আর যাই হোক সমাজে গণ্যমান্য বলতে যাদের বোঝায় তাদের থেকে অনেক নিচে তাদের স্থান। কথাটা যে মিথ্যে নয় জীবনে অনেকবার হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। বাবার যুগে তো ছিলই কিন্তু আজ আমাদের যুগেও অরিজিনাল কম্পোজার বা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি ইউরোপ বা আমেরিকায় এমনকি জাপানেও তাঁদের যে সম্মান সে তুলনায় এদেশে তাঁদের সম্মান কোথায়? তা যদি থাকত কাজী নজরুলকে তাঁর দীর্ঘ শেষ জীবন পাঁচশ টাকা সরকারি দাক্ষিণ্য নিয়ে মরতে হতো না। তিমিরবরণের মতো সুরস্রষ্টা যাঁকে ভারতীয় অর্কেস্ট্রেশনের জনক বলে আমরা জানি তাঁকে মাসিক দুশো টাকা সরকারি ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকতে হতো না। উনি যদি স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি না করে সরোদটা নিয়েই চর্চা চালিয়ে যেতেন দেশের লোক মাথায় তুলে নাচত এবং আমেরিকা ইউরোপের সমঝদার মহলের ধনভাণ্ডার খুলে যেত। ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটতে না ঘটতে পেঁচোয় পাওয়া বাচ্ছার মতো সামন্ততান্ত্রিক পিসির কোলে যে দেশ মানুষ হচ্ছে, সে দেশে এটাই স্বভাবিক। শিল্পে সাহিত্যে পোশাকে-আশাকে জীবনযাত্রার ধরনে সবেতেই আমরা মডার্ন—আধুনিক হতে পারি, কিন্তু সঙ্গীতে আধুনিক হতে গেলেই পিসিদের 'গেল' 'গেল' রব উঠবে। আলখাল্লা পরে নেচে বাউল গাও—দেখবে বছরে দুবার আমেরিকা যেতে পারবে—সেতার বাজাও সরোদ বাজাও সারেঙ্গী তবলা বাজাও—ইউরোপ আমেরিকা মাথায় তুলে নেবে। আর ওরা যাদের মাথায় তুলবে, তারা তো আমাদের কাছে ভগবান।

নিজস্ব সৃষ্টি কিছু করতে যেও না—তাহলে আমেরিকাও তোমাকে চাইবে না, আমরাও চাইব না। ওরা আমাদের সাপুড়ে মূর্তিটাই দেখতে ভালোবাসে—যোগী মূর্তি দেখতে ভালোবাসে—কাজেই হয় 'বাবা' হও নয়ত সাপুড়ে হও। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমাদের যে সমস্ত সঙ্গীত সাধক ভারতীয় সঙ্গীতকে বিদেশের মানুষের কাছে পরিচিত করেছেন, দেশে সম্মান এনে দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই আমার নমস্য ব্যক্তি, আমার গুরুস্থানীয়, ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার পাত্র। আমার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে নয়। আমার অভিযোগ ভারতীয় সঙ্গীতকে যাঁরা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় বেঁধে রাখতে চান, তাকে মিউজিয়ামের বাইরে যেতে দিতে যাঁদের আপত্তি, তাঁদের বিরুদ্ধে। তাতে অর্কেস্ট্রা করতে গেলে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাদ্যবৃন্দের মতো ভ্যাদভেদে রাগসঙ্গীত বাজাতে হবে। সম্প্রতি দিল্লীতে বাদ্যবৃন্দের একজন কম্পোজার কন্ডাকটর নির্বাচনের জন্য সিলেকশন কমিটিতে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী অনিল বিশ্বাসও ছিলেন কমিটিতে। ছ'সাত জন পদপ্রার্থী তাঁদের অর্কেস্ট্রা রেকর্ড করে এনে শোনালেন। তাঁরা সকলেই যন্ত্রী হিসেবে প্রথিতযশা—কিন্তু তাঁদের কল্পনার হাত-পা বাঁধা। লিখিতভাবে না বললেও অলিখিত নির্দেশ বোধহয় আছে রাগ ছাড়া অর্কেস্ট্রা হবে না। তাতে না হচ্ছে রাগ না হচ্ছে অর্কেস্ট্রা। রাগটা খালি বিচারকদেরই হল ফলে কাউকে নির্বাচন করা গেল না। এত বড় দেশ, যে দেশে হাজার হাজার সঙ্গীত শিক্ষায়তন ছড়িয়ে আছে, শয়ে শয়ে ইউনিভার্সিটিতে সঙ্গীতের ডিপ্লোমা দেয়া হয়—সে দেশে কোথাও কি আছে কি করে কম্পোজ করতে বা স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টি করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি?—নেই। যা চলছে, যা গতানুগতিক তাই শেখ, নতুন কিছু করতে যেও না। বহুবার বহুস্থানে এ আলোচনা আমি করেছি কিন্তু 'হা হতোস্মি'! কে কার কড়ি ধারে।

স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা হিসেবে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই এদেশে যা কিছু কৌলিন্য পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবনে কি সুরসৃষ্টি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়?—না হয় না। রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হয় এবং কিছু হিন্দি ভজনটজন শেখানো হয়, অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতই হচ্ছে সমকালীন বাংলা গানের জমিনের শেষ প্রান্ত—তারপরেই বঙ্গোপসাগর। রবীন্দ্রনাথ যে নিজে একথা বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বোধহয় বছর কুড়ি আগে একবার মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার কথা ও সুরে এইচ· এম· ভি-র জন্য দুখানা গান রেকর্ড করেন। রেকর্ডের টেস্টপ্রিন্টও আমার কাছে এল, এক কথায় অনবদ্য। বম্বেতে হঠাৎ আমার কাছে মোহরদির স্থানে স্থানে চোখের জলে অস্পষ্ট একখানা চিঠি এল—'কর্তৃপক্ষ বলেছেন তোমার গান গাইলে আমাকে শান্তিনিকেতন ছাড়তে হবে। কাজেই আমাকে ক্ষমা কোর ভাই'— ইত্যাদি। গান দুটি ছিল

আমার কিছু মনের আশা
কিছু ভালোবাসা
তাই দিয়ে বেঁধেছি আমার বড় সাধের বাসা
তোরা দেখে যারে।

আর অন্যটি

প্রান্তরের গান আমার
মেঠো সুরের গান আমার
হারিয়ে গেল কোন বেলায়
আকাশে আগুন জ্বালায়
মেঘলা দিনের স্বপন আমার
ফসল বিহীন মন কাঁদায়।

গান দুটি পরে শ্রীমতী উৎপলা সেন রেকর্ড করেন। ভাগ্যিস সুচিত্রাদি শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, তাহলে তাঁকে দিয়ে 'সেই মেয়ে' গানটি গাওয়ানো আমার ভাগ্যে ঘটত না।

সম্প্রতি এলিজাবেথ এ্যালিসন নাম্নী এক ব্রিটিশ মহিলা বম্বেতে প্রায় ছয় ঘন্টাব্যাপী আমার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। বিষয়বস্তু—'হিন্দী সিনেমার গান—তার ক্রমবিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতে তার প্রভাব। এটি হচ্ছে ওঁর ডক্টরেটের থিসিস। আমেরিকার illinois universityর সঙ্গীতে উনি এম মিউজ্ করে Ethnomusiclogy-র ওপর রিসার্চ করতে ভারতবর্ষে এসেছেন একবছরের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে। আছেন পুনাতে। ফিল্ম ইনস্টিটিউটের archiveএ একেবারে হিন্দি ছবির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তৈরি যা যা আছে দেখছেন। রাইচাঁদ বড়াল, তিমির বরণ, পঙ্কজ মল্লিক থেকে নওসাদ, শচীনদেব, শংকর জয়কিষন মায় বাপী লাহিড়ী পর্যন্ত কাউকে বাদ দেননি মহিলা। বেশ কিছুদিন যাবৎ ভারতীয় সঙ্গীত শিখছেন বাজাচ্ছেন বাঁশের বাঁশি আর ওঁর আমেরিকান স্বামী যিনি বাজান চেলো শিখছেন সরোদ। পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে এত ওয়াকিবহাল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ওঁদের কাছেই জানলাম যে পৃথিবীতে জনপ্রিয়তায় হিন্দি সিনেমার গানের স্থান পপ্ সঙ্গীতের ঠিক পরেই। মহিলা যে কথা বললেন তা হল এই যে সমকালীন ভারতীয় ফিল্ম সঙ্গীতে আধুনিকতম অর্কেস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গতে পাশ্চাত্য রীতির হারমোনি ও কাউন্টার পয়েন্ট ইত্যাদির ব্যবহার যে সার্থকভাবে এ দেশে হয়েছে এবং হচ্ছে একথা পাশ্চাত্যে কেউ জানে না বললেও হয়। আমি ওঁকে বললাম—'শুধু পাশ্চাত্যে কেন, এ দেশে আমাদের সঙ্গীত সমালোচকরাও জানেন না'। রিসার্চ করা তো দূরের কথা হিন্দি সিনেমার গানের নাম শুনলেই তাঁরা নাক সিঁটকে বসে থাকেন। অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বছরে প্রধানত সিনেমার মাধ্যমে সমকালীন ভারতীয় সঙ্গীতে যে পরিমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা ঘটেছে—তার বিবর্তনে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসঙ্গীত মার্গসঙ্গীত এবং পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল এবং লোকসঙ্গীত ও পপ সঙ্গীতের যে মিশ্রণ ঘটে তাকে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীতে পরিণত করেছে এবং একটি সর্বভারতীয় সাঙ্গীতিক ভাষা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, এ-বিষয়ে গবেষণার জন্য আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। তার জন্য সাগরপার থেকে ছেলেমেয়েরা আসবে। আর আমরা তার অবক্ষয়ের দিকটাকেই বড় করে দেখে তাতে থুথু ছেটাব। সে থুথু স্বভাবতই পড়বে যাঁরা স্বতন্ত্র সুরস্রষ্টা তাঁদের সবার মুখে। কাজেই আমার বাবার ভীতি যে নেহাৎ অমূলক ছিল তা নয়। কিন্তু বেঁচে থাকতেই বাবা আমার রচিত গণনাট্যের গান, গাঁয়ের বধূ; রানার, অবাক পৃথিবী ছাড়া পরিবর্তন, বরযাত্রী, পাশের বাড়ি ইত্যাদি ছবির গান শুনে গেছেন এবং তাঁর শুধু সমর্থনই নয়, প্রাণভরা আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম। বলছিলাম বাবার যুক্তিবাদী মনের ভিত ক্রমশ নড়ে যাবার কথা। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেদনাদায়ক বাবার সেই অসমসাহসী সাহেবের নাকে ঘুসি মারার মন, সাধারণ্যে ঢালাও করে হাজার হাজার টাকার বিলিতি কাপড় পোড়াবার মনটাকে অন্যায় আর অবিচারের সামনে কুঁকড়ে যেতে দেখা—অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা। একে একে আমরা আট ভাই বোন তখন তাঁর ঘাড়ে এসে ভর করেছি এবং ক্রমশ বড় হচ্ছি। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব। দুরারোগ্য রোগে পীড়িতা মাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এবং নিজের দেশে ফেরার বিড়ম্বনার স্মৃতি বাবাকে অস্থির করে তুলত। বাবাকে বরাবর দেখেছি হাসপাতালের ওষুধ ইনডেন্ট বা আমদানি করার ব্যাপারে সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে যে হাসপাতালে কুলিদের জন্য যে ওষুধ আনা হয় তা সবই প্রায় obsolete অচল, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই তার ব্যবহার হয় না। বাবার
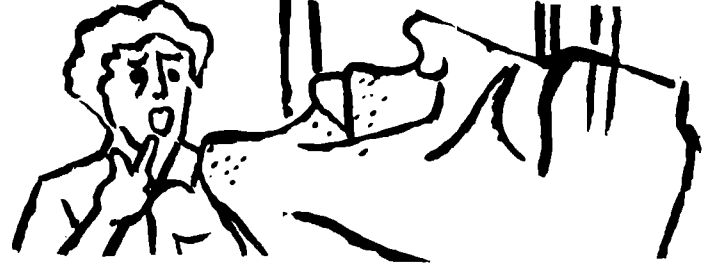
দৃঢ় ধারণা ছিল যত রোগী মরে তার শতকরা ৫০ জনকে অন্তত বাঁচান যায় যদি ঠিক ওষুধ পড়ে এবং শুয়োরের খোঁয়াড় থেকে মজুরদের যদি একটু স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা যায়। শেষপর্যন্ত ডাঃ মালোনিকে দিয়ে সই করিয়ে পাস করিয়ে নিতেন বটে কিন্তু যা দামী ওষুধ আসত সাহেবদের জন্যে তোলা থাকত ম্যানেজারের বাংলোয়। মরণাপন্ন কুলি রোগীকে বাঁচাবার সে ওষুধ আছে জেনেও তা আদায় করতে পারতেন না বাবা—রোগী মরত।

অসহায় আক্রোশে আউটডোর রোগীদের বাবা গালাগাল দিতেন—"তোরা মর! —সব শুয়োরের মত মর, তোদের মরাই ভালো।' অপারেশন করার যন্ত্রপাতি ছিল না। ছিল কয়েকটা স্ক্যালপেল আর কাঁচি। বহু অনুরোধ উপরোধ করেও একটা মাইক্রোস্কোপ বাবা আনতে পারেন নি। রক্ত, বাহ্য, পেচ্ছাপ পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয়ের কোনো উপায় ছিল না। রোগ নির্ণয় সবই আন্দাজে হত। সবচেয়ে ট্র্যাজিডি ছিল যে মেডিক্যাল জার্নাল পড়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞতায় বাবার ডাক্তারি মন ছিল অত্যাধুনিক আর হাতে ছিল বিগত যুগের অচল চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রায়ই রেগে বলতেন—'বুঝলি আমি ডাক্তার নই—নিধিরাম সর্দার। ছেড়ে দোব শালার চাকরি।' আবার পরের দিন সুড় সুড় করে হাসপাতালে বেরোতেন। বাবার অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অসহায়তাকে তখন না বুঝে তাঁকে একসময়ে ভীরু ভাবতাম। আজ বুঝতে পারি কত বড় অন্যায় করতাম।

প্রায়ই বলতেন, 'কবে তোরা বড় হবি মানুষ হবি—এই দাসত্বের অপমান থেকে আমায় বাঁচাবি।' সেই আমি কোথায় পাশটাশ করে চাকরি করে বাবার ভার লাঘব করব—তা না করে বাবার কানে গেল আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢুকেছি। দাদার ডাক্তার না হওয়ার পর আমার এই বিচ্যুতি বাবাকে পাগল করে তুলেছিল। আজ করজোড়ে স্বীকার করব বাবার সেদিনের মানসিক যন্ত্রণাকে বোঝার বুদ্ধি আমার ছিল না। আমাদের দু'ভায়ের পর ছ'ছটা ছোট ছোট ভাইবোন এবং রুগ্না মায়ের দায়িত্ব এবং বাবার কিছুটা অন্তত ভার লাঘবের দায়িত্বকে কি করে অস্বীকার করে একটা বেআইনী পার্টিতে আমি যোগ দিলাম—এই কথা লিখে বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখলেন পত্রপাঠ পার্টির সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে পড়াশোনায় মন দিতে এবং মানুষ হতে। বাবার যন্ত্রণা এবং হতাশাকে না বুঝে আমি উল্টে রেগে গেলাম আমার স্বাধীনতায় উনি হস্তক্ষেপ করছেন বলে। লিখলাম আমাকে আর টাকা পাঠাবেন না, আমি নিজের ভার নিজে নিতে পারব।' বাবাকে যে কত বড়ো আঘাত দিয়েছিলাম তা আজ কল্পনা করতেও আমার চোখে জল আসে। যে মানুষ স্বেচ্ছায় বনবাস নিয়ে নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নিজের রক্তজল করা পয়সায় বি-এ পাশ করালেন ছেলেকে, সে ছেলে আজ নিজের দায়িত্ব নিজে নিল আর কিছু তার দায়িত্ব নেই! 'এসবই আমার অদৃষ্ট!'—এই হাহাকার তখন থেকেই বাবার জীবনে প্রবেশ করল। আজ ভাবি কমিউনিস্ট পার্টি করে কি এমন তীর মারলাম। মা-বাবার মনে এত বড় একটা আঘাত দিয়ে, তাঁদের প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে জীবনের যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছরকে ছাই করে দিয়ে কার কি লাভ হল? যা হারালাম তা তো চিরকালের জন্যই গেল।

ছবি □ পূর্ণব্রত পত্রী

ধারাবাহিক

শ্রীকুমার রায়

স্তন্যদানের সপক্ষে

একদিকে যেমন দেখা যায় বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে অনেক আধুনিকাদের প্রচণ্ড অনীহা, অন্যদিকে আবার অনুন্নত শ্রেণীর নিরক্ষর মায়েরা পাঁচ-ছ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রধান খাদ্য বলতে বোঝেন স্তনদুগ্ধ। অথচ দু'চার প্রজন্ম আগেও প্রাচীনারা এবং আধুনিক শিশু বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দিতেন বা দেন সুবর্ণময় মধ্য পন্থার—'বায়োলজিকাল ফিডিং'-এর।

'বায়োলজিকাল ফিডিং' বলতে বোঝায় (১) গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের উপযুক্ত পরিচর্যা, (২) জন্মের পর অন্তত তিন থেকে ছ'মাস শিশুকে স্তন্যদান, (৩) অন্নপ্রাশনের পর (বিশেষজ্ঞদের মতে চার থেকে ছ'মাস বয়সে) তাদের খাদ্য তালিকায় অন্য মিশ্র খাদ্য (ক্রমান্বয়ে ফ্যারেকস, আলুসেদ্ধ, পাকা কলার মণ্ড, ডিমের কুসুম, মাখন ইত্যাদি) যোগ করা এবং (৪) আন্দাজ দেড় বছর বয়স থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে বুকের দুধ দেওয়া কমিয়ে দু'বছর বয়েসে একেবারে বন্ধকরা (উইনিং)।

খাদ্যই আমাদের শরীরে পুষ্টি এবং শক্তি জোগায় এবং যেহেতু শিশুদের কোষ, টিস্যু ইস্তক তাবৎ শরীরের বৃদ্ধির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বড়দের চেয়ে অনেক অনেক বেশি তাই তাদের বিপাকের হারও বড়দের চেয়ে বেশি ; অথচ পরিপাক ক্ষমতা সীমিত। জন্মের পর প্রথম মাসে একটি চার-পাঁচ কেজি ওজনের শিশুর শক্তির প্রয়োজন দৈনিক প্রায় পাঁচশো ক্যালরি ; দশ মাসে সেটাই বেড়ে দাঁড়ায় হাজার ক্যালরি। এই শক্তির সিংহভাগ (শতকরা প্রায় ৭০) শিশুরা সংগ্রহ করে খাদ্যের শর্করা থেকে এবং বাকিটা স্নেহ পদার্থ থেকে। আবার দ্রুত বৃদ্ধিমান কোষকলার চাহিদা মেটাতে যে পুষ্টির দরকার সেটা মেলে প্রতিকিলোগ্রাম শরীর-ওজনে আড়াই থেকে তিন গ্রাম খাদ্য-প্রোটিন থেকে। তাছাড়া ভিটামিন, লবণ পদার্থ (minerals), জল ইত্যাদি তো আছেই। মায়ের দুধে এ সবই পাওয়া যায় উপযুক্ত পরিমাণে। তাছাড়াও শিশুরা দুধের মধ্যে দিয়ে রোগ প্রতিষেধক immune bodies ও মায়ের কাছ থেকে আহরণ করে (যেমন Bifidus factor, Secretary IgA, Lysozyme, Lactoferrin ইত্যাদি)। ল্যানোলেইক অ্যাসিড নামে স্নেহপদার্থ এবং সিসটিন, নিউক্লিওটাইড আর পলিএমাইন নামে অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন মায়ের দুধ ছাড়া কোথাও মেলে না।

কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই যে-সব মা শিশুদের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করেন তাঁরা সাধারণত তিনটি কৈফিয়ৎ দিয়ে থাকেন—(ক) স্তনে পর্যাপ্ত দুধ কোথায়, (খ) শিশুর চাহিদা মতো দুধ খাওয়াবারসময় কোথায় এবং (গ) শিশুকে স্তন দুগ্ধের ওপর রাখলে বুকের 'শেপ' খারাপ হয়ে যায়। তাঁরা জানেন না যে, শারীরবিদ্‌রা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন—বাচ্চারা যত স্তন চোষে (বাচ্চার চোষার ক্ষমতা বড়দের চেয়ে অনেক বেশি, কারণ তাদের গালে একটা চর্বি-স্তর আছে যাকে বলে 'suctovial fat' যার জন্যে বাচ্চাদের গাল ফুলো দেখায়) মায়ের গুরুমস্তিষ্কের হাইপোথ্যালেমাস্ অংশটি ততই 'Prolactin inhibitory factor' উৎপাদন কমিয়ে দেয়, যার ফলে পিটুইটারি নিঃসৃত প্রোল্যাকটিন হর্মোন মায়ের স্তনে অধিক পরিমাণে দুধ তৈরি করতে সাহায্য করে। (স্তন্যপায়ী শিশুর প্রথম বছর একজন সাধারণ মায়ের বুকে দৈনিক গড়ে সাতশো এম. এল. অর্থাৎ এক লিটারের কিছু কম দুধ তৈরি হয়)। বাল গোপালের প্রতি অফুরন্ত স্নেহে যশোমাতাই যে কেবল ক্ষরিতস্তনী ছিলেন তা নয়, শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়ায় সব মা-ই হতে পারেন।

শারীরবৃত্তের এই স্বাভাবিক প্রভাব ছাড়াও পুরানো দিনের ঠাকুমা-দিদিমা-মায়েরা দুধ বাড়াবার নানারকম কার্যকরী উপায় জানতেন। তাঁরা নতুন মায়েদের প্রচুর জল, সাবু, ঘি, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি খেতে বলতেন, গায়ে রোদ্দুর লাগাতে বলতেন যাতে মায়ের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি হয় এবং দুধের মাধ্যমে বাচ্চারা সেটা পেতে পারে। মায়েদের মানসিক প্রফুল্লতার দিকেও তাঁরা নজর দিতেন। আধুনিক বিশেষজ্ঞরাও স্তন্যদাত্রী মায়েদের ওই সব উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই সূত্রে প্রাচীনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা দরকার। শিশু জন্মাবার পরপরই তাঁরা মায়েদের খাদ্যে জলীয় অংশ কমিয়ে দিতেন যাতে তাড়াতাড়ি 'নাড়ি শুকোয়'। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রয়োজন মতো বুকের দুধ কমাবার বা বাড়াবার নানা রকম ভালো ভালো ওষুধও আজকাল বেরিয়েছে।

মায়েদের দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। মানছি যে, অর্থনৈতিক চাপ আর জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য আনা শক্ত, তবে এটা জানি যে সবদেশের সব প্রতিষ্ঠানই কর্মরতা মায়েদের কয়েক মাস করে 'মেটারনিটি লিভ' দিয়ে থাকে। আর মায়েরা যদি কেবলমাত্র 'পার্টি' করতে গিয়ে বা ফুর্তির কারণে শিশুদের অবহেলা করেন, সেটা অমার্জনীয় অপরাধ। এবং নতুন মায়েদের জ্ঞাতার্থে বলে রাখি, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালে স্তনের শেপ্ খারাপ হয়ে যায় এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই, বরঞ্চ উল্টোটাই সত্যি। এছাড়াও মনে রাখা উচিত, বাচ্চাকে স্তন্যদান করলে সাধারণত জন্মশাসিত হয় এবং শুনেছি জন্মশাসনের উপায় হিসেবে গেরিলারাও এই পন্থা অবলম্বন করে। আর ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করেছেন, বাচ্চাকে নিয়মিত দুধ খাওয়ালে স্তনের ক্যানসারের সম্ভাবনা কমে যায়। এই সব কথা চিন্তা করেই শিশুখাদ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা ইদানীং জোর গলায় বলছেন 'Back to Breast.

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কতকগুলো সাবধান বাণীও শুনিয়ে দেন। প্রথমত নারীর স্তনের আকার শিশুকে দুধ খাওয়াবার আদৌ উপযুক্ত নয়। স্তনাগ্রভাগের দৈর্ঘ ঠিক মতো না হলে দুধ টানবার সময় বাচ্চারা যখন স্তনে মুখ চেপে ধরে তখন তাদের দম আটকে আসতে পারে এবং ক্রমশ তারা স্তনের ওপর স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ত স্তন এবং স্তনাগ্রভাগের নিয়মিত যত্ন না নিলে শিশুর স্বাস্থ্যহানি ঘটা বিচিত্র নয়। তাহলেও বলব, বোতল বা ঝিনুক থেকে বাচ্চারা যে পরিমাণ পেটের গোলমালে ভোগে, মায়ের দুধে তার চেয়ে সম্ভবনা অনেক কম। তৃতীয়ত কড়া নজর রাখা দরকার শিশু মায়ের বুক থেকে যথোপযুক্ত পুষ্টি ও শক্তি পাচ্ছে কিনা। সেটা বোঝার উপায়—তার সন্তোষজনক ওজন বৃদ্ধি এবং খাবার পর দু তিন ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম।

এই সব সাবধানতা অবলম্বন করে মায়েরা যদি সদ্যজাত শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান তাহলে আমরাও হয়ত অসকার ওয়াইল্ডের মতো বলতে পারি 'If even I get a chance, I should love to be reborn just to have the ecstasy of being re-fed by the kindly mothet' □

কিং লিয়ার

গ্রিগোরি কোজিনৎসেভ

অনুবাদঃ সিদ্ধার্থ রায়

ব্যক্তি ও তার আবরণ

সম্রাট ও তাঁর রাজকীয় পোশাকের লোককথা পুবে এবং পশ্চিমে জানা। (এন· বারকোভস্কি-র লেখা 'বলশয় ড্রামাটিক থিয়েটার-এ কিং লিয়ার' প্রবন্ধেই, রুশ পাঠক্রমে, শেক্সপিয়রের ট্র্যাজিডিতে এই লোকগাথার প্রয়োগের ব্যাপারে প্রথম আমি অবগত হই)। সম্রাট সাঁতারে গেছেন নদীতে এসে, পোশাক ছেড়ে, পাড়ে রেখে, তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটবার সময় চোর তাঁর বস্ত্রহরণ করে। সম্রাটকে উলঙ্গ হয়েই রাজপ্রাসাদে ফিরতে হয়। দরজার সামনে প্রহরীদের দ্বারোদ্ঘাটনের আদেশ দিলেও, তারা সম্রাটকে প্রবেশাধিকার দেয় না। তাঁর রাজকীয় পরিচ্ছদ ছাড়া, তিনি স্বীকৃত নন। সম্রাট হিসেবে দাবি করলেও, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না। সৈন্যরা এসে, উলঙ্গ লোকটিকে ধরে কারাগারে নিয়ে যায়। বিচার করে, নিজেকে সম্রাট বলে দাবি করবার অপরাধে, জনসমক্ষে তাঁকে চাবুক মারবার রায় জারি হল। যখন তাঁর আবরণ অপহৃত, সম্রাট আর সম্রাট থাকেন না। রাজকীয়তা **মানুষে নয়**, পোশাকে।

ব্রিটিশ নৃপতির **স্কন্ধপ্রান্তে** ঝুলে থাকত লোমে ঢাকা মখমলের আংরাখা। কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা হরণ করে ঐ পোশাক। আর সেই মুহূর্তে লিয়ার রাজা থাকেন না আর.

গনেরিলের দুর্গে এ বিষয়ে একটি দৃশ্য আছে। মেয়ের কাছে থাকতে থাকতে লিয়ার লক্ষ্য করেন, আগে যেভাবে তাঁর দেখাশোনা হতো, এখন তা একটু অন্যরকম। তাঁর প্রতি ব্যবহারে একটা ভিন্ন ঝোঁকের আঁচ পান তিনি, কিন্তু এই পরিবর্তনের সঠিক অর্থ বুঝতে পারেন না। দুর্গকর্ত্রীর দেওয়ান, ওসওয়াল্ড, তাঁর দৃষ্টি কাড়ে। লিয়ার ডাকেন, কিন্তু ওসওয়াল্ড ভ্রূক্ষেপ না করে, চলেই যায়। মাত্র কিছুক্ষণ আগে প্রতিটি প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, লিয়ার, হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন এই ভৃত্যটির দিকে। তাঁকে অপমান করবার মতো মানুষ থাকতে পারে, এটা তাঁর মাথাতেই আসে না। যেন তাঁকে লক্ষ্য না করেই, ওসওয়াল্ড ফের লিয়ারের সামনে দিয়ে যায়। লিয়ার তাকে থামিয়ে, আরও এগিয়ে আসতে বলেন তিনি নিশ্চিত যে, নিজের কর্তব্যে অবহেলা বুঝতে পেরে, ভয়ে নতজানু হয়ে, ভৃত্যটি মার্জনা চাইবে। কিন্তু ভৃত্যটির মুখ শান্ত, দাঁড়াবার ভঙ্গিতেও কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। লিয়ারের জিজ্ঞাসা এই ঘৃণ্য ভৃত্যটি কি জানে, তার সামনে কে? উত্তর আসে হ্যাঁ, সে অবগত। তার সামনে দুর্গকর্ত্রীর পিতা। রাজকীয় আবরণে সমৃদ্ধ তার মনিবের পিতৃদেব হিসেবেই লিয়ারকে দেখছে ভৃত্যটি।

"প্রতিটি পদে রাজা" ছিলেন যিনি, সেই মহনীয়তা কিন্তু তাঁর স্বভাবের গুণ নয়, তাঁর ক্ষমতারই নিছক পরিণাম। কেবল তাঁর পোশাকই তাঁকে আলাদা করে সবার ওপরে তুলেছিল। স্তাবকতা তাঁর জন্য নয়, লিয়ার পূজিত নন। পোশাক অপহৃত হবার পর ভৃত্যটিও আর রাজাকে

count: ~~though this knave came somewhat saucily to the world before he was sent for, yet was his mother fair; there was good sport at his making, and the whoreson must be acknowledged.~~—Do you know this noble gentleman, Edmund?

Edm. No, my lord.

Glo. My lord of Kent: remember him hereafter as my honourable friend.

Edm. My services to your lordship.

Kent. I must love you, and sue to know you better.

Edm. Sir, I shall study deserving.

Glo. He hath been out nine years, and away he shall again:—The king is coming. [*Trumpets sound within.*

Enter LEAR, CORNWALL, ALBANY, GONERIL, REGAN, CORDELIA, *and* Attendants.

Lear. Attend the lords of France and Burgundy, Gloster.

Glo. I shall, my liege. [*Exeunt* GLO. *and* EDM.

Lear. Meantime we shall express our darker purpose.
Give me the map there.—Know, that we have divided,
In three, our kingdom: and 't is our fast intent
To shake all cares and business from our age;
Conferring them on younger strengths, while we
Unburthen'd crawl toward death.—Our son of Cornwall,

কিং লিয়ার নাটকের অ্যাডলার ওয়েলস-এর প্রম্পট বুক, ১৮৫৫

স্বীকার করে না। রাজা হিসেবে লিয়ার শেষ। তিনি লিয়ারও থাকেন না যেন যেমন বিদূষক তাঁকে বলে, তিনি "লিয়ারের ছায়া"।

এক দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু হয় সেই বৃদ্ধ নৃপতির। সবাইকে তিনি বলেন, তিনি রাজা, কিন্তু কেউ তাঁকে আমল দেয় না। উপহাস করে তারা তাঁকে হত্যা করতে চায় আর তিনি যন্ত্রণাদীর্ণ নীরবতার শেষে অভিশাপ দেন।

পরে উপলব্ধি হয়, ঐ অপহৃত পোশাকের কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর। তিনি আর কোনো অবস্থাতেই পরবেন না তা। তাঁর যাত্রাপথের শেষে তিনি উপনীত, সমস্ত মানুষ থেকে নিজেকে আলাদা করবার দাবি করেন না তিনি আর যে বিশিষ্টতা নেই, তা জানেন। তিনি এখন এক সাধারণ মানুষ।

এই কাহিনীর একটা নীতিবাক্য আছে প্রকৃত মূল্য আবিষ্কার করতে হলে, সাধারণ জীবনকে বুঝতে হবে আগে। যা আগে অজানা ছিল, সেসব জানতে শুরু করলেন লিয়ার। প্রত্যক্ষ ও সরলতায় শুরু করে, ক্রমশ পরোক্ষের সর্বজনীনতার দিকে তাঁর যাত্রা। সারল্য আর জটিলতার অন্তঃস্যূত যোগাযোগে তাঁর বোধোদয় হতে থাকে।

তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে নাড়ীর টানের সঙ্গতি ছিন্ন করে দিয়েছে কনিষ্ঠা কন্যার জেদী উত্তর। তাঁর ইচ্ছেমতো কর্ডেলিয়া কাজ না করাতেই লিয়ারের ক্রোধ। পরে, বড় মেয়েদের প্রকৃত মানসিকতা বুঝতে পেরে তাঁর চূড়ান্ত অবিচারে লিয়ারের গ্লানি আসে। তাঁর মনে হতে থাকে, কর্ডেলিয়ার উত্তরের ত্রুটি অতি সামান্যই, ব্যবহারের মাত্রাহীনতার অপরাধ তাঁরই। তবে, তাঁর মতে, ত্রুটি হলেও তা তো ত্রুটিই

....O most small fault,
How ugly didst thou in Crdelia show!

লিয়ার এখনও বোঝেন নি কর্ডেলিয়ার কথার অর্থ। তার উত্তর যে ভুল নয়, বিদ্রোহ, মনে হয় না লিয়ারের।

তাঁর দিক থেকে ভুল যে আংশিক, এবং তাও পিতা হিসেবে, রাজা হিসেবে নয়—এ ব্যাপারে লিয়ার নিশ্চিত। ঘটনাস্রোত তাই এ পর্যন্ত বাঁধা থাকে পরিবারেই, কুশীলবরা কেবল পিতা ও কন্যারা। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ঘটনাপ্রবাহ অন্য ব্যাপ্তি পেয়ে যায়। রাত্রির অন্ধকারে দুর্গে দুর্গে ছুটে চলে দূত, বিদ্রোহের ডাক নিয়ে। এই আবর্তে পাক খেতে থাকে রাজা উজিরের দল। সমর্থকরা জোট বাঁধে; দলের ভিতরে নানা দল। যুদ্ধ আসন্নপ্রায়।

লিয়ারের কাছে কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের সীমিত চৌহদ্দির বাইরে কিছু ঘটছে না। যেখানেই পিতাপুত্রকন্যা, বড় ছোট আছে, তা সে জোতদারের খামার বা চাষীর কুঁড়ে হোক না, এই এক নাটক চলতে পারে।

পার্থিব এই বাস্তবতায় লিয়ার প্রথমে দেখেছিলেন সন্তানোচিত কৃতজ্ঞতার অভাব। তাঁর যাত্রাপথের সেখানেই শুরু।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অন্যের ওপর খবরদারি করবার ব্যাপারটাকে লিয়ার নিজস্ব ক্ষমতা হিসেবে ভাবতেন। একজন জমিদার যেমন বাড়ি, ক্ষেতখামার, গরুছাগল উইল করে উত্তরাধিকারীদের দেয়, লিয়ারও সন্তানদের এই ক্ষমতা দিতে চান অনেকটা সেইভাবেই। মেয়েরা পায় প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি, অথচ মাত্র ১০০ জন নাইটের সংস্থানে তারা বিদ্বিষ্ট। অকৃতজ্ঞতা—এটাই মূল পাপ। আর নিজের সন্তানের ভেতর এই পাপের মতো ভয়াবহ আর কিছু নেই।

তাঁর কাছে বিক্ষুব্ধ দণ্ডের অভিশাপ হিসেবে, তিনি চান, তাঁর অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গনেরিলও যাক আলবানির ডাচেস-এর ছেলে হলে, সেও

যেন পরিণত বয়সে মাকে না দেখে।

....that she may feel

How sharper than a serpent's tooth it is

To have a thankless child !...

এক অপমানকর অস্বাভাবিকতা তৈরি হয় এই শব্দগুলোর সংযোগে। সবার কাছে পবিত্র অনুশাসন তারা অস্বীকার করে

Is it not as this mouth should tear this hand

For lifting food to't ?...

সন্তানের অকৃতজ্ঞতার মতো অবিচার আর নেই। তাই ট্র্যাজিডিতে এই অকৃতজ্ঞতার কথাই প্রথম আসে।

মূল্যবান ধাতুর বদলে নিতে হয়েছে গিনি, লিয়ার এটা বুঝেছেন। মিষ্টি আর জমকালো পোশাকের প্রকৃত মূল্য নগণ্য। এখনও তাঁর নুনের দাম জানতে বাকি। গল্পের রাজাটি নিজের দরকারের সময় নুনের দাম উপলব্ধি করে এবং ক্ষুধার্ত যন্ত্রণায় রাস্তার খাবার খেতে বাধ্য হয়।

সন্তানের ভালোবাসা, আশ্রয়, ক্ষমতা, কিছুই নেই তাঁর। দুর্যোগের মধ্যে মাথা গুঁজবার ঠাঁইও না। দরিদ্রতম প্রজাদেরও যা হাল, রাজার অবস্থা তার থেকে ভালো নয় কিছু।

জীবনের গাদ খেতে খেতে যেন, রাজা অন্য এক অবিচারের রূপ দেখতে পান। সবকিছু খুইয়ে, হতাশাক্রান্ত তিনি বুঝতে পারেন তাঁর অবস্থার গুরুত্ব—তাঁর চোখে পড়ে আরও বহু মানুষ, যাদের অবস্থা তাঁরই মতো। তাঁর অস্তিত্বের প্রত্যক্ষতায়, লিয়ারের চিন্তা আরও পরোক্ষ সর্বজনীন প্রশ্নের দিকে ঘোরে।

বিদূষকের দিকে তাঁর নজর যায়। সে আর হাসির যোগানদার নয়, ঐ ভাঁড়টিও রাজার থেকে অভিন্ন এখন, সেও তো রাজার অনুভূতিই ভাগ করে নিচ্ছে। সেই মানুষটির যন্ত্রণার দীনতা বোঝেন রাজা। তাই কেন্ট যখন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক কুঁড়েতে ঢোকার প্রস্তাব করেন, লিয়ার বিদূষককে আগে ঠেলে দেন In boy, go first. You houseless poverty.

গভীরতর চিন্তার সচেতনতায় জীবন তাঁর কাছে প্রতিফলিত হয় আরও স্পষ্টভাবে। লিয়ার বা বিদূষকই শুধু দুর্দশার অস্তিত্বে নিজেদের টেনে চলছে না—হাজার হাজার হা-ঘরে মুখের ছবি ভেসে ওঠে তাঁর সামনে। দীর্ণ, ক্ষুধার্ত ও বঞ্চনার এক চেহারা নিয়ে তাঁর রাজ্য উঠে আসে। পীড়নে নিষ্পেষিত ও ক্লান্তিতে পতনোন্মুখ প্রজারা হেঁটে যায়। মানুষের অণুবিশ্বে পৃথিবীর বাস্তবতা ঢুকে ভেঙে পড়ে। লিয়ারের সচেতনতার প্রতিটি কোণ ভরে ওঠে। নাড়ীর টানের সমস্ত সঙ্গতি টালমাটাল। পৃথিবীর দৈন্য আর অসঙ্গতির বাস্তবতাই লিয়ারের মনে ধাক্কা দেয়।

পিতার আহত অভিমান ও অপমানিত রাজকীয় দম্ভের কথা আর মনে নেই। ঘটনার প্রবাহ এখন সমস্ত মানুষের সামনে, ইতিহাসের অসীম মঞ্চের ওপর, ঘটতে থাকে। অবিচারের এক সংখ্যাতীত অসহ্য নিষ্ঠুরতা লিয়ারের অভিজ্ঞতায়। এক উচ্ছ্রিত আদলের ছায়ায় তা ঢেকে ফেলে সত্তার নতুন রূপ। এই উচ্ছ্রিত আদলে সন্তানদের অকৃজ্ঞতা এক সামান্য অংশ। সামাজিক অবিচারই যে সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি, লিয়ার তা উপলব্ধি করেন। তিনি দেখতে পান "the very age and body of the time"।

বেদনার এক তন্ময় মুহূর্তে তাঁর পাশের মানুষদের কথা ভাবছেন তিনি

Poor naked wretches, wheresoe'er you are,

That bide the pelting of this pitiless storm,

জর্জ রোমানিকৃত স্কেচ 'লিয়ার ও কার্ডিলিয়া'।

How shall your houseless heads and unfed sides.

Your looped and windowed raggedness, defend you

From seasons such as these ? Oh, I have ta'en

Too little care of this !......

আইন, অধিকার বা নৈতিকতা বলে কিছু নেই ওসব ভুয়ো ধারণা। মখমলের আংরাখা ঝোলে যার কাঁধ থেকে তারই মানায় ওসব। এসব ধারণার সর্বময় রক্ষক ছিলেন যিনি একদা, সেই লিয়ার এখন তাদের ঠাট্টা করেন। ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে কথা বলে তিনি সমস্ত ধারণাটা বদলে বিভিন্ন তল থেকে দেখতে চান।

এই হল দেশের আইন। আর আইনটা যে কি তা তো বোঝাই যাচ্ছে "Look with thine ears. See how yond Justice rails upon yond simple thief. Hark, in thine ear Change places and, handy-dandy, which is the Justice, which is the thief ?" বিচারক আর চোর একে অন্যের থেকে আলাদা নয় আর।

শেকল ছিঁড়ে একটি কুকুর ছিন্ন পোশাকে আবৃত একটি মানুষকে ভীষণভাবে কামড়াতে আক্রমণ করে। ভয়ানক জন্তুটার হাত থেকে বাঁচতে সেই হা-ঘরে লোকটি পালায়। কুকুরটি লিয়ারের কাছে এক প্রতীক হয়ে ওঠে। তিনি গ্লসেস্টারকে বলেন, "There, thou mightst behold the great image of authority. A dog's obeyed in office." কুকুরটি যেন কোনো কর্তব্যরত আমলা।

"A law" এই কথাটাও ভুল বোঝাতে পারে। যিনি আইন তৈরি করেন, তিনি কথা বলছেন সে আইন প্রয়োগকারী এক প্রতিনিধির সঙ্গে

"Thou rascal beadle, hold thy bloody hand !

Why dost thou lash that whore ? strip thine own back.

Thou hotly lust'st to use her in that kind

For which thou whip'st her....."

যার কাঁধ থেকে আংরাখা ঝোলে, নৈতিকতা তারই বশংবদ। ব্যভিচার ? ব্যভিচারীদের লিয়ার ক্ষমা করেন—"for I lack soldiers.

স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে-ওঠা এই ছবিতে দেশের ঘটনাস্রোতের একটা প্রতিফলন পাওয়া যায়। জীবনের থেকে আর কোনো কিছু লিয়ারকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি—দেওয়াল নয়, প্রহরীরা নয়, স্তোকবাক্য না। বাস্তবতাকে বুঝবার এর চাইতে অনুকূল অবস্থান লিয়ারের আগে হয়নি তো বটেই, একেবারে বাস্তবতার মধ্যেই নিজেকে দেখতে পান তিনি। সর্বোচ্চ ধাপ থেকে, তিনি নেমে আসেন সিঁড়ির শেষতম পর্যায়ে। আর তারপরই পা পড়ে মাটিতে।

নুনের দাম লিয়ার বুঝতে শেখেন। ক্ষুধা তাঁকে সাধারণ খাবার খেতে বাধ্য করেছে বলেই যে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছন, ঘটনাটা তেমন নয়। এর দাম তাঁর কাছে অন্যভাবে এসেছে চোখের জলের স্বাদ পেয়েছেন বলেই, তাঁর সেই স্বাদ জানা হয়। নিজের দুর্দশার নোনতা অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত তাঁর অন্যান্যদের দুঃখ সম্পর্কেও সচেতনতা আসে, যাদের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না।

শেক্সপিয়রের প্রায় সমস্ত নায়কেরই জীবনে-এক একটা মুহূর্ত আসে, যখন তারা প্রত্যেকে উপলব্ধি করে যে, কোনো দুষ্ট চরিত্র বা ঘটনার কোনো কাকতালীয় সমাবেশ তার যন্ত্রণার কারণ নয় ; তা অন্য কিছু, এমন একটা জিনিস যা জীবনেরই গভীরে নিহিত। একটি নির্দিষ্ট মানুষের দুর্দশা আরও বহু মানুষের বড় মাপের দুর্গতিরই অংশমাত্র। সামাজিক সম্পর্কের গূঢ় গোপনেই এর কারণ। আর এই মুহূর্ত থেকে এক নতুন আবেগে আপ্লুত হয় নায়কের জীবনযাপন। এর আগে যা কিছু ঘটেছে, মননের পীড়ন বা অনুভবের উদ্গার, সে সবই এই নতুন আবেগের ভূমিকা। ওথেলোর আহত বিশ্বাস, পিতার হত্যাবৃত্তান্ত শুনে হ্যামলেটের বিহ্বলতা, মেয়েদের প্রতি তাঁর ব্যবহারের ত্রুটি উপলব্ধি করবার পর লিয়ারের হতাশা—এ সমস্তই, তাদের সামনে খুলে-যাওয়া নতুন পথের আরম্ভে, এই নায়কদের প্রথম পদক্ষেপ।

এক সংহত উচ্ছ্বাস তাদের অভিভূত করে ; সকলে সমানভাবে এর শিখায় জ্বলে খাক হতে থাকে। ঘটনার কার্যকারণ আবিষ্কারের আগ্রহে, জানবার জন্য এই আবেগ। ব্যক্তি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নয় আর, মানব প্রজাতির কথাও চিন্তা করে সে। দুষ্টের কোনো ব্যক্তিরূপ সে দেখে না, দেখে এক সংগঠিত চক্র, আর তলোয়ারের এক আঁচড়ে কি তা শেষ করা যায় ! ক্লডিয়াস মারা পড়ে, কিন্তু তার মৃত্যুতে সময়ের ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না। অপরাধীর মৃত্যুতে ধ্বংস হবে না সামাজিক বৈষম্য। ইয়াগোকে ভীষণ অত্যাচারের দণ্ড দেওয়াতেই তো অবিচারের শেষ নয় ! এতে ডেসডিমোনার পুনরুত্থান হয় না, রোমিও-জুলিয়েট বা ওথেলো-ডেসডিমোনার মতো ভালোবাসা যে এই শতাব্দীতে সম্ভব, এ বিশ্বাস ফিরে আসে না আর।

কন্যাদের মৃত্যুদণ্ডে ও তাঁর রাজমুকুট ফিরে পেলেই লিয়ারের যন্ত্রণার শেষ হয় না। উদ্বেলিত তাঁর আবেগ অন্য কোনো প্রত্যয় চাইছে। যা এতদিন লুকোনো ছিল তাঁর কাছে, সেটা তাঁর জানা দরকার, জানতেই হবে অবিচারের কারণ।

বহুদিন তো কাটল অন্ধতায়, এবার যেন সেই দৃষ্টি ফিরে পান তিনি। মুহূর্তে, এক উজ্জ্বল আলোর ঝলক তাঁর জীবনে ঢুকে যায়। অতল গহ্বর আর দূরের দিগন্ত যেন চোখে পড়ে। আর সে আলো এমনই স্বচ্ছ যে প্রতিটি নতুন ছবি কাঁপতে থাকে এক সচেতন, উপলব্ধ যন্ত্রণায়। সেই প্রদর্শনীর দ্রুত বদলে উন্মোচিত হয় জীবনে অবিচারের নানা ধরন।

বাস্তবতার এই উপলব্ধিতে, লিয়ার এমন আবেগ সঞ্চারিত করেন যে, সেই বোধের উদ্দীপিত অসহ্য চাপ তাঁর মনকে দুর্বল করে তোলে। তারা আঘাত হানে, মারে, পোড়ায়। যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে ওঠে। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব চিরে সেই বেদনা। তাই লিয়ারের আর্তনাদ, "I am cut to the brains

কর্ডেলিয়ার তাঁবুতে জেগে উঠবার পর, সবাইকে তিনি বলতে থাকেন তাঁকে না জাগাতে, যেন সেই স্বপ্ন থেকে উত্থানের মধ্যে তাঁর মনে হবে, কোনো "অগ্নিময় চক্রের" সঙ্গে তিনি লগ্ন। সেই মৃতপ্রায় মানুষটির সঙ্গে কাউকে কথা বলতে দেয় না কেন্ট। শব্দ তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে পারে। "এই কঠিন জীবনের ধ্বংস থেকে" তাঁকে ফেরাতে একজনকে তো হৃদয়হীন হতেই হবে।

বিচার আর পীড়নের রূপকে ট্র্যাজিডি পূর্ণ। জীবন যেন ধ্বংসস্তূপ, সেই বিপর্যয়ের মধ্যে শায়িত সেই ব্যক্তি যিনি একদিন আদেশ জারি করতেন।

ব্যক্তির হৃদয় গোটা মানব প্রজাতির দুঃখকে ধরতে পারে না। যেসব মানুষের অস্তিত্বের স্বপ্নও দেখেননি তাদের পালক, তাদের দুর্দশার বেদনায়, প্রতিটি স্পন্দনে, বুকের ভেতর এই ছোট হৃৎপিণ্ডটা সাড়া দেয়।

এইভাবে, ব্যক্তি আর মানব প্রজাতির মধ্যে এক বন্ধন গড়ে ওঠে, লক্ষ মানুষের বিপর্যয় আর নিজের দুঃখের ভেতর মিলনের এক আভাস। লিয়ার এটা উপলব্ধি করেন জীবনের প্রকৃত চেহারা দেখা হল তাঁর। উন্মাদনার ভেতর দিয়ে তিনি জ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

ধারাবাহিক

কলকাতার খবরের কাগজে পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গ্রামগুলোতে ডাইনী সন্দেহে হত্যা এবং এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে — এমন উত্তেজক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। এই খবরগুলোর মূল বক্তব্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের কুসংস্কারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। প্রধানত ডাইনী-ওঝার অলৌকিকতা ও কুসংস্কারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ডাইনীর অস্তিত্ব খোঁজা, এ দুটো কারণেই এই অনুসন্ধান

অযোধ্যা পাহাড়ে ডাইনী-সমস্যা

শুভাশিস মৈত্র

স্কেচ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

অযোধ্যা পাহাড়ের জঙ্গলের ভিতরে। এই সমস্ত পথেরই শেষে পাওয়া যাবে একটি করে সাঁওতাল গ্রাম। অযোধ্যা পাহাড়ের শহুরে বসতি অঞ্চল থেকে তার দূরত্ব দু'কিলোমিটার থেকে বারো কিলোমিটার। সাঁওতাল গ্রাম বলতে বোঝায় পাঁচ দশটি রঙ করা বাড়ির সমষ্টি (একটা দুটো বড় গ্রামের অস্তিত্বও অবশ্য এখানে পাওয়া যাবে) আর জাহেরা। জাহেরা ভিত্তি করেই মূলত গ্রাম গড়ে ওঠে। জাহেরা বলতে বোঝানো হয় কিছু প্রাচীন উঁচু গাছের ঝোপ। বিশ্বাস করা হয় এই জাহেরা ন'জন দেবতার বাসস্থান। এই দেবতারা — মারাং বুরু, ধর্ম, জাহেরাইও, গোসাই আইও, চাতর কুদরা, শাসন হাড়াম, মোরেকুতুরুইকো, রোঙ্গোবুড়ি, মাঝিজান। এরা কেউ করে গ্রামবাসীর শাসন পালন, কেউ করে দুষ্টের দমন, কারও কাছে অসুখ-বিসুখ নিবারণের অলৌকিক দক্ষতা। এমন প্রায় ৮০খানা গ্রামের ৮০০০ সাঁওতালের পাহাড় অযোধ্যা। এইসব অরণ্য-নির্ভর মানুষের গ্রামগুলোতে আজও রাজত্ব চলছে নানান জানা-অজানা দেব-দেবী ভূত আর ডাইনীর। এছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে মাঝে মাঝে কলকাতার খবরের কাগজে পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী গ্রামগুলোতে ডাইনী সন্দেহে হত্যা এবং এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে—এমন উত্তেজক খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। এই খবরগুলোর মূল বক্তব্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের কুসংস্কারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। প্রধানত ডাইনী-ওঝার অলৌকিকতা ও কুসংস্কারের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ডাইনীর অস্তিত্ব খোঁজা, এ দুটো কারণেই এই অনুসন্ধানটি চালানো হয়। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকা বলেই এবং শুধুই অরণ্য-নির্ভর সাঁওতালদের বসতি অঞ্চল বলেই পুরুলিয়া জেলার মানচিত্র খুলে অযোধ্যা পাহাড়কে আমরা বেছে নিলাম তদন্তের প্রাথমিক অঞ্চল।

অযোধ্যা পাহাড়ে ঝর্ণার জল পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ... অঞ্চলে এই স্রোতকে বহাল নামে ডাকা হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে চলতে চলতে হঠাৎ এক ছোট উপত্যকা আর খোলা আকাশের নিচে এসে পড়েছি। এইখানে অরণ্য শেষ হয়ে বেশ কিছু দূর থেকে আবার তার শুরু। আমাদের সামনে আচমকা ঝর্ণা স্রোতের বহাল, তার ওপারে ছোট্ট গ্রাম, পুনিয়া শাসন। এতক্ষণ বিলাপের সুরে যে গান ভেসে আসছিল হাওয়ায়, মনে হচ্ছিল তার উৎস দূরের কোনো গ্রাম, ভুল ভাঙল চাঁদের আলোয় দূরে ছায়া ছায়া চলমান কিছু মানুষ গান গেয়ে ঝর্ণা পেরোচ্ছে।

আমার সঙ্গে অ্যানথ্রপলজির তরুণ গবেষক ফাল্গুনী চক্রবর্তী পুনিয়াশাসন গ্রামে দীর্ঘদিন ও সাঁওতালদের ঘরের মানুষ হয়ে পড়ে আছে। ওর তর্জমায়, এই গানে বলা হচ্ছিল, 'অনেক দূরের হাট থেকে আমরা ফিরছি, বড়দি, আমরা ঝিরি ঝিরি ঝর্ণার কাছে চলে এলাম, এখন গ্রীষ্মকাল, সহজেই আমরা পেরিয়ে যাব এই বহাল, আর পেয়ে যাব আমাদের পরিচিত মানুষ আর ঘরগুলো......।'

গ্রামে পৌঁছে ডাইনী বিষয়ে প্রশ্ন করতে প্রথমেই ধাক্কা খেলাম। দুর্বোধ্য ভাষায় এক সাঁওতাল তরুণ যা বলল, তা শুনতে অনেকটা এরকম—'আমদো দিকু ইন্দো বাং বড়ায়া।' আমার মুখের ভাবে সম্ভবত না বোঝার ছাপ পড়েছিল, ফলে সে আবার স্থানীয় চলতি বাংলায় বলল 'তুরা দিকু আছিস, তুদের নাহি বুলব।' তবে এ বাধা কাটাতে তেমন সময় লাগেনি। যদিও সে রাতে গ্রামের ভাদু মুর্মুর বিয়েতে শালপাতায় হাড়িয়া চুমুক দিতে এতই ব্যস্ত তিন-চার বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত, যে-কেউই আর বেশিক্ষণ কথাই বলতে চায় না। ফলে, পরদিন সকালে আসব, এই ঠিক করে আমাদের ফেরার পথ ধরতে হল।

সাঁওতাল গ্রাম বুঝতে, জানা প্রয়োজন সাঁওতাল গ্রামের গঠন

বিন্যাস। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা আইন-কানুন ও জনজীবনের সঙ্গে ব্যবসায়িক বিনিময়ের কারণে সাঁওতালদের সামান্য যোগাযোগ থাকলেও, মূলত সাঁওতাল সমাজ চলে তাদের এক নিজস্ব শাসন পদ্ধতি অনুসারে। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে একদিকে থাকবে পূজা-মন্ত্র-তন্ত্র আর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী দু'জন পুরোহিত নায়েক হাড়াম আর কুড়ুম নায়েক, অন্যদিকে শাসন ব্যবস্থার মাথায় থাকবে মাঝি হাড়াম, ক্রমে ভদ্দ বুড়া (প্রাজ্ঞ জ্ঞানী) পরামাণিক এবং যোগ মাঝি। এছাড়া আছে গ্রামের গণতান্ত্রিক সংগঠন 'ষোলআনা'। ষোলআনা তৈরি হবে মাঝি হাড়াম, নায়েক হাড়াম ইত্যাদি সহ প্রতিটি বাড়ির একজন করে পুরুষ সদস্যের সম্মেলনে। এইসব সাধারণ পুরুষ সদস্যদের পরিচয় 'নানিসানি' সাঁওতাল গ্রামের তাবৎ অভাব-অভিযোগের ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক এই ষোলআনা। এবং একঘরে হয়ে পড়ার ভয়ে ষোলআনার বিচারে সন্তুষ্ট না হলেও গ্রামের লোকজন প্রায় কখনোই শহরের পুলিস, সরকার বা আইন-আদালতের মুখোমুখি হয় না।

প্রাথমিকভাবে আমাদের হাতে দু'টো খবর ছিল। প্রথম, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কানাই মাণ্ডির স্ত্রীকে ডাইনী অভিযুক্ত করার। সে যে তার চার বছরের শিশুটির অলৌকিক মৃত্যুর কারণ, এটা গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। কানাই মাণ্ডির বৃদ্ধা মাকে পাওয়া গেল ঘরের পাশের গাছতলায়, হাতে তৈরি খাটিয়ায় শুয়ে। ভয়ঙ্কর রকম রিকেট-আক্রান্ত একটি মাস চারেকের শিশুকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত। আমাদের দেখে সেই বৃদ্ধা কাতরভাবে ওষুধ চাইল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরের তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে শিশুটির। কথায় কথায় জানা গেল কানাই মাণ্ডির স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান এটি। বৃদ্ধাকে কিছুতেই বোঝানো গেল না দু'মাস বয়সে মা-ছাড়া হওয়াই শিশুটির ভয়ঙ্কর রিকেটের কারণ। যদিও সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই বৃদ্ধা এটা বুঝতে পেরেছে যে শিশুটির মৃত্যু আসন্ন। তার কারণ হিসেবে সে বলল কানাই-এর স্ত্রী, গ্রামের মানুষ যাকে ডাইনী বলে গ্রামছাড়া করেছে, সেই ডাইনীই রক্ত

অনেক দূরের হাট থেকে
আমরা ফিরছি বড়দি,
আমরা ঝির ঝির ঝর্ণার কাছে চলে এলাম
এখন গ্রীষ্মকাল
সহজেই আমরা পেরিয়ে যাব এই বহাল
আর পেয়ে যাব আমাদের পরিচিত মানুষ
আর ঘরগুলো

শুষে নিচ্ছে এ শিশুটির শরীর থেকে প্রতিদিন। প্রথম সন্তানটি কিভাবে মারা গেল এ প্রশ্ন করতে উত্তেজিত জবাব এল, ' ও হি খাইল, টাটকাডাই মরি গেল, তু হি বল কেটা খাইল...... ?' বৃদ্ধার মুখ থেকে আরও জানা গেল, শিশুটিকে শেষ মুহূর্তে স্থানীয় লুথেরান ওয়ার্লর্ড সার্ভিস-এর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তাররা তার রোগ নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়। যদিও আমরা পরে খবর নিয়ে জেনেছি, শিশুটির মৃত্যুর কারণ এক বিশেষ ধরনের ম্যালেরিয়া।

কানাই-এর স্ত্রী যেহেতু ডাইনী হয়েছে, ফলে গ্রামের ষোলআনা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কানাইকে বার কুড়ি টাকা জরিমানা করেছিল। সব সময়ই এসব জরিমানার টাকায় ষোলআনার সদস্যরা রাত-দিন হাড়িয়া আর মহুয়া খেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ঝিম মেরে পড়ে থাকে। এমনকি কানাইও বাদ দেবে না নিজেকে এমন ফূর্তি থেকে। এর পরের ঘটনা কানাই তার স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মহা ধুমধামে নতুন বিয়ে করল। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার দোষে আবার বসল ষোলআনার সভা। জরিমানা ধার্য হল এগার শ টাকা। এর এক সামান্য অংশ পেল প্রথম স্ত্রী মুরগী আর ছাগল কেনার দাম বাবদ। বাকিটা দিয়ে চলল তিন দিন টানা হাড়িয়া উৎসব। সাধারণত এত বেশি টাকা জরিমানা করার রেওয়াজ সাঁওতালদের দরিদ্র গ্রামগুলোতে নেই। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সদস্য কানাই মাণ্ডি এই অস্বাভাবিক পরিমাণ টাকা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল তার উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে এমন ইঙ্গিত মিলেছে যে ষোলআনা জানতে পেরেছিল কানাই মাণ্ডি ও সরকারি তহবিলের কোনো গোপন সম্পর্কের সূত্র। তবে একটি বিষয়ে পরিষ্কার জানা গেল কানাই মাণ্ডির স্ত্রীকে ডাইনী করার পেছনে কোনোই রাজনীতি কাজ করেনি। গ্রামে কানাই মাণ্ডি ছাড়া আর কারও বামপন্থীর সমর্থক বলে পরিচিতি নেই। অর্থাৎ বামপন্থীদের চক্রান্ত নয়, এক্ষেত্রে একজন বামপন্থীর সমর্থকই আক্রান্ত। ষোলআনার বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে কথা বলে তাদের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভাবনার সামান্য আভাসও পাওয়া যায়নি।

অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ সম্ভব হল না কানাই মাণ্ডির প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে। সে গেছে দূরের জঙ্গলে ঠিকাদারের কাঠ কাটতে। তার বৃদ্ধা মা'র সঙ্গে এরকম কথা হল আমাদের

—তোমরা ষোলআনাকে বলনি তোমার মেয়ের কোনো দোষ নেই ?

—হামরা গরিব আছি বটে..... উহি সব বলল, উহি করল

—তোমার কি মনে হয় এটা ঠিক কাজ হয়েছে ?

—তুহি বুঝনা, এমোন একটা ঘর সুধানা যিখানে ছা নাই মইরচে......

—তুমি কি মেয়ের আবার বিয়ে দেবে ?

—দিব নাই কেনে কুটুম লাইগল্যেই দিব।

—ওরতো ডাইনী নাম হয়েছে, অন্য কেউ ওকে বিয়ে করবে ?

বৃদ্ধা হাতের পাতার উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে নিল, উত্তর দিল না।

অন্য ঘটনাটি সাম্প্রতিককালের। গ্রামের দু'তিনটে গরু-মোষ হঠাৎ মরে যাবার পর, কালোমণির বৃদ্ধা মা'কে ডাইনী অভিযুক্ত করা হল। তার উপর চালানো হল অত্যাচার। জরিমানা হল একশ টাকা। ওঝা, মন্ত্র-তন্ত্র, মুরগী, হাড়িয়া সহযোগে চলল পূজা এবং উৎসব। রোগমুক্ত হল গ্রাম। আমাদের প্রথমেই ধারণা হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ ধরনের মড়কই গরু-মোষের মৃত্যুর কারণ। প্রশ্ন করতে করতে জানা গেল, কয়েকটি গরু-মোষ মরার পরই শহরের ডাক্তার এসে গরু-মোষকে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরে বাগমুণ্ডি থানার বি·ডি·ও'র সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি আমাদের জানালেন, তাঁর ওখান থেকেই ডাক্তার পাঠানো হয়েছিল গ্রামের সমস্ত গরু-মোষকে এইচ·এস· ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশন দেবার জন্য, যার ফলে মড়ক ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তীব্রভাবে। কিন্তু গ্রামবাসী বিশ্বাস করে না মড়ক থেকে মুক্তির কারণ ভ্যাকসিন। ওঝার ঝাড়ফুঁক আর গ্রাম থেকে ডাইনী তাড়িয়েই গরু-মোষগুলোকে তারা বাঁচিয়েছে, এটাই তাদের গভীর বিশ্বাস।

অনুসন্ধানে একথা জানা গেছে কালোমণির বৃদ্ধা মা বা তার পরিবারের কেউই কোনোদিন কোনোরকম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

॥ যে ভাবে ডাইনী আবিষ্কৃত হয় ॥

পশুর মৃত্যু, অসুখ-বিসুখ, ফসলের ক্ষতি, শিশুর মৃত্যু, এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাঁওতাল সমাজের উদ্ধার-কর্তা হল ওঝা। এইসব ওঝারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামান্য আয়ুর্বেদের জ্ঞান রাখে, এবং দু'এক জন ওঝার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা সাধারণ সাঁওতালদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, এমনকি ব্যক্তিগতভাবে তারা অনেকে ভূত-অপদেবতায় বিশ্বাসও করে না। যদিও এর উপর নির্ভর করেই চলছে তাদের বংশানুক্রমিক পেশা। ওঝার আয়ুর্বেদের জ্ঞানটুকু যখন ব্যর্থ হল, মৃত্যু বা অসুখ-বিসুখ ঠেকাতে তখনই ওঝার স্বাভাবিক বিধান হল গ্রামের কেউ ডাইনী হয়েছে এবং এসব ঘটনা তারই কীর্তি। মজার ব্যাপার হল ডাইনীর নাম ওঝা কখনই বলে দেবে না। তার জন্য এবার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যার বাড়ির গরু বা শিশুর মৃত্যু হয়েছে, বা অসুস্থ হয়েছে বাড়ির কেউ সে যোলআনাকে বাইসম দেবে। অর্থাৎ হাড়িয়ার দাম। এরপর বসবে যোলআনার জরুরী সভা। এখানেই ঠিক হবে তারা কোন বড় গুনিনের কাছে বা সখার কাছে যাবে ডাইনীর নাম জানতে। এইসব সখা বা গুনিনের সংখ্যা ওঝাদের তুলনায় অনেক কম, ফলে দেড় দিন, দু'দিন ধরে পায়ে হেঁটে বা কখনও বাসে চেপে গ্রামবাসী গিয়ে পৌঁছুবে সখার বাড়ি। সখারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ-সাঁওতাল, এমনকি অনেকে আদিবাসীও নয়। আর যে জিনিসটা গ্রামবাসীদের অবাক করে দেয় এবং সখাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় তারা, তাহল, এত দূরের একজন সখা কেমন করে মন্ত্রে এক অচেনা-অদেখা গ্রামকে নিয়ে আসে তার নখদর্পণে। এক সাঁওতাল যুবক তো চোখে-মুখে ভয়ানক বিস্ময় প্রকাশ করে আমাদের বোঝাতে শুরু করল—'সখাই বলে দিবে ডাইনের নামটা কি আছে, কটা বেটা-বিটি আছে তার, কটা মোষ আছে।' দীর্ঘকাল ধরে একই অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে এইসব সখারা এবং প্রথমত এরা সাধারণ আদিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, দ্বিতীয়ত তারা কাছে-দূরের বিভিন্ন গ্রামের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় তথ্যপঞ্জি যেকোনো মুহূর্তে কাজে লাগাবার মতো করে মনে রেখে দিতে সক্ষম। এসমস্ত কাজে তারা যে কিছু এজেন্টকে ব্যবহার করে না একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। প্রধানত দুটো কারণে উপরের যুক্তিগুলো মেনে নিওয়া যেতে পারে।

যদিও সখাদের কাছে মন্ত্র-তন্ত্র অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করবার বিষয়, কিন্তু জিলিংটার গ্রামের এক ভূমিজ আদিবাসী যে প্রথম জীবনে সখা হবার চেষ্টায় এক প্রতিষ্ঠিত সখার শিষ্যত্ব নিয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনে সে একাজ ছেড়ে দেয়, তার থেকে আমরা এই সব মন্ত্র যোগাড় করেছি, যার অলৌকিকতায় আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করলেও, আসলে তা ভাঙাচোরা বাংলায় কিছু সাদামাটা কথামাত্র। নিচের দু'টো এধরণের মন্ত্র থেকে তা বোঝা যাবে।

(ক) আগুই আগুই গুরু যায়
গুরুর চেলা আমি যায়
আমার গাটি লোহার বাঁধা
সব লোককে লাগুক ধান্দা
লাগ লাগ লাগ শিল পাথ্র জুড়ে লাগ
ডান চালায় যুগিন চালায়
শিক্ষাগুরুর মাথা খায়
আমকার জিউ আমকার জিউ
আমকার ঠিনকে আয়
অন্য জিউ আছিস তো ফাটিয়ে
পালাইন যা
দোহাই বড় বাবা বীর নর শিং গুরুর
রাজা ভোজের দোহাই ॥

(খ) এতদ চুড়ি বিতদ চুড়ি
চামের চুড়ি চাঁই
আগে আগে বন্ধি তো খাপরে পড়িস
এ বান্ধন লড়ি চড়িস তো মা কালিকে
খাপরে পুরিস ॥

দ্বিতীয় কারণটি আরও মজার। এটা নিয়ম হিসেবে প্রচলিত যে, সখা যার নাম ডাইনী হিসেবে বলে দেবে, তার বাড়ির লোক ইচ্ছে করলে এর বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে। এই পদ্ধতির নাম একেররামা। একেররামা করতে হলে ঐ বাড়ির লোকজন যোলআনাকে আবার বাইসম দেবে, আবার হাড়িয়া খাওয়া হবে, এরপর যাওয়া হবে অন্য কোনো সখার কাছে এবং এক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ই দেখা যাবে নতুন সখা নতুন ডাইনীর নাম বলছে। যদিও একেররামা বেশিরভাগ সময়ই মূলত আর্থিক অক্ষমতার জন্যই করা হয় না এবং পুরুষরা প্রায় সব সময়ই বাড়ির বৌ বা বৃদ্ধাটির ডাইনী অপবাদ নির্বিবাদে মেনে নেয়, এমনকি বিশ্বাসও করে ফেলে।

ডাইনী বলতে সাঁওতালরা বোঝে, কেউ তার আত্মাকে অপদেবতার কাছে উৎসর্গ করেছে, এবং মৃত শিশু আর পশুগুলো সে যোগান দিচ্ছে অপদেবতাকে তার খাদ্য হিসেবে। এই অপদেবতার নামটিও সখা বলে দেবে এবং অপদেবতার ক্ষমতা অনুসারে একটি জরিমানাও নির্দিষ্ট করে দেবে সখা, যা দিতে হবে ঐ পরিবারের পুরুষদের। এর পরিমাণ সাধারণত একশ টাকার কাছাকাছি হয়ে থাকে। প্রধানত অরণ্য-নির্ভর ভয়ঙ্কর দরিদ্র এই মানুষগুলোর কাছে যা প্রায় মৃত্যুদণ্ডের সামিল। জরিমানার পঁচিশ শতাংশ প্রাপ্য সখার বাকি টাকা নেবে যোলআনা।

ডাইনী বা অপদেবতার নাম জেনে ঘরে ফেরার পরের কাজ ওঝার। অসুস্থ শিশু বা রোগাক্রান্ত পশু, যারা শিকার হয়েছে অপদেবতার, তাদের অপদেবতা-মুক্ত করবার জন্য এবারে শুরু হয় ওঝার ক্রিয়াকাণ্ড। এসব বিষয়ে আদিবাসী মানুষের বিশ্বাস এমনই অদ্ভুত যে তাদের ন্যূনতম যুক্তিবোধকেও তারা এসব ঘটনার পেছনে ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক। যেমন গ্রামের অনেকেই আমাদের বলেছে অসুস্থ রোগীর বিছানার তলায় হলুদের গুঁড়ো রেখে দিলে রোগী ছটফট করতে করতে ডাইনীর নাম বলে দেবে, বা রোগীর খাবারের থালার নিচে অশ্বত্থ পাতা রেখে দিলে অপদেবতা-আক্রান্ত রোগী খাবারে হাত ছোঁয়াতে পারবে না। অথচ যখন আমরা তাদের প্রশ্ন করেছি তারা নিজেরা এগুলো দেখেছে কিনা, তাদের একটাই উত্তর, আমরা জানি এরকম হয়।

॥ ভূত তাড়ানোর যুদ্ধে ওঝা ॥

ওঝার ভূত তাড়ানো আসলে ভূতের লড়াই। ওঝাকে বলা যেতে পারে কাল্পনিক ভূতের রাজা। যেকোনো ওঝারই নিজের দখলে থাকতে হবে বেশ কিছু পোষা ভূত। যেগুলো দিয়ে সে উৎখাত করবে অপদেবতাকে। এমন গোটা দশেক ভূত পুঁজি করেই ওঝার ব্যবসা। ওঝার ভূতের নাম হবে—মারাংবুরু, লঘুবুরু, নসিংবুরু, ধর্মবুরু, জাহের এরা, কামার বুরু। লক্ষ্যণীয় জাহেরার দেবতাদের সঙ্গে এসব নামের মিল পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে অপদেবতা বা ডাইনীর ভূতেদের নাম হয়ে থাকে, ডাইন কুদরা, রাঙ্গাহাড়ি, বিশাইচণ্ডি, রাডিএরারের বোঙ্গা ইত্যাদি। ওঝার ভূত তাড়ানোর অনুষ্ঠান, যার স্থানীয় নাম নিমছা-নিমছি বা উলিয়াপাতির জন্য বেছে নেওয়া হবে গ্রামের বাইরের কোনো উই ঢিবি বা বুনুম, এবং ওঝার এই কাল যাদুবিদ্যার অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হবে চালের গুঁড়ো, জ্যান্ত কাঁকড়া, বড় গিরগিটি, অশ্বত্থ, বট, ভেলা, বাঁদু ইত্যাদি একুশ ধরনের একুশটি গাছের পাতায় গাঁথা একটি পাতার থালা এবং অপদেবতা অনুসারে নির্দিষ্ট রঙ-এর একটি মুরগী যার স্থানীয় নাম রং অনুযায়ী অড়াসিম, পুরসিম, হেদোসিম, বা কাবরা সিম। এরপর রোগীর শরীরের একুশটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে (কপাল, পিঠ, জংঘা....) তীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটিয়ে বার করে নেওয়া হবে টাটকা রক্ত, একুশটি রক্তের ধারা তার শরীর বেয়ে নামবে। চালের গুঁড়োর সঙ্গে মেশানো হবে রক্ত, রোগীর বাড়ির উনুনের মাটি আর কাঠ কয়লা, এরপর জলে গুলে পাতার থালায় আঁকা হবে অদ্ভুত ছবি। তার উপর বসানো থাকবে মুরগী, রাত্রির অন্ধকারে শুরু হবে মন্ত্র উচ্চারণ, কখনও কখনও রোগীর উপর চলবে শারীরিক অত্যাচার।

॥ অযোধ্যা পাহাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলের কিছু সখা ও ওঝার ঠিকানা ॥

নাম	গ্রাম
গুরুয়া সোরেন	খেরঘুটু
জোলান হেমব্রম	ছাতনি
বাজু মুর্মু	চিরুগোরা
গৌর হাজরা	জামঘুটু
হাগরু টুডু	শুষান
রামনাথ কুমার	বীরগ্রাম
নন্দ মাঝি	বাগমুণ্ডি
বিষ্টুপদ কুমার	বাগমুণ্ডি
নাপতাণী সখাইন (অঞ্চলের সব থেকে নামী সখা)	জোড়ডি

সুতপা ভট্টাচার্য

কাজ করবার অধিকার

"সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, 'কী বললি!' বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।"

রবীন্দ্রনাথের কলমে এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্ভবত অদ্বিতীয়, আর কিছুটা অভাবনীয়ও। অভাবনীয় শুধু নিরাবরণ নির্মমতার কারণেই নয়, সমাজবিন্যাসে শোষক-শোষিতের সম্বন্ধ-সূত্র ধরে যেভাবে ঘনিয়ে ওঠে এ হত্যাকাণ্ড, তাও তো রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরলই। আকস্মিক একটি খুনের পিছনের পটভূমি ইঙ্গিতময়তায় বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ উপরের উদ্ধৃতিতে। দুখিরামের সারাদিনের "শ্রান্তি আর লাঞ্ছনার" কারণ জমিদারের জবরদস্তি, শুধু উপযুক্ত মজুরী থেকেই নয়, উপযুক্ত খাবার থেকেও বঞ্চনা। এসব তার কাছে 'একেবারেই অসহ্য হয়ে' ওঠেনি, জমিদারের হাত থেকে এসব লাঞ্ছনা দুখিরামের মতো মানুষ প্রাপ্য বলেই মেনে নেয়। অসহ্য লেগেছিল তার গৃহিণীর 'শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ', গৃহিণীর কাছে ভাত চেয়ে তাকে শুনতে হয়েছিল—'আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।'—কথাটির শ্লেষ এতটাই কুৎসিত, যার উত্তরে প্রাণঘাতী আঘাত হানতে পারে স্বামী স্ত্রীর উপর, কেননা দুখিরামের সমাজে মেয়েমানুষের রোজগারের একটিই মাত্র পন্থা আছে, তাহল সনাতন দেহব্যবসায়। 'শাস্তি' গল্পে দুখিরামের স্ত্রী অবশ্য প্রথম বলি, আর কিছুটা গৌণও, গল্পের নায়িকা দুখিরামের ভ্রাতৃবধূ চন্দরা, গল্পের দ্বিতীয় বলি, মুখ্য। তার স্বামী তার উপর না-ভেবে-চিন্তেই খুনের দায় চাপিয়ে দিতে পারে, কেননা "বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" স্তম্ভিত চন্দরার "সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল"—সে চেষ্টায় ফাঁসিকাঠকে বরণ করে নিতেও তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই! শোষিত শ্রমিক তার পরিবারের সীমায় এসে কিভাবে শোষকের শ্রেণী-চরিত্র প্রকাশ করে, এঙ্গেলস্-এর মতো রবীন্দ্রনাথও সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। স্ত্রী-ঘাতী দুখিরাম-ছিদাম যে কোর্ফা প্রজা, তারা শোষিত হয় দুই দফায়—জমিদারের হাতে তো বটেই, আবার তাদের সরাসরি মালিক রামলোচনের হাতেও—রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই তা নির্মাণ করেছেন বলে মনে হয়।

'গল্পগুচ্ছ'র অন্য একটি গল্পেও স্বামীর হাতে স্ত্রী-হত্যার নিদর্শন আছে, সে গল্পের চরিত্রখানি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, তাই খুন অনেক কৌশলের, সে খুনের জন্য কাউকে ফাঁসিকাঠে যেতে হয় না, এমনকি তুচ্ছ কোনো প্রতিবাদকেও সামাজিকভাবেই চাপা দেওয়া হয়, কেননা খুনী যে পয়সাওয়ালা লোক। 'দিদি' নামে এ গল্পটির বলি শশিকলা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছিল—"যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত", "সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ"। সেই স্বার্থের ফাঁদ থেকে তার ছোটো ভাইটিকে বাঁচাতে চেয়েই দিদিকে প্রাণ দিতে হল নিজের স্বামীরই হাতে! বাংলার গ্রাম সমাজে আপন পরিবার-সীমাতে মেয়েদের চরম নিরাপত্তাহীনতা বুঝে নেওয়ার জন্য মাত্র এই দুটি গল্পের ভয়াবহতাই যথেষ্ট। অথচ নিরাপত্তার জন্যই তো বিবাহ, যার জন্য মেয়ের বাবাকে হতে হয় সর্বস্বান্ত কখনো বা, চন্দরার বাবা মরবার সময় এই বলেই না নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন "যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম"। কিন্তু সংসার যেখানে স্বার্থের ফাঁদ, সেখানে নিরাপত্তা শুধু তারই আছে, যার আছে টাকা, আর বাংলার গ্রামে (একেবারে নিচুতলার সর্বস্বান্ত সমাজ ছাড়া) মেয়েদের উপার্জনের কোনো পথই নেই!

এসব গল্প লেখা হয়েছে প্রায় একশো বছর আগে, অবস্থার আজ কি বদল হল কিছু? আইনগতভাবে অন্তত স্বাধীন ভারতে মেয়েরা পেয়েছে সম্পত্তির অধিকার, কিন্তু কাজ করবার অধিকার পাওয়া দূরের কথা, মানাও কি হয়? বেকার সমস্যার পরিসংখ্যানে বেকার মেয়েদের কথা ভাবা হয় কতটা? অথচ কাজ কি করে না মেয়েরা? শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল মধ্যবিত্ত গ্রামীণ সমাজের কথা ধরা যায়, তবে দেখব কাজ করে সেখানে মেয়েরাই। 'গল্পগুচ্ছ' থেকে দেওয়া যায় তার ছবি "চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে......"। কঠিন শ্রম দেয় মেয়েরা, কিন্তু উপার্জন করে না। তারা কাজ করে অধীনতার মধ্যে, স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার তাদের নেই। উপার্জনহীন এক বৃত্তি আছে মেয়েদের, যার নাম 'গৃহবধূ' জনগণনার ভাষায়। গৃহবধূর শ্রমশক্তি গৃহকর্তাকে বৃহত্তর জগতের উৎপাদনমূলক কাজ করতে সহায়তা করে, সেদিক থেকে তা অর্থনীতির উপাদান ঠিকই, একইভাবে গৃহপালিত গরু বা ঘোড়াও অর্থনীতির উপাদান, আর গরু বা ঘোড়ার মতোই গৃহবধূর কাজেও নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অবান্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সোনার চেয়ে দামী" উপন্যাসের নায়ক তার স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করছে এই ভাষায় "আমি রোজগার করে তোমায় খাওয়াই পরাই, আমার ভাড়া করা ঘরে থাকতে দিই,—আমি তোমার মালিক বৈকি! খোকনকে খাঁটি দুধ খাওয়ানোর জন্য একটা গোরু কিনে পুষলে আমি তারও

মালিক হতাম। তাই বলে আমি কি তোমাকে আর গোরুটাকে সমান করে দিতাম ? আমার সম্পত্তি হলেও তোমাকে মানুষ ভাবতাম না ?" এই নায়কই অবশ্য উপন্যাসের শেষে স্পষ্টভাবেই, অনুরাগের সঙ্গেই জানাতে পারে স্ত্রীকে "আমি রোজগার করি, তুমি ঘরে বসে খাও—এজন্য কিছুটা ফাঁকি থাকবেই আমাদের সম্পর্কে—সব দিক দিয়ে তোমাকে আমার সমান মানুষ আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না।" এসব উক্তিতে স্ত্রী যে শ্রমটা দিচ্ছে, তার উল্লেখই নেই কোনো ! এইভাবেই গৃহবধূর শ্রমশক্তি অর্থকরী নয় বলেই সমাজের চোখে অনুপস্থিত। অর্থকরী কাজ করছেও অবশ্য মেয়েরা, অনেকদিন ধরেই। শহরে মধ্যবিত্ত সমাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই মেয়েদের উপার্জনশীলতা মেনে নিয়েছে। স্বেচ্ছায় নয়, অর্থনৈতিক চাপে, বাধ্য হয়ে। কাজ করছে মেয়েরা, তবু কাজ করবার অধিকার অবারিত নয় তাদেরও। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন চাপ সে অধিকারকে সীমিত করতে চায়।

মেয়েরা যে পুরুষের থেকে মানুষ হিসেবে হীন—এই ধারণাই একটা প্রধান বাধা সৃষ্টি করে মেয়েদের কাজে। এই ধারণার কোনোভাবে যদি ব্যত্যয় ঘটায় বাড়ির বৌ-এর কাজ, তবে সংসারে অবধারিতভাবেই নেমে আসবে অশান্তি। যতক্ষণ বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর থেকে কম সামর্থ্য দেখাবে কাজে, ততক্ষণই শান্তির সংসার। কিন্তু যদি শুধু অর্থ-সামর্থ্যের দিক থেকেও স্ত্রী স্বামীর থেকে এগিয়ে যায় কখনো, যদি কখনো স্ত্রী হয় সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল, তখনই স্বামীর পৌরুষ আহত ! কিংবা যে মেয়ে বিশেষ কোনো দিকে বিশেষভাবে প্রতিভাবান, স্বামীরও যদি সমতুল কোনো প্রতিভা বা বিশেষ কাজে দক্ষতা না থাকে, তার পক্ষেও সুখী বিবাহিত জীবন পাওয়া অসম্ভব। তাই, সুখ পেতে চেয়ে, ভালোবাসতে চেয়ে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজের সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটাবার কোনো প্রয়াসই করে না। 'গল্পগুচ্ছ'-র 'দর্পহরণ' নামে গল্পটির কথা মনে পড়ে। এ গল্পের নায়িকা নির্ঝরিণীর বাংলা ভাষায় অধিকার তার স্বামীর মনে কিছুটা গর্ব বা আনন্দের ভাব জাগালেও বিপরীত ভাবটাই ছিল প্রধান। তাই স্ত্রীর কবিত্বশক্তির প্রশংসায় আত্মীয়বর্গ যখন পঞ্চমুখ, তখন স্বামী বলেন "তখন ইংরেজি সাহিত্যের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমার স্ত্রীর প্রতিভাকে কি ম্লান করি নাই। স্ত্রীলোকের কমনীয়তার পক্ষে এই একটু ছায়ার আচ্ছাদন দরকার, বাবা এবং বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিতেন না—কাজেই আমাকে এই কঠোর কর্তব্যের ভার লইতে হইয়াছিল। নিশীথের চন্দ্র মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো হইয়া উঠিলে দুই দণ্ড বাহবা দেওয়া চলে, কিন্তু তাহার পরে ভাবিতে হয়, ওটাকে ঢাকা দেওয়া যায় কী উপায়ে।" উপায় অবশ্য স্বামীকে শেষ পর্যন্ত আর খুঁজতে হয় না, গল্প-প্রতিযোগিতায় স্বামীকে হারিয়ে প্রথম স্থান পেয়ে অপরাধিনী স্ত্রী রান্নার উনুনে লেখার খাতার চিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এইটেই স্ত্রীর যথাযথ কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন কি ?

মেয়েদের কাজ করবার অধিকারের দ্বিতীয় সীমা তার ভূমিকা পালন। যুগ যুগ ধরে সমাজ পৃথক ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে নারী-পুরুষের জন্য। ঘরের কাজ মেয়ের আর বাইরের কাজ পুরুষের—এই হল নির্দিষ্ট ভূমিকার নির্দিষ্ট কাজ। বিংশ শতাব্দী যদি মেয়েদের নিয়ে আসতে পারে নির্দিষ্ট ভূমিকার বাইরে, তবে পুরুষই বা নির্দিষ্ট ভূমিকায় শুধু থাকবে কেন ? মেয়েদের যদি বাইরের কাজ করাতে সম্মানহানি না হয়, তবে পুরুষের ঘরের কাজ করতেই বা সম্মানহানি হবার কী কারণ থাকতে পারে ? কিন্তু আছে বৈ কি কারণ ! মেয়েরা যে মানুষ হিসেবে হীন ! কাজেই মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কাজেও তো কোনো কৌলীন্য থাকতে পারে না। হাতের কাজ, গায়ে খাটার কাজ করবে গরিব মানুষ আর মেয়ে মানুষ। অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পুরুষ মানুষকে কি সেসব কাজ সাজে ! তাই উঁচুদরের বুদ্ধিজীবী 'জনতা স্টোভ জ্বালতে পারি না' বলেন গৌরবের সঙ্গে, যদিও সাধারণ শিক্ষিত মেয়ে ফিউজ তার বদলাতে না জানলে লজ্জা পায়। অগত্যা চাকরির জন্য যত ঘন্টা শ্রমই দিতে হোক না কোনো মেয়েকে, বাড়ি ফিরে বাড়ির কাজ তো তাকে করতেই হবে। খেতে দিতে হবে কচিটিকে, লালন করতে হবে কচি থেকে ধাড়ি সব কটিকেই। বাইরের কাজ ধরলে মেয়েদের কাজের তাহলে এই তিন ভূমিকা। এ যেন একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। মেয়েরা এ নিয়ে প্রশ্নও তোলে না। এ ব্যবস্থা শুধু তো আমাদের দেশেই নয়। সোভিয়েত দেশ, যে দেশে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে, সমাজ ব্যবস্থায় সর্বত্র মেয়েদের সমান অধিকার স্বীকৃত, সেই দেশের এক মহিলাকে বলতে শুনেছি তাঁকে খাটতে হয় দিনে চোদ্দ ঘন্টা। বাইরের আট ঘন্টা কাজের পর বাড়ি এসে যখন তাঁর স্বামী টি· ভি· দেখেন, তখন, বাকি ছ'ঘন্টা তাঁকে দিতে হয় ঘরে কাজের জন্য। শুধু সোভিয়েত দেশই নয় অবশ্য, বিবিধ সমীক্ষায় দেখা গেছে, পশ্চিমের যে কোনো শহরেই মেয়েদের বিশ্রামের সময় কম, বিনোদনের সময় কম। কেননা মায়ের ভূমিকার, স্ত্রীর ভূমিকার দায় আছে ; স্বামীর ভূমিকার, পিতার ভূমিকার কোনো দায় নেই। স্বামী বা পিতার ভূমিকায় পুরুষদের সমাজনির্দিষ্ট প্রধান কাজ—অর্থ উপার্জন। যখন পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় পুরো অর্থ স্বামী বা পিতা উপার্জন করে উঠতে পারছেন না, যখন স্ত্রী বা কন্যাকে উপার্জন করে সহায়তা করতে হচ্ছে, তখনও কিন্তু সন্তান-লালনে কোনো অবহেলা-জনিত সমস্যা দেখা দিলে সমাজ মা'কেই একমাত্র দোষী করবে, স্বামীর স্বাস্থ্য খারাপ হলে স্ত্রীকেই একমাত্র দোষী করবে, যদিও তার বিপরীত কখনো নয়। সংসারের পুরো দায় একেবারে একা-একা যথাযথভাবে পালন করতে হয় যে মেয়েকে, স্বভাবতই তার কাজের জায়গায় যেভাবে যতটা কাজ সে দিতে চায় বা দেওয়া তার কর্তব্য—সেইখানে ফাঁক পড়ে। এর বিপরীত ঘটনা খুবই বিরল, কিন্তু যদি কখনো ঘটে, অর্থাৎ কাজের জায়গায় যথাযথ সময় দিতে চাইছে কোনো মেয়ে, হয়ত বা ভাবতে চাইছে নিজের কেরিয়ারের কথা আর তার ফলে সংসারের দায় পালনে পুরো মন দিতে পারছে না, তাহলে তার পরিপার্শ্ব তার বিষয়ে তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করবেই। এ বিরূপতা সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতা অধিকাংশ মেয়ের নেই বলেই হয়ত কাজের জায়গায় দক্ষ পুরুষের তুলনায় দক্ষ মহিলার সংখ্যা অনেক কম, এর থেকে তাই মেয়েদের কর্মক্ষমতার স্বাভাবিকহীনতা প্রমাণ করা যায় না। একথা অবশ্য ঠিক যে এখনো মেয়েরা নিজেরাও সাধারণভাবে ভূমিকা-পালনই জীবনের পরম কর্তব্য বলে মনে করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়ে তারা কাজের জগতে আসে বটে, কিন্তু পরিবারের সুখ সুবিধে যথাসম্ভব দেখাশোনা করেই তারা কাজ করতে চায়। যেখানে তা পারে, সেখানেই পরিবার বা সমাজে তারা মানিয়ে থাকে অনায়াসে। সেসব ক্ষেত্রে তাদের কাজ করবার অধিকার কতটা সীমায়িত, সে বিষয়ে স্পষ্ট সচেতনতা থাকে না তাদের। কিন্তু যদি কোনো মেয়ে কাজ করতে চায় নিজেরই তাগিদে, শুধুমাত্র জীবিকা-নির্বাহের দায়ে নয়, উচ্চাশার তাড়নায়ও হয়ত ততটা নয়, কাজ করতে চেয়ে নিজেকে খুঁজতে হয় স্ত্রী বা মায়ের ভূমিকার বাইরে, তাহলেই পরিপার্শ্বের সঙ্গে মানিয়ে চলা তার কঠিন হয়ে পড়ে।

কিন্তু শুধু ভূমিকা-পালনই নয়, তার কাজের অধিকারের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সীমা সেইখানে, যেখানে সমস্ত যোগ্যতা নিয়ে কাজ করেও মেয়েরা যৌন-বিষয়-মাত্রই থেকে যায়। যে মেয়ে সমস্ত পারিবারিক দায়িত্ব পালন করছে একা-একা তারও চরিত্র বিষয়ে জবাবদিহির দায় বড় কঠিন। অল্পদিন আগের 'একদিন প্রতিদিন' নামে চলচ্চিত্রটিতে বিষয়টি রূপ নিয়েছে। পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব প্রায় সবটাই বহন করে বাড়ির অবিবাহিতা বড় মেয়ে, রাতে সে বাড়ি ফিরছে না যতক্ষণ, অমঙ্গল-আশঙ্কায় বিহ্বল গোটা পরিবার, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে মেয়েটি ফিরে আসতে সেই পরিবারই সন্দেহে বিমুখ হয়ে ওঠে তার প্রতি। কর্মক্ষেত্রের বিশেষ কোনো আকস্মিক প্রয়োজনে বাড়ি-ফেরা সম্ভব না হতে পারে তার—কোনো অসুস্থ সহকর্মীর প্রতি কর্তব্য-পালনে, কিংবা কোনো আন্দোলনের জেরে। কিন্তু বাড়ির লোকে সেসব কিছু জানতেই চায় না, তাদের চোখে-মুখে, তাদের নীরবতায় শুধু অবিশ্বাস, আর বাড়িওয়ালা যেন গোটা সমাজের প্রতিনিধি হয়ে হুমকি দিতে নেমে আসে। বলা বাহুল্য, মেয়ের জায়গায় একটি ছেলে যদি একইভাবে বাড়ি ফিরতে না পারে, তাহলে অবশ্যই এজাতীয় প্রতিক্রিয়ার

প্রশ্ন ওঠে না।

মেয়েটির বাড়ি না ফেরার কারণ বিষয়ে 'একদিন প্রতিদিন' চলচ্চিত্রটিতে অবশ্য কোনো কথাই বলা হয়নি, অমলেন্দু চক্রবর্তীর মূল গল্প 'অবিরত চেনামুখ'-এ মেয়েটি তার পরিবারের অবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কারণ ভাবতে থাকে। তার ভাবনায় একথাও থাকে, উপরওয়ালার ইচ্ছানুসারে যদি তাকে দিতেই হয় সন্ধ্যা বা রাত, তাহলেই বা কী করার আছে, উপরওয়ালাকে খুশি না করে তো চাকরি রাখা যায় না, আর চাকরি গেলে খেতে পাবে না গোটা পরিবারই। অর্থাৎ শুধু যে পরিবারই ভুলতে পারে না মেয়েমানুষের মেয়েত্ব, তাই-ই নয়, তার কর্মক্ষেত্রেও নিয়তই তাকে যৌন-বিষয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো বিশেষ বৃত্তিতে মেয়েদের কাজের গুণাগুণ থেকে তাই বড় হয়ে ওঠে তার রূপ, সাজসজ্জা। নিজের নারীত্ব জাহির করা অপমানজনক মনে করে যে মেয়ে, তার পক্ষে এসব কাজে টিকে থাকাই কঠিন। একদিকে সুযোগ-সন্ধানী কামনালোলুপ হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা, অন্যদিকে সমাজ-পরিবারের অর্থহীন অবিশ্বাসের সঙ্গে বোঝাপড়া করা—এই দ্বিমুখী সংগ্রামের ভিতরে যে মেয়েকে কাজ করে যেতে হয়, সেই শুধু জানে কাজ করবার মানবিক অধিকার অর্জন করা কত কঠিন।

অথচ এ তো কোনো সুস্থ সামাজিক পরিবেশের চেহারা নয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক চেতনা না থাকার শূন্যতাই পূরণ হয়ে যায় বিকৃত যৌনচেতনা দিয়ে। এ সমাজের ব্যবস্থাবলী, একজন নারীবাদীর ভাষায় "It sexualizes our industrial relation and commercializes our sex relations." এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গোটা সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্যই প্রয়োজন। যতদিন মানুষ শুধু নিজের মজা-লোটার কথা ভাববে, অন্য মানুষের সম্মানের কথা ভেবে কাজ করবে না, ততদিন এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। যতদিন মেয়েরা কোনো না কোনো ভাবে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে, ততদিন এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। এ কথা ঠিক, মেয়েদের কাজ করবার অধিকার নিরঙ্কুশ হতে হলে বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন, আর আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে সেসব সহজে হবার নয়, তবু সেটাই সব নয়। আর্থিক, সামাজিক হাজার বঞ্চনার ভিতর দিয়ে মেয়েদের কাজ করা, মেয়েদের বাঁচা, সেসব বঞ্চনা সুযোগ খুঁজে নেয় মেয়েদের বিষয়ে যুগযুগান্তর ধরে বানিয়ে তোলা আদর্শাবলীর ভিতর দিয়ে, তাদের ভিতরকার ফাঁকিগুলি মেয়েরাই পারে ধরিয়ে দিতে। এর কোনো বিকল্প নেই। মেয়েদের প্রতি মুহূর্তের লড়াই এইখানেই। আগামী শতাব্দীর স্বপ্ন যদি চোখে থাকে আমাদের, তবে তার প্রস্তুতিও তো গড়ে তুলতে হবে ভিতরে ভিতরে, মেয়েদের এ লড়াই তারই অংশমাত্র।

জীবনযাপন — রণেন দাশ

খেলনার খেলা

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে একটা খেলনার দোকানে এক ভদ্রলোক খেলনা-বন্দুক খুঁজছিলেন। বোঝাই যাচ্ছিল, বাড়ির ছোটদের আব্দার। দোকানটা ফুটপাতেই, কিন্তু বড়। নানারকম রিভলবার, বন্দুকই দোকানি ভদ্রলোককে দেখাতে লাগলেন। কোনোটা টিনের—ক্যাপ দিয়ে ফাটানো যায়। কোনোটা আবার বেশ পাখিমারা বন্দুকের মতো—মাঝখানে ভাঙা যায়। মাথায় রবারের ক্যাপ বসানো। এটা দিয়ে ভালো টারগেট প্র্যাকটিস হতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের কোনোটাই পছন্দ নয়। বাড়ির ছেলেটি যে-রিভলবারের কথা বলে দিয়েছে, এর কোনোটাই তার সঙ্গে মিলছে না। অবশেষে দোকানি ভদ্রলোক বোধহয় কিছু অনুমান করলেন। তিনি একটি বাক্সের ভেতর হাত দিয়ে একটা প্রমাণ সাইজের রিভলবার বের করলেন। দেখতে ইস্পাত রঙের। ভারি। বড়সড়। ছোট-ছোট গুলিও আছে। দাম, দোকানি বললেন, পঞ্চাশ। কিন্তু হয়ত পঁয়তাল্লিশেই রফা হবে।

আমাদের দেশে এখন এই ধরনের জ্যান্ত খেলনা এসে গেছে। আগে এগুলো ইয়োরোপ-আমেরিকাতেই পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই আমাদের দেশের সব মানুষই এমন খেলনা কেনার মুরোদ রাখেন না। কিন্তু যাঁরা স্বচ্ছন্দেই রাখেন, বা, যাঁরা একটু কষ্ট করেও রাখেন, তাঁরা এখন এইসব খেলনার দিকেই ঝুঁকছেন। একটু মধ্যবিত্ত পরিবারের বাচ্চাদের জন্মদিনে একটা দুটো করে এসব খেলনা উপহার হিসেবে আসছে।

কলকাতা পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার পুলিসের মালগুদামে এ-রকম কিছু খেলনা-রিভলভার দেখালেন। এসব দিয়ে বেশ কিছু ছিনতাই হয়েছে। আমরা আর ক-জনই বা সত্যিকারের রিভলবার দেখেছি? তাই শ্যামবাজারের মোড় থেকে কেনা চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার রিভলভার লোক্যাল ট্রেনে বা নির্জন রাস্তায় বুকের কাছে উঠে এলে সেটাকে সত্যি বলে দ্রুত মেনে নেওয়াটাই নিরাপদ ঠেকে। কলকাতা পুলিসের সেই ডেপুটি কমিশনার বললেন, 'একটু সাহসী ছেলে, দলে পড়ে, একবার যদি এই রিভলভার দিয়ে একটা অ্যাকশান করে ফেলতে পারে, তারপর সে একটার পর একটা অ্যাকশান করতে চায়। আমরা যে কটি কেস গত ছ-মাসে ধরেছি তার শতকরা পঁচাশি ভাগই আসামীদের প্রথম ছিনতাই। বয়স গড়ে আঠারো থেকে বিশ। একটা কেসে তের বছরের একটি ছেলেও ছিল। তবে এইসব ছিনতাই বেশিরভাগই হয় ট্রেনে। রেলওয়ে পুলিস, কোনো ছিনতাই কেস ধরতে পারে না, কারণ ধরা অসম্ভব।'

অথচ, আমাদের খবরের কাগজে এসব খেলনার বিজ্ঞাপন বেশ বড়সড় ছবিসহ ছাপা হচ্ছে। তার একটা কারণ, ব্রিটেন ও আমেরিকায় এই ধরনের খেলনা বিক্রি ও বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আইন হয়েছে। তাই এখন এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোতে এইসব খেলনা রপ্তানি করা হচ্ছে।

ব্রিটেনে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো সরকারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকছে। ব্রিটেনের খেলনা-কোম্পানিগুলো বছরে বিক্রি করে বারোশ কোটি টাকার খেলনা। এরা বিজ্ঞাপনে খরচ করে চল্লিশ কোটি টাকা। এত টাকা ক্ষতি দিতে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো রাজি নয়। কিন্তু যদি ভারতের মতো বড় দেশে তারা এইসব খেলনা বেচার বাজার পেয়ে যায়, তাহলে নিজেদের দেশের সরকারের আইন মেনে নিতে তাদের আপত্তি নেই। শ্যামবাজারের ফুটপাতে আমাদের বাচ্চাদের জন্যে যখন খেলনা জমা হচ্ছে—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সেখানকার খেলনা ব্যবসাদারদের তখন আপস আলোচনা চলছে। □

শুলৎস্-এর ভারত সফর
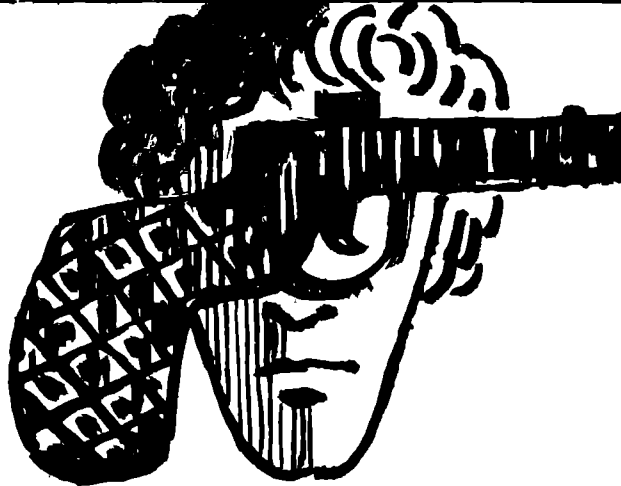
প্রায় ন'বছর আগে হেনরি কিসিংগার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। আমেরিকার ঝোঁক তখন পাকিস্তানের দিকে ছিল, যেমন এখনও আছে। এত দিন পরে সেই আমেরিকা থেকেই রোনাল্ড রেগানের রাষ্ট্রসচিব জর্জ শুলৎস্ যখন ভারতে এলেন, তখন চাঞ্চল্য হওয়া স্বাভাবিক। খুব যে একটা আশা ছিল তা নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ওয়াশিংটন সফরের পর একজন মার্কিনী সম্মাননীয় অতিথির সফরে দুই পক্ষের আচরণে ও সম্পর্কে উষ্ণ পরিবর্তন এবং কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের নিরসনের জন্য যেকোনো সচেতন মানুষই উন্মুখ থাকবেন।

শুলৎসের সফর হয়ে যাবার পর কিন্তু দেখা গেল, হাতে থাকল সামান্যই। আলোচনার পর কোনো যৌথ বিবৃতি আমরা পাইনি—এমন উচ্চপর্যায়ের মিটিঙের পর যা স্বাভাবিক ছিল। যেসব প্রসঙ্গে দুই দেশে মতানৈক্য, সে পার্থক্য রয়েই গেল, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বা উপমহাদেশে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনবার ব্যাপারে ভারতীয় উদ্যোগে কিন্তু জর্জ শুলৎসের মুখ থেকে আমরা কোনো মার্কিনী সাড়ার আভাস পাইনি।

যেমন প্রায় অঙ্কের মতো বলে দেওয়া যায় খালিস্তান আন্দোলন ও পুয়োর্টো রিকোর মুক্তি সংগ্রামকে এক করে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত বার্নসের মন্তব্য প্রত্যাহার বা সে প্রসঙ্গে দুঃখপ্রকাশ করা হয়নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরসিমা রাওকে শুলৎস্ বলেছেন, ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিই আমেরিকার কাম্য। কিন্তু প্রায় কোনো দ্ব্যর্থবোধ না রেখে, নরসিমা রাও-এর বিবৃতি থেকে জানা যায় যে শুলৎসের মন্তব্য শুধু তাঁরই মন্তব্য—অর্থাৎ ভারতবর্ষ অপেক্ষা করে দেখতে চায়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ· ডি· বি·) থেকে প্রাপ্য ২০০ কোটি টাকা ভারতবর্ষকে না দেবার জন্য মার্কিনী প্রচার চলছেই। আমেরিকার বক্তব্য ভারতবর্ষ এখন একটি উন্নত দেশ, তাই বাণিজ্যিক ঋণ সংগ্রহে ভারতবর্ষের অন্য সূত্র খোঁজা উচিত। এ· ডি· বি-র অত টাকা নেই,

শুলৎসের বক্তব্য থেকে এই মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সুরাহা হল না। এ· ডি· বি· ঋণের দাবিদার চীন দেশও। এই মুহূর্তে আমদানি-রপ্তানির (ব্যালান্স অব ট্রেড) ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ থেকে মার্কিনী আমদানি বৃদ্ধি বা শুল্ক প্রাচীর সরিয়ে নেবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

যেসব সাহায্য ভারতবর্ষ চেয়েছে, শুলৎস্ সেগুলো বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাসের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। আমরা জানি, বিশ্বপর্যায়ে যেকোনো আলোচনা-বিতর্কেই আমেরিকা বিমুখ। বিশ্ব আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সপ্তম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের দাবি সম্পর্কে মার্কিনী মত যা ছিল, শুলৎসের সফরের পরও তা একই আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কানকুন সম্মেলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা, উন্নয়নের জন্য সাহায্য বা সমদর্শী বাণিজ্যিক নীতি নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। উইলিয়মসবার্গ সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের কাছে ভারতবর্ষ উপেক্ষিত আর আংকটাড-ছয় (UNCTAD-VI) কোনোরকম সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই প্রায় শেষ হল। তাই শুলৎসের এই কূটনৈতিক ভ্রমণে কোনো সদর্থক উন্নতি হবে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে, এ ধারণা অমূলক।

আফগানিস্তান, কাম্পুচিয়া বা আসিয়ান (ASEAN—এসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ান নেশনস্) প্রসঙ্গেও শুলৎসের বক্তব্য আপসবিরোধী—রাজনৈতিক সমাধানের যুক্তিগ্রাহ্য নীতির পরিপন্থী তা।

তারাপুরের যন্ত্রাংশ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে 'সমাধান' আমরা শুলৎসের কাছ থেকে পেয়েছি—প্রধানত সে ঘোষণা একটা বিজ্ঞাপনের কায়দাই মাত্র। আমেরিকা তারাপুরের ব্যাপারে যে চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেনি, এ যেন তারই এক স্বীকৃতি, ভিন্ন কায়দায়। তারাপুর চুল্লীর জ্বালানি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল আমেরিকার। কিন্তু জ্বালানি সরবরাহের ঝামেলাটা আমেরিকা যেমন ফ্রান্সের ঘাড়ে চাপিয়েছে, তেমনি যন্ত্রাংশের ব্যাপারেও ভারতবর্ষকে অন্য দেশ থেকে খুঁজে নেবার স্বাধীনতা দিয়েছে, না-পেলে আমেরিকা যোগান দেবে এই স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে। এ ডামাডোলে তারাপুর থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চলতেই থাকুক এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটতির ফলে সেই অঞ্চলের শিল্পায়ন ব্যাহত থাকলেও শুলৎসের দেশের কোনো মাথাব্যথা থাকে না। এটাই কি তারাপুর সমস্যার প্রকৃত 'সমাধান'?

এফ-১৬ বিমানসহ যে সমস্ত অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র আমেরিকা দিচ্ছে পাকিস্তানকে, সেই নীতি পুনর্বিবেচনা করবার মতো কোনো ইঙ্গিত ভারত আদায় করতে পারেনি শুলৎসের কাছ থেকে। ভারত মহাসাগর বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের আহূত সম্মেলনে আমেরিকার অংশগ্রহণ বা দিয়েগো গার্সিয়াতে পারমাণবিক অস্ত্র ঘাঁটি তৈরি বন্ধের প্রসঙ্গেও শুলৎস্ নীরব।

টি· ও· ডব্লু· ক্ষেপণাস্ত্র, ১৫৫ মি·মি· হোয়াইৎসার, সি ১৩০ বিমান, মেশিনগান কেনার প্রস্তাব ভারত দিয়েছে আমেরিকাকে। কিন্তু আমেরিকা 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই না বলায় বিষয়টা ঝুলে আছে।

এর ভেতর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর ভেঙ্কটরামন সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়েছিলেন—বিশেষ ধরনের সামরিক সম্ভার সংগ্রহের অভিপ্রায়ে। তিনি একেবারে শূন্য হাতে ফিরে আসেননি। ঠিক কী তিনি পেয়েছেন, নির্দিষ্ট করে তা বলা সম্ভব না হলেও, মনে হয় রুশ এ· ডব্লু· এ· সি· এস· (সতর্কীকরণের সরঞ্জাম), টি· ইউ ১২৮ বিমান, মিগ-২৯ এবং মাটি-থেকে-শূন্যে ও শূন্য-থেকে-শূন্যে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র পাবার সম্ভাবনা বেশি। রাশিয়া আগেই মিগ-২৭ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারতকে, কিন্তু ভারত মিগ-২৭-এর চাইতেও উন্নত ধরনের বিমান চায়। তবে, ভেঙ্কটরামনের বিবৃতি থেকে মস্কো-সফরে তিনি যে অতৃপ্ত, সেরকম কোনো ধারণা হয় না। কিন্তু শুলৎসের ভারত সফরের পর কি আমরা সেরকম কোনো লাভের কথা মনে করতে পারি? বোধহয়, হযবরল-র ভাষায় 'হাতে থাকল পেনসিল' বলা যায়, যে পেনসিল দিয়ে দু'দেশের মতপার্থক্যের বিষয়গুলোই দাগ দেওয়া যায় শুধু

তাঁর 'নব হুল্লোড়'-এর জন্যে গগনেন্দ্রনাথ একবার এঁকেছিলেন একটা কার্টুন—'কবির আকাশ বিহার'। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শারদোৎসব শেষ হবার মুখে। সকলের যখন মন খারাপ সেই সময়ে খবর এল আজ রাত্রে সিনেমা। শান্তিনিকেতন থেকে আসা বালক অভিনেতাদের জন্যেই এই বিশেষ বন্দোবস্ত। বিলিয়ার্ড ঘরে সাদা পর্দা টাঙিয়ে ছবি দেখানো। আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ। তথ্যচিত্রের একটা টুকরো। রবীন্দ্রনাথ এরোপ্লেনে চড়ে ইংল্যাণ্ড থেকে যাচ্ছেন প্যারিসে। বালক দর্শকদের ভিতরে ছিলেন দুই চির-শিশু। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ। ঐ সিনেমা দেখার পরেই গগনেন্দ্রনাথ তুলি কালি নিয়ে বসে গেলেন কার্টুনে। রবীন্দ্রনাথ আকাশে উড়ছেন একটা চেয়ারে বসে। শিয়রে আধখানা চাঁদ। মাথায় পারসীক টুপি। দাড়ি উড়ছে। উড়ছে আলখাল্লা। এক্হাতে ধরে আছেন মাথার টুপি, যাতে হাওয়া না নেয় ছিনিয়ে। অন্য হাতে হাত-আয়নার মতো এক বীণা, কবিরাই শুধু বাজাতে পারে যা। আকাশময় নক্ষত্র। মাতাল পাখি-প্রজাপতির ভঙ্গিতে কবির ছাপানো বই অথবা লেখার খাতা। ফাউন্টেন পেন হয়েছে প্রজাপতির শরীর, বই-খাতার পাতা পাখনা। হাওয়ার তোড়ে কখন যেন কবির চোখ থেকে ছিটকে পড়েছিল তাঁর পাঁসনে। কলম-মুখো এক পাখি খপ্ করে জাপটে ধরেছে তার ফিতে। কবির মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। কাগজ-কলমের পাখি-প্রজাপতিদের যেন এই উড়ে-বেড়ানোতেই আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কার্টুন আঁকা হয়েছে আরো। স্বদেশে এবং বিদেশেও। কবিদের নিয়ে কার্টুন আঁকার বোধহয় আলাদা সুখ, কি লেখায়, কি রেখায়। কার্টুন-লাঞ্ছিত হয়েছেন পৃথিবীর সব কবিরাই নন শুধু, সব মহাকবিরাও। বাদ যাননি শেকসপীয়র, গ্যেটেও। বাদ যে যাননি তার প্রমাণ সঙ্গের ছবিটি। গ্যেটেকে নিয়ে কার্টুন। এইচ· ই· খোলার-এর আঁকা। ভূমণ্ডলের মতো একখানা মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। বুকে ঝুলছে সম্মানের সূর্য-সদৃশ পদক। বাঁ হাত নাটকীয় ভঙ্গিতে ছড়ানো। যখন ডিকটেশন দিতেন এইভাবেই ছড়িয়ে দিতেন হাত। তাঁর আঙুলগুলো ছিল ছোট। 'মোর লাইক এ ওয়র্ক-ম্যানস দ্যান দোজ অফ অ্যান অ্যারিস্টোক্রাট।' ডান হাতে কলম। লিখছেন। লিখতে লিখতে ভাবছেন। সমস্ত প্রেক্ষাপট অন্ধকার। যেন পৃথিবীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। মাথার উপরে পরীর মতো উড়ন্ত এক ঝাঁক নগ্ন নারী। একদিকে একটি। অন্যদিকে একাধিক। ঝাঁকের

নারীরা কলাদেবী বা মিউজ-এর দল। গ্যেটের ডানদিকের নারীটি 'ইটারনাল ফেমিনাইন'। ফাউস্টের পাঠকমাত্রেই মনে আছে সেই উজ্জ্বল পংক্তি, ইংরেজি অনুবাদে যা কখনো

> The Woman-soul
> leadeth us
> Upward and on !

কখনো বা—

> The eaternal womanly
> draws us above.

কলা-দেবী এবং চিরন্তনী নারী সকলেই তাঁর ললাটে চুম্বন রেখা এঁকে দিতে ব্যস্ত। প্রত্যেকেরই ঠোঁটে চুম্বনের অধীর আগ্রহ। পায়ের নিচে সারে সারে সাজানো গ্রন্থ অথবা গ্রন্থাবলী। অথবা এক একটি গ্রন্থ এখানে তাঁর এক একটি অনুরাগী-বিষয়েরই প্রতীক হয়ত। কোন বিষয়ে আগ্রহ-অনুরাগ ছিল না তাঁর, এমন প্রশ্ন তুললে বাচালেরও বোবা বনে যাওয়ার কথা। কবিতা, নাটক, রাজনীতি, প্রেম, প্রিভি কাউন্সিল এসব তো জানা কথা। আজানার অথবা কম-জানার দিকে রয়েছে তাঁর বিজ্ঞান-চর্চা। তিনি চর্চা করেছিলেন আলো এবং রঙের গতিবিধি নিয়ে। নিউটনের থিওরির পাল্টা মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রঙ নিয়ে আশ্চর্য তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যেমন

১।-সমস্ত রঙই ছুঁয়ে থাকে তার দু-প্রান্তের হলুদ আর নীলকে। হলুদে থাকে আলো। নীলে কিছুটা অন্ধকার।

২।-এ্যাকটিভ বা পজিটিভ এবং নেগেটিভ অথবা প্যাসিভ রঙেরও তালিকা তৈরি করেছিলেন তিনি। প্রথম পর্বে আছে ইয়েলো, অরেঞ্জ, ক্রোম ইয়েলো। দ্বিতীয় পর্বে নীল, লালচে নীল, নীলচে লাল।

৩।-শুদ্ধ লাল মর্যাদা, ডিগনিটি এবং সিরিয়াসনেসের প্রতীক। তাঁর মতে সমস্ত ভিন্ন রঙকে ঐকতানে বাঁধে লাল। রেড ইজ দা কালার অফ রয়্যালটি।

৪।-শুদ্ধ হলুদে তিনি পান মৃদু মাধুর্য এবং উজ্জ্বলতা।

৫।-নীল-'এ চার্মিং নাথিং।' শূণ্য এবং ঠাণ্ডা। কনভেইং এ কনট্রাডিকটরি সেনসেশান অফ স্টিমুলেশন এ্যান্ড রিপোজ।

মাত্র এক বছর আগে বাতিল হয়েছে তাঁর মেটামরফসিস সংক্রান্ত উদ্ভাবনী। তা সত্ত্বেও ম্যানফ্রেড আইগেন, কেমিস্ট্রিতে যাঁর নোবেল প্রাইজ, স্বীকার করেছেন যে তাঁরই ঐ আবিষ্কারের তাৎপর্য হারায়নি এখনো, এখনো তা নিয়ে চলতে পারে আলোচনা। জার্মানিতে প্রতি বছরই ঘুরে আসে তাঁর জন্মদিন। মেতে ওঠে দেশ তাঁকে নতুন করে বুঝে নেওয়ার জন্যে। গত বছর হয়ে গেছে দেশ জুড়ে উৎসব, তাঁর মৃত্যুর দেড়শো বছর পূর্তিতে। আরও গভীরতর অন্বেষন-অনুসন্ধানের শেষ নেই তবুও। 'Theater an Turm'-এর গবেষণার বিষয় 'গ্যেটে অ্যান্ড দা ওয়ার্কিং ক্লাস।' গত বছরে বেরিয়েছে দশ হাজার পাতার চোদ্দ ভল্যুম গ্রন্থাবলী। এ ছাড়া ছ' ভল্যুমের চিঠিপত্র, যা কবি লিখেছেন অথবা কবিকে লেখা-হয়েছে, সব মিলিয়ে। অন্য এক প্রকাশক সংস্থার বিরাট আয়োজন চলেছে গ্যেটের সাত ভল্যুমের জীবনীর রাজকীয় শেষ খণ্ডটি নিয়ে। ফাউস্ট বিক্রি হয়েছে এক বছরে পঁচাত্তর হাজার কপি। আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্যেটের অন্য অনেক মিলের মধ্যে এটাও একটা যে তিনি ব্যবহৃত হন যত, পঠিত হন না ততখানি। তবে গত বছরে অবিস্মরণীয় দুর্ঘটনা। ছ'সপ্তাহের এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল পৃথিবীর নানান দেশের পঁচিশ হাজার তরুণ-তরুণী। প্রতিযোগিতার বিষয়, গ্যেটের শ্রেষ্ঠ কবিতার নির্বাচন। মহৎ লেখকদের আসল জন্ম তো মৃত্যুর পরেই। মৃত্যুর পর মোটামুটি একটা শতাব্দী পার না হলে তাঁদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি ধরা পড়ে না কখনো। □

অর্ধেক সত্য

১৪ জুলাই বুধবার ১৯৮৩। গোপন ভোট মারফত এম-সি-সি সোজাসুজি ঠিক করেছে যে তারা এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো ক্রিকেট দল পাঠাবে না—খবরটা এই রকম সাদামাটাভাবে লোকের কাছে পৌঁছলে বেশ খুশি হওয়া যেত। ঠিক এইভাবে কিন্তু খবরটা এসে পৌঁছোয়নি,—বাহুল্য হবে বলা যে তা সম্ভবও ছিল না। এই আপাত শান্ততল খবরের আড়ালে নানারকম উলটো পালটা স্বার্থ ও উদ্দেশ্য কাজ করে গেছে ঃ এই সিদ্ধান্তটা মোটেই অ্যাপার্থায়ডের বিরুদ্ধে জগৎজোড়া আন্দোলনটার পুরো প্রতিফলন নয়।

সেই ১৯৬৯ সালে বেসিল দ্যলিভেরা কেলেঙ্কারির পরেই এম-সি-সি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারি সফরগুলো বন্ধ করেছিল। সত্য, কিন্তু অর্ধেক সত্য। কেননা সাতকাহন ব্যাখ্যানা করে না বললেও এটা বোঝা যায় যে সমস্ত জোরটা পড়বে 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' কথাটার ওপর। কেননা ইংল্যান্ডে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অভ্যর্থনা জানাতে পরের বছরই এম-সি-সি রাজি ও উৎসুক ছিল। বর্ণবৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীরা সত্যাগ্রহ করেছিল, ঘেরাও করেছিল, পিচ খুঁড়েছিল, দেশজোড়া স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল। এম-সি-সি চেয়েছিল পুলিস পাহারার মধ্যে তবু খেলা চালিয়ে যেতে। পুলিস পাহারার পেছনে তারা যত টাকা খরচ করেছিল কোনো দুঃস্থ ক্রিকেটার স্বপ্নেও কখনো তত টাকা চোখে দেখেনি। রেভারেণ্ড ডেভিড শেপাড্—এককালে তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের ওপেনিং ব্যাট সম্মান এবারের বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন অন্যতম আম্পায়ার—মোটেই কোনো বামপন্থী নন। কিন্তু তিনি এবং তাঁর মতো অন্য দু-একজন, এই সফরবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেষটায় তৎকালীন লেবার সরকারের ফতোয়ায় সফর বাতিল হয়ে যায়, তারা সরাসরি অ্যাপার্থায়েডের বিরোধিতা না করে শান্তি ও শৃঙ্খলার অজুহাত দিয়ে বলেছিল, এ-সময় সফরটা আদৌ উচিত হবে না। তড়িঘড়ি তখন ব্যবস্থা করা হয় একটা বিশ্ব একাদশের, যাতে খেলেছিলেন গ্রাহাম পোলক, পিটার পোলক, এডি বারলো প্রমুখের সঙ্গে রোহন কানহাই, ফারুক ইনজিনিয়ার, ল্যান্স গিবস, ইনতিখাব আলম, গ্রাহাম ম্যাকেনজি, মুস্তাক মহম্মদ—আর সে দলটার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গ্যারি সোবার্স। পরের বছর, '৭১-'৭২এ, অস্ট্রেলিয়াতেও বাতিল হয়ে যায় স্প্রিংবকের সফর, আবারও একটি বিশ্ব একাদশ খেলতে যায় সেখানে গ্যারি সোবার্সের নেতৃত্বে—যাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সুনীল গাভাসকার, বিষেন সিং বেদী এবং ফারুক ইনজিনিয়ার। দলটা মোটামুটি ছিল প্রথম বিশ্ব একাদশের মতোই। সেই সিরিজেই অভ্যুদয় হয়েছিল ডেনিস লিলির—অন্তত এজন্যও এ-সফরটা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সফর নিয়ে আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের মুখপত্র 'সেচাবা'-তে প্রকাশিত কার্টুন

শুধু খেই ধরিয়ে দেবার জন্যই আমরা পেছন ফিরে তাকাতে চাইছি না, বুঝতে চাইছি এম-সি-সির মনোভাব। মনে রাখতে হবে, এম-সি-সি চেয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সফরটা, শুধু সরকারি ফতোয়াতেই বাধ্য হয় প্রস্তাবিত সফরটাকে শিকেয় তুলে রাখতে। কিন্তু সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডে বেশির ভাগ খবরের কাগজই তখন সরকারের হস্তক্ষেপকে বর্ণনা করেছিল অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর বলে—তারা বলেছিল খেলার সঙ্গে মিছিমিছি বিচ্ছিরিভাবে রাজনীতিকে জড়ানো হচ্ছে, খেলাকৈবল্যবাদীদের প্রধান যুক্তি ছিল এতে কোনো জনসংগঠনের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এটা গণতন্ত্রবিরোধী। ক'মাস আগে ইংল্যান্ড দলে বেসিল দ্যলিভেরা আছেন বলে যখন প্রিটোরিয়া সরকার সফর বন্ধ করে দিয়েছিল, এরাই কিন্তু তাকে বলেছিল ব্যাপারটা দুঃখের, ব্যাস, এইটুকু।

এবার কিন্তু ম্যাগি থ্যাচারের রক্ষণশীল সরকার ভোটের আগের দিন এম-সি-সিকে জানিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় দল পাঠানো অনুচিত হবে—থ্যাচার নিজে নাকি সফরের ঘোরতর বিরোধী। রক্ষণশীলদের এই ডিগবাজির পেছনে কারণগুলো সত্যি কী, এটা ভাবতে কিন্তু দু-মিনিটও লাগে না। এর মধ্যে টেমসের জল আরো অনেকটাই শুকিয়েছে, টেক্সাসের ধনকুবের কিনে নিয়ে গেছে লণ্ডন ব্রিজ—নড়বড়ে যে ব্রিজটা পড়ে যাবে বলে ছেলেভোলানো ছড়া এত বছর ধরে কষ্ট পেয়েছে। অ্যাপার্থায়েডের বিরুদ্ধে পৃথিবী জোড়া আন্দোলন যে আরো মুখর ও সংঘবদ্ধ হয়েছে তা-ই নয়, সাম্রাজ্য হারিয়ে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো ঘোরালো হয়েছে, সব মান খুইয়ে ইওরোপীয় কমন মার্কেটের দুয়ারে হাত পাতলেও খুব-একটা সুবিধে হয়নি—অতএব নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে সামাল দেবার জন্য কমনওয়েলথকে বাঁচিয়ে রাখাটা একান্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। বিশেষত ১৯৭৭-এর গ্লেনঈগলস চুক্তির পর প্রকাশ্যে তাকে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করাটা মুশকিল হয়ে উঠেছে ব্রিটেনের বাজার দখল করে নেবার জন্য কানাডা ওৎ পেতে আছে, অস্ট্রেলিয়াও ; সুযোগ পেলেই তারা ছুঁচ হয়ে ঢুকে পড়বে। অতএব দড়ির ওপর দিয়ে খুব সাবধানে হাঁটা ছাড়া আর উপায় কী। এছাড়া, যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় সব প্রতিবাদ সত্ত্বেও দল পাঠানো হয়, তবে ১৯৮৪তে লস এনজেলসে যে-অলিম্পিক হবে, সেখানেও রব উঠবে ইংল্যান্ডকে বাদ দেয়া হোক—কেননা শুধু কমনওয়েলথের দেশগুলোই নয়, আরো অনেক দেশই মনে মনে যাই ভাবুক না কেন মুখে, প্রকাশ্যে, ইংল্যান্ডকে নিন্দে করতে বাধ্য হবে। এ-দুটো ব্যাপার হয়ত অনেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন, কিন্তু আরো-একটা কারণ হয়ত ছিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সমাবেশে এম-সি-সির ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এমনকি ইংল্যান্ডেও এখন সরকারিভাবে ক্রিকেটের তত্ত্বাবধান করে টি-সি-সি-বি (টেষ্ট ও কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড)—যদিও এখনো পুরানো দিনের স্মরণে এম-সি-সির সভাপতিই পদাধিকার বলে তার সভাপতি। ঐতিহ্যের শেষ চিহ্ন হিসেবে তিনি কিন্তু এখনো অব্দি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সমাবেশেরও সভাপতি। কিন্তু অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। ১৯৮৫ থেকে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সমাবেশে অন্য সদস্য দেশের সভাপতিরা পালা করে সভাপতি হবেন—এম-সি-সির একাধিপত্য পুরোপুরি ঘুচে যাবে। ডেনিস কম্পটন, বিল এডরিচ অথবা রক্ষণশীলদের এম-পি জন কার্লাইলের এ-কথা অগোচর ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেই দুর্দিন আসার আগেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। সেই অর্থে '৮৩-'৮৪র শীতটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মরশুম। শুধু যে অলিম্পিকেরই অব্যবহিত আগে তা-ই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সমাবেশের

সংবিধানেরও পালাবদলের আগে। এবার যদি না হয়, এম-সি-সির যদি শেষ ক্ষমতাটুকু হারিয়ে যায়, তবে আর এম-সি-সি এ বিষয়ে কী করতে পারবে?

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভোটের ব্যাপারটা ভাবা যাক। সরকারি ফতোয়া সত্ত্বেও এবার কিন্তু গণতন্ত্র গেল-গেল বলে কোনো রব ওঠেনি—কেউ তেমন স্পষ্ট করে ঝেড়ে কাশেনি মনের মধ্যে কী আছে। এম-সি-সির সদস্য সংখ্যা ১৮,০০০; সদস্যরা নানা দেশে ছড়ানো অর্থাৎ শেষ অব্দি সংখ্যায় খুব কম হলেও এম-সি-সির কোনো কোনো সদস্য ইংরেজ নন। ডাকে ভোট দেবারও ব্যবস্থা ছিল। তবু সবাই ভোট দেননি। ডাকে-পাওয়া ভোট সমেত মোট ভোট পড়েছিল ১০,৯৪৮—এগারো হাজারেরও কম। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে ৬,৬০৪; আর দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য উৎসুক ভোট ৪,৩৪৪। যাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটায় ভোট দেননি তাঁরা সত্যি কী ভাবেন? বজায় রাখতে চান স্থিতাবস্থা—অর্থাৎ তাঁরা কি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না? না কি থ্যাচারের মত জেনে শেষ মুহূর্তে ভোট দেননি? ভোগ্যপণ্যের মতো ক্রিকেটারদের নিলামে চড়িয়ে বেশি দর হেঁকে বেশি ব্র্যান্ডে কিনে নিচ্ছিল জো পামেনস্কির দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ইউনিয়ন—আর সবাই তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল—অন্তত প্রকাশ্যে। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন, শ্রীলঙ্কার অর্থপিশাচেরা পঁচিশ বছরের জন্য—আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আরো কঠোর—সারা জীবনের জন্যই তাদের নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এতকাল বলা হচ্ছিল এই ক্রিকেটাররা টাকার লোভে দক্ষিণ আফ্রিকা গেছেন। কিন্তু যে ৪৩-৪৪ জন মহানুভব সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার জন্য ভোট দিয়েছেন, তাঁরা? তাঁরা কি সবাই টাকা দিয়ে কেনা? তাঁরা কি সবাই রোটম্যান সিগারেটের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় চাকরি করেন? ডেনিস কম্পটন বা বিল এডরিচ বা ও রকম কাউকে কাউকে না হয় ব্র্যান্ড ছড়িয়ে কিনে নেয়া গেছে। কিন্তু বাকিরা? তবে কি তারা অ্যাপার্থায়েডকে সমর্থন করে?

জো পামেনস্কির ধারণা কিন্তু তাই। সে এই চার হাজারের ওপর লোকের সমর্থন পেয়ে বেজায় খুশি। সে তো জানতই যে ভোটে হারার সম্ভাবনাটাই বেশি। সে শুধু জানতে চাচ্ছিল কত লোক আছে তার পক্ষে। ফলে সে খুশি গলায় বিবৃতি দিয়েছে, এখনো যে অজস্র লোক বিপুল রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও আমাদের সমর্থন করে, এটা জেনে ক্রিকেটার কেনার ব্যবসাটা আমরা চালিয়েই যাব। অত বাইরের চাপ না থাকলে আমরা নিশ্চয়ই জিততুম।

তবে ধারণা যে পুরোপুরি মিথ্যে নয় তার প্রমাণ ইংল্যান্ডের ক্রমবর্ধমান বর্ণবৈষম্যনীতি, ফাঙ্কি রক-এর ভক্তদের আস্তিনের স্বস্তিকা ও এস-এস চিহ্ন বা মার্কিন মুলুকে মুখের ঢাকা খুলে কু ক্লুক্স ক্লানের প্রকাশ্য পদার্পণ—প্রভৃতি তথ্য। অতএব এম-সি-সি ভোট মারফৎ ঠিক করেছে, তারা আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকায় দল পাঠাতে চায় না—এটা শুধু অর্ধেক সত্য—বাস্তব অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন নয়। এম-সি-সির বেশির ভাগ লোকেরই যে অকস্মাৎ হার্দ্য পরিবর্তন হয়েছে, সব দেখেশুনে এটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। সত্যি বলতে, যাঁরা ভোট দেননি তাঁদের সংখ্যা এত বেশি যে আতঙ্ক জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা কি এই অনুপাতেই ভোট দিতেন, না কি চাইতেন প্রিটোরিয়ার সরকারের মৈত্রী? আর তাই তো জো পামেনস্কি এই উদ্ধত ঘোষণায় মোটেই দ্বিধা করেনি 'আমরা নানা দেশের ক্রিকেটারদের কিনে নিয়ে বিক্ষুব্ধ সফরগুলো চালিয়ে যাব, আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কালো ক্রিকেটারদের কিনে নিয়েই প্রমাণ করব যে, বর্ণবৈষম্য ব্যাপারটায় অনেক কালা আদমীরই আপত্তি নেই—কালোদের মধ্যে ঐক্যের কথাটা নিতান্তই অলীক একটি কিংবদন্তি।' কিন্তু বিশ্বকাপের সময় ইংল্যান্ডের মাঠে মাঠে কে না দেখেছে এই পোস্টার—দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ পুলিস মাটিতে পড়ে থাকা কালা আদমীদের লাথি মারছে—যেটা তাদের ন্যাশনাল স্পোর্টস—এবং তার তলায় লেখা এই অনুসিদ্ধান্ত 'ইফ ইউ লাভ দেয়ার ন্যাশন্যাল স্পোর্টস, ইউ উইল লাইক দেয়ার ক্রিকেট।'

মিলন দত্ত

পেন্টশপের মহিলা শ্রমিক

এই বিজ্ঞানের যুগে এমন তো মনে হতেই পারে যে বৈদ্যুতিক পাখা অর্থাৎ ফ্যান তৈরির কাজটা অন্তত গোটাটাই কলে হয়। এই মনে হওয়ায় কিছুটা সত্যতা থাকে বৈকি, আবার একটু ভুলও থাকে। যেমন একটা ফ্যান গোটাটাই কলে হতে পারে, আবার গোটা ফ্যানটাই মানুষ কল ছাড়াই স্রেফ হাতে বানিয়ে দিতে পারে। আমাদের দেশে মোট যত ফ্যান তৈরি হয় তার একটা বেশ বড় অংশ তৈরি হয় হাতে—সংখ্যাটা বড় কারখানায় তৈরি ফ্যানের চেয়ে হয়ত বেশি নয়, কিন্তু প্রায় কাছাকাছি। এবং কোনো অনিবার্য কারণে কলে-তৈরি ফ্যানের চেয়ে হাতে-তৈরি ফ্যানের দাম অনেক কম। তার একটি কারণ বিশেষ প্রকট এবং তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক—সেটা হল মজুরি। স্বাভাবিকভাবেই বড় কারখানার বাইরের অসংগঠিত শ্রমিকদের খাটিয়ে নেওয়া যায় নাম-মাত্র মজুরিতে, আর মজুরি আরও কমে যায় সেখানে যদি নিয়োগ করা যায় মহিলা শ্রমিক।

ফ্যানের বড় কারখানাগুলোর বাইরে ফ্যান তৈরির সংস্থাগুলিকে চালু কথায় 'কটেজ' বলে। কটেজ নামের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলিতে কখনই ২৫/৩০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়োজিত হয় না। এই সংখ্যার মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ কম নয়।

ফ্যানের পুরো কাজ কোনো কটেজ করে না। কোনো কটেজ যদি লিলুয়া থেকে ঢালাই হয়ে আসা ফ্যানের 'টপ' আর 'বটম' লেদ মেশিনে ঘষে মসৃণ করে, অন্য কটেজ হয়ত সেগুলো ব্যালান্সিং করে, আর কোনো কটেজ সেগুলোর গায়ে পুটিং-প্রাইমার লাগিয়ে, সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে সেগুলোকে আবার তুলে ফেলে তাকে রঙ করার উপযোগী মসৃণ করে তোলে। শেষোক্ত এই কটেজগুলোকে বলে 'পেন্ট শপ'। আর মহিলা শ্রমিকদের সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এই পেন্ট শপে। শুধু পেন্ট শপে নয়, প্যাকিং করা বা লেবেল লাগানোর মতো অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্ব এবং কম আয়ের কাজেও মেয়েদের সংখ্যাধিক্য।

পেন্ট শপের বাসন্তী : বাসন্তী সরকার গত ছ-ছটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে ফ্যানের টপ আর বটম ঘষে। সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে আটটা—বাসন্তীর কাজের সময়ের হিসেবটা এরকম। ক্ষীণাঙ্গী এই মহিলার বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে যেবার চীন-ভারতের যুদ্ধ, "হাওড়া ব্রিজে কালো রঙ করার কথা হল যেবার।" ফলে বাসন্তী সরকারের হিসেবের নানান জটিলতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল যে তার বয়স ৩৬/৩৭ হবে। সন্তানের সংখ্যা সাত। স্বামী মৃত। "অ্যামোন অবস্থা তো ছিল না, হয়েছে বছর তিন।" স্বামী মারা যাবার পর। স্বামী ছিল মূলীবাঁশের বেড়া তৈরির কারিগর। সচ্ছল হয়ত ছিল না, তবে অবস্থা এত খারাপও ছিল না কোলের দুটিকে খৃষ্টানদের হোমে পাঠানোর মতো। অনেক ধরপাকড় তদবির-তদারকির পর এই ব্যবস্থা করা গেছে। বিনে পয়সায় খাওয়া-পড়া-শিক্ষার সব দায়িত্ব হোমের। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা রোজে বাসন্তী ছটি পেট কীভাবে ভরায় সে প্রশ্ন না তোলাই ভালো। "একটা বড় মানুষ বাড়িতে ছেলেপিলের ওপর চেপে না বসলে লেখাপড়া হয়!" তাই বাসন্তীর আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের লেখাপড়া চুকেছে ওদের বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই।

সকাল আটটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাসন্তীকে জলভর্তি চৌবাচ্চার কিনারে বসে একটার পর একটা ঘষে যেতে হয় ফ্যানের 'টপ' আর 'বটম'। লিলুয়া থেকে ঢালাই হয়ে আসা এই টপ এবং বটম লেদে খানিকটা মসৃণ হয়ে তার ওপর পুটিং আর প্রাইমার লাগানোর পর বাসন্তীর হাতের ঘষায় মসৃণ হবে স্প্রে পেন্টিং-এর আগে। একটা 'টপ' বা 'বটম' যাকে সাধারণভাবে 'মাল' বলা হয়, ঘষতে সময় লাগে সাত থেকে দশ মিনিট। একটা 'মাল' ঘষা হলে ওর পাওনা হয় পাঁচ পয়সা। সারাদিনে কুড়িয়ে বাড়িয়ে মজুরি দাঁড়ায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ টাকা। যেমন কাজ তেমন মজুরি। কতগুলো মা ঘষা হল, তার ওপর নির্ভর করে অর সারাদিনের রোজগার। ঐ রোজগারে কেবল বাসন্তী নয়, সংসারের টানাটানিতে হিমসিম খাচ্ছে সুবলা দে। পাগল স্বামীকে নিয়ে ঘর করছে সুবলা। তিন ছেলেমেয়ের একটিকেও অক্ষর চেনানোর সুযোগ হয়নি। বাংলাদেশ থেকে ৭১ সালে উদ্বাস্তু হয়ে আসা কামিনীর সহায় সম্বল বা দায় যা কিছু তার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে—কারণ স্বামী পুড়েছে যুদ্ধের আগুনে। সে আগুনের ঝলসানি দগ্ধ করেছিল কামিনীকেও—তাকে ছাড়তে হল নিজস্ব জোত জমি আর ভিটে। কামিনীর সে দহন আজও শেষ হয়নি—তা শেষ হবার নয়। সবিতা, অনিমা, প্রতিমা, বকুলদের জীবনের বিস্তার ঐ প্রায় একই খাতে, যেখানে দুঃখ শ্রম ক্লান্তি দারিদ্র্য এবং আবার দুঃখ, ফলে একঘেয়ে ক্লান্তিকর বাঁচার আদল। এরা প্রায় প্রত্যেকেই শ্রমিক হওয়ার আগেও শ্রমই বিক্রি করত, তবে তা কলে-কারখানায় নয়, হয়ত বা স্বনিযুক্ত কোনো কাজে বা 'ঠিকে ঝি'র কাজে। এমন নয় যে কটেজে কাজ করার ফলে আগের চেয়ে এদের উপার্জন বেড়েছে। বরং বাবুর বাড়ি বাসন মেজে বা একাধিক বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ করে যা উপার্জন করত বর্তমান উপার্জন তার চেয়ে কম। তবু ওদের সান্ত্বনার একটা জায়গা হল বৃহত্তর শ্রমিক সমাজের একজন হয়ে যাওয়া—এই সম্মানটাকে ওরা মূল্য দিয়েছে অনেক বেশি। আর এখানে মালিকের সঙ্গে লড়াইটা ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীর।

কটেজের বৃত্তান্ত : টালিগঞ্জের যে এলাকায় গড়ে উঠেছে এই কটেজগুলো সেখানে বাসন্তীর মতো আরও প্রায় দু'শ মহিলা শ্রমিক কাজ করে। এক একটা কটেজে এদের সংখ্যা আট থেকে বারোর মধ্যে। শুধু তো এই দু'শ জন নয়, এদের সঙ্গে আছে আরও কয়েক হাজার পুরুষ শ্রমিক। গত প্রায় দু দশকের পুরনো এই কটেজগুলোয় কোনো সংহত শ্রমিক সংগঠন নেই। তবে ইদানীং গড়ে উঠেছে সিটুর সংগঠন, অল্পবিস্তর। শ্রমিক সংগঠনের কাজকর্ম মূলত চাঁদা তোলা, মাঝে মাঝে বক্তৃতা করা এবং সম্মেলন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। না হলে সংগঠনের প্রথম দাবি 'পিস রেট' প্রথা বিলোপ করে রোজের বেতন বা মাস মাহিনা চালু করার কাজ এগিয়েছে সামান্যই। এ পর্যন্ত মাত্র দুটি কটেজে পিস রেট বিলুপ্ত হয়েছে। সেখানে পেন্ট শপের মহিলা শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১৮০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে। মাইনে বাড়ার একটা শম্বুক গতি নিশ্চয়ই আছে, তবে তাতে টালবাহানাও আছে বিস্তর। অন্যদিকে আইনের নানা ঘোরপ্যাঁচে মাঝে মাঝেই নাম পালটে যায় কারখানার। এর ফলে শ্রমিকদের যেমন অস্থায়ী করে রাখার সুবিধে হয়, তেমনি বহু টাকা পয়সা ফাঁকি দেওয়া যায় সরকারের। এসবই বাণিজ্যিক কূটকচালি, যার কবলে পড়ে অসহায় শ্রমিক চিরকালই বিপর্যস্ত। তাছাড়া এই কটেজগুলোতে শ্রমিক আন্দোলনের আরেক অসুবিধে হল এই কটেজগুলোর বেশির ভাগ মালিকই অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এমন আন্দোলন বাঞ্ছনীয় নয় যাতে কটেজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আন্দোলনে এই জাতীয় বিচার বিবেচনাও এখানে কাজ করে। বাজারের চাহিদা এবং অর্ডারের ওপর যদিও শ্রমিকদের কাজ পাওয়া না-পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করে, তবু শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার এই চেষ্টা তাদের কাজ পাওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত করতে পেরেছে।

হায়দ্রাবাদ

আকাশবাণী ও মুখ্যমন্ত্রীর বাণী

অন্ধ্রে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রেডিওর ওপর রাজ্য সরকারের কর্তৃত্ব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির একটি ভাষণ নিয়ে প্রায় এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেবারও অজয়বাবু বক্তৃতা দেননি। এবারও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতা দেননি। কিন্তু প্রায় তের বছর পরে একই ধরনের ঘটনা ঘটায় এটা অন্তত প্রমাণিত হল যে এ-ব্যাপারে ভারত সরকার কোনো নীতি স্থির করেননি।

রামা রাওয়ের মন্ত্রিসভায় তথ্যমন্ত্রী ছেগোন্তি ভেংকটরামা যোগিয়া অভিযোগ করেছেন, তিনি কেন্দ্রের তথ্যমন্ত্রী এইচ-কে-এল ভগৎ ও উপমন্ত্রী মল্লিকার্জুনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের ফোনে পাওয়া যায়নি। তাঁরাও পরে আর শ্রীযোগিয়াকে ফোন করেননি।

হায়দ্রাবাদ-আকাশবাণীর ডিরেক্টর বলেন যে, মাত্র তিনদিন আগে রামা রাও একটি বক্তৃতা করেন বলে তাঁরা আর-একটি বক্তৃতা করতে দেয়ার আগে দিল্লীর সম্মতির প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু এর আগে রামা রাওয়ের বক্তৃতা রেকর্ডিং করা নিয়েই একটা হাঙ্গামা পাকিয়ে উঠেছিল।

রাজ্য তথ্য দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে মুখ্যমন্ত্রী রাত্রি আটটায় আকাশবাণী থেকে একটি ভাষণ দেবেন। আকাশবাণী থেকে বলা হয়—এই ঘোষণা তাঁদের অনুমোদন ছাড়া করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বলেন—ঘোষণার আগে আকাশবাণীর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

রামা রাও

১৮ জুলাই সকাল ৯টায় সেক্রেটারিয়েট থেকে আকাশবাণীকে ফোনে অনুরোধ করা হয়, বক্তৃতাটি রেকর্ডিং-এর জন্যে একটি ইউনিটকে যেন মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে পাঠানো হয়।

কিন্তু আকাশবাণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে স্টুডিওতে এসে বক্তৃতা রেকর্ড করতে বলা হয়। তাঁরা বলেন, স্টুডিও ছাড়া রেকর্ডিং ভালো হয় না।

অন্ধ্রের তথ্যমন্ত্রী শ্রীযোগিয়া তখন হায়দ্রাবাদ-আকাশবাণীর সহাকারী স্টেশন-ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে দিল্লীতে ডিরেক্টর-জেনারেলের অনুমতি দরকার। অন্ধ্রের তথ্য-অধিকর্তা ডঃ শ্রীমতী বনযক্ষী দিল্লীতে ফোন করেন কেশব পান্ডেকে। কেশব পান্ডে দিল্লীতে প্রোগ্রাম পলিসির ডিরেক্টর। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আকাশবাণীর ইউনিটকে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা রেকর্ড করতে বলেন। এর কয়েক মিনিট পরই হায়দ্রাবাদের আকাশবাণীর ডিরেক্টর-ইন-চার্জ মুখ্যমন্ত্রীর অফিসকে ফোন করে জানান দিল্লী থেকে ডিরেক্টর জেনারেল মুখ্যমন্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বেতার ভাষণের "অনুমতি" দেননি।

দিল্লীতে তথ্যমন্ত্রক থেকে অবিশ্যি বলা হয় যে, হায়দ্রাবাদ আকাশবাণীর ডিরেক্টর সন্ধ্যায় রামা রাওকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সেদিন সন্ধ্যায় বক্তৃতা করতে অস্বীকার করেন।

এই ঘটনাক্রমে অসঙ্গতি আছে। মনে হয়, দিল্লী থেকে প্রথম নিষেধাদেশ আসার পর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ও রামা রাওকে বক্তৃতার অনুমতি দেয়া হয়।

আবার, এ-ঘটনা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, হায়দ্রাবাদ আকাশবাণী সকাল থেকেই হয়ত দিল্লীর কাছ থেকে অনুমতি আনার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। সে-কারণেই রেকর্ডিং নিয়ে অত টালবাহানা চলছিল। সেদিক থেকে হায়দ্রাবাদ-আকাশবাণীরও হয়ত তেমন দোষ নেই।

তাহলে, দোষটা কোথায়? দোষটা তো ব্যবস্থারই মধ্যে। আকাশবাণী সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট মাত্র। আর ডিপার্টমেন্ট মানেই ফাইল, শেটিং, অর্ডার ইত্যাদি। সেখানে জুনিয়ার অফিসার তাঁর সিনিয়ার অফিসারের অনুমতি ছাড়া এক পা-ও নড়বে না বা এক আঙুলও নাড়াবে না।

সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে রামা রাওকে বক্তৃতা করতে না-দেয়ার পক্ষে যে-দুটি যুক্তি দেয়া হচ্ছে। প্রথম যুক্তি, মাত্র তিনদিন আগেই তিনি একবার বক্তৃতা করেছেন। তার মানে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কখন বেতারকে ব্যবহার করা হবে সেটা স্থির করার অধিকার রাজ্যের নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নয়, কিন্তু নিযুক্ত কোনো কর্মচারীর? '৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে যে-অবস্থা হয়েছিল—তার এক কণা বদল হয়নি।

হওয়া মুশকিল। কারণ সরকার 'আকাশবাণী' ও টিভিকে তাদের ডিপার্টমেন্ট হিসেবেই রাখতে চান। জনসঙ্ঘ একবার ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের নিজেদের বেতারকেন্দ্র বসাবেন। সে নিয়ে কিছু আইন-অমান্যও হয়েছিল। তারপর তাঁরা যখন "জনতা" হয়ে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় এলেন তখন আকাশবাণীকে স্বাধীন করার কোনো ব্যবস্থাই নেননি। তখন আকাশবাণী তাঁদের কাজে লাগছিল।

যে-সংবিধানের আওতায় অন্ধ্রতে তেলেগু দেশম বা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে, সেই সংবিধানে কিছু বিষয় কেন্দ্রের অধীনে, আর কিছু বিষয় রাজ্যের। অথচ ভারত সরকারের হোম-ডিপার্টমেন্টের যে-হ্যান্ডবুক অনুযায়ী আকাশবাণী চলে তা ব্রিটিশ সরকারের তৈরি, আমাদের সংবিধান সেখানে অচল।

তামিলনাড়ু

বাচ্চাদের দুপুরের খাওয়া

১৯৮৩-৮৪ সালের তামিলনাড়ুর বাজেট দেখে বোঝা গেল যে ২ বছর বয়সের বেশি ও ১০ বছর বয়সের কম বাচ্চাদের দুপুরের খাবার দেবার যে কর্মসূচী সরকার চালু করেছিলেন, তা প্রায় পাকাপাকি হতে চলল। সরকার এটাকে দায়িত্ব হিসেবেই মেনে নিয়েছেন।

১৯৫৬ সালের তামিলনাড়ুর সরকার প্রথম এ রকম একটা কর্মসূচী নিয়েছিলেন। তখন তাঁরা স্কুলের যাবার বয়স হয়েছে এমন বাচ্চাদের দায়িত্ব আংশিকভাবে নিয়েছিলেন। বছরে মোট ২০০ দিন খাওয়ানো হতো। কর্মসূচীর আর্থিক দায়িত্ব পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি এইসব সংস্থার ওপরও বর্তেছিল। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্যও নেয়া হতো। এই সব কিছুর ফলে কর্মসূচিটা প্রায় ভেস্তেই গিয়েছিল।

নতুন ভাবে বর্তমান তামিলনাড়ু সরকার এই কর্মসূচীটি নিয়েছেন প্রায় মাস দশেক হল। বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন ৬৩ লক্ষ বাচ্চা সরকারের দেয়া দুপুরের খাবার খাচ্ছে। এত বিরাট ব্যাপারে খরচের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৪০০ কোটি টাকা। হিসেবে দেখা গেছে তামিলনাড়ুতে ২ থেকে ৯ বছরের বাচ্চাদের ৬০ ভাগই দারিদ্র্যসীমার নিচে যে-সব পরিবার তাদের থেকে এসেছে। ২ থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে ২৫ লক্ষ, আর ৫ থেকে ৯ বছর বয়সের মধ্যে ৩৮ লক্ষ বাচ্চা।

একদিক থেকে বলা যায় তামিলনাড়ু সরকার তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্বই পালন করছেন। আমাদের সংবিধানের "ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল অব স্টেট পলিসিজ"-এর ৩৯ এ, ৪৫ ও ৪৭ নম্বর ধারায় বলা

হয়েছে জনসাধারণের জীবন নির্বাহের দায় রাষ্ট্রকে বইতে হবে, বিনি পয়সায় বাধ্যতামূলক খাদ্য সরবরাহের দায় রাষ্ট্রকে মানতে হবে, ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি জীবনযাত্রার মান বাড়াবার দায় রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে তামিলনাড়ুর জনসাধারণের গড় ক্যালরি ও প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫০০ ও ৩৬ গ্রাম। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চের মতে এটা হওয়া উচিত ২৪০০ ও ৪৬ গ্রাম। চার বছরের ছোট বাচ্চাদের মৃত্যু দিয়ে তামিলনাড়ুর মৃত্যুহারের শতকরা ৪০ ভাগের হিসেব মেলাতে হয়। এই বাচ্চাদের তিন ভাগের এক ভাগই মারা যায় অপুষ্টি থেকে। তামিলনাড়ুর গড় আয়ু (৫৩·৪৫বছর) আমাদের জাতীয় গড়ের চাইতে (৫৪·৭০) কম। শতকরা ৫৭·২ ভাগই থাকেন দারিদ্র্যসীমার নিচে। ১৯৭৮ সালে ন্যাশনাল স্যামপেল সার্ভের ২৪০ নম্বর রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ দারিদ্র্যের হিসাবে তামিলনাড়ুর জায়গা দেশের ভিতরে তৃতীয় আর শহরের দারিদ্র্যের হিসেবে দ্বিতীয়।

তামিলনাড়ুতেও একটা 'সবুজ বিপ্লব' ঘটে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ এই বিপ্লবের টিকিটিও দেখতে পায় নি। ছোট জমির চাষী সার চায় না, পোকামারার ওষুধ পায় না, জল পায় না। চাষের জমির শতকরা ৬০ ভাগই আছে গ্রামের মাত্র ১০ ভাগ লোকের হাতে। ১৯৬১ থেকে ৭১ হচ্ছে এই সবুজ বিপ্লবের দশক। আর এই দশ বছরে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা বেড়েছে দেড়গুণ। আর এই সব বিপ্লবের বছরেই তামিলনাড়ুর গরিবের খাদ্য যব-জোয়ার চাষ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে—তার বদলে চাষ বাড়ানো হয়েছে নগদ পয়সা পাওয়া যায় এমন জিনিসের।

এই পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ু সরকার বাচ্চাদের দুপুরে খাওয়ানোর এই কর্মসূচিটি নিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার—শিশু মৃত্যুর হার কমানো, শিশুদের পুষ্টি বাড়ানো ও স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানো।

তার ফল কিছুটা এর মধ্যেই ফলেছে। ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভে ছাত্রভর্তির সংখ্যা আড়াই লাখ বেড়েছে।

ফলে চার হাজার নতুন শিক্ষক দরকার। সরকার আশা করছেন, স্কুল ছেড়ে দেয়ার হার খুব কমে যাবে।

এই কর্মসূচী কার্যকর করতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার নারীকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে গ্রামের দুঃস্থ মহিলারাই বেশি।

কর্মসূচীটি দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় নি এমন বাচ্চাদের জন্যে আছে ২০,০০০ কেন্দ্র। একটি কেন্দ্রে ৭০ থেকে ১৫০ জন বাচ্চা খাবার পায়। এক-একটি কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকেন একজন বালসেবিকা। একজন ঠাকুর রান্না করেন। একজন পরিচারক সাহায্য করেন। বাচ্চাদের লেখাপড়ার ও খেলার জিনিস ও রান্নার বাসনপত্র সরকার দেন।

প্রাইমারি স্কুলে রান্নার কাজ করে দেন ঠিকে এক রাঁধুনি। এই সব কাজ দেখা শোনার জন্যে স্থায়ী লোক রাখার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে—যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর বেশি কাজ না চাপে।

চাল ডাল সরবরাহের দায়িত্ব সরাসরি রাজ্য সিভিল সাপ্লাই কর্পোরেশনের। তরি-তরকারি আর জ্বালানি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়।

একটি বাচ্চাকে খাবার দিতে খরচ পড়ে ৪৫ পয়সা মতো। ভোগ্যপণ্যের ওপর বিশেষ কর বসিয়ে এই খরচ তোলা হচ্ছে। দান, সাহায্য ইত্যাদির সূত্রে পাওয়া গেছে ২০ লক্ষ টাকার মতো—মোট খরচার একভাগ।

এই কর্মসূচীর কার্যকারিতা সম্পর্কে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। দুটি একটি জেলায় দুটি-একটি সমীক্ষা করা হয়েছে বটে কিন্তু সে হিসেব নিকেশ দিয়ে পুরো রাজ্যের অবস্থা বোঝা যাবে না।

সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল—এর ফলে গ্রামের গরিব মানুষজনের 'সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তন' সূচিত হবে। এই সব কথার ভিতর রাজনীতির ওপরচালাকি আছে। ভূমি-সংস্কার ও কর্মসংস্থান ছাড়া গ্রামের সামাজিক-আর্থিক কাঠামো বদলানো অসম্ভব। কিন্তু সেই কারণে এই কর্মসূচীর ভালো দিকটাকেও ছোট করা যায় না। বাচ্চাদের তো বাঁচাতে হবে আর কোনো সরকার যদি একটা পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে এই কাজটাতে হাত দেয় তা হলে তাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। এর জন্যে সরকারকে অতিরিক্ত কর বসাতে হয়েছে, ও অন্য খরচ কমাতে হয়েছে। দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে সরকার বসে নেই।

এর মধ্যেই গ্রামে এই কর্মসূচী নিরাপত্তার যে বোধ এনেছে তাতে আর পেছুবার কোনো উপায় নেই।

পি কে বালচন্দ্রন

মণিপুর

চাকমা উপজাতি ও ব্রিগেডিয়ার সৈলো

আইজলে নতুন এম·এল· এ হস্টেলে মিজোরামের কংগ্রেস (ই) এম·এল·এ পি এইচ চাকমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মিজো রাজনীতির খবর কি? তিনি বললেন, মিজোরা চাকমাদের 'বিদেশী' মনে করে। প্রায় একই নিশ্বাসে বললেন, ব্রিগেডিয়ার সৈলোর সরকার ছিমতিপুই জেলার চুয়াংতে ব্লকের উন্নতির জন্য কিছুই করছে না।

ব্যাপারটা একটা ব্লকের নয়। মিজোরামে আইজল জেলার শিক্ষিতের হার শতকরা ৬৫। ছিমতিপুই জেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৭। এই ছিমতিপুই জেলা মিজোরামের দক্ষিণতম প্রান্ত। তারই পশ্চিমে চুয়াংতে মহকুমা। এই মহকুমা চাকমা আদিবাসী অধ্যুষিত। আইজলে কেন্দ্রীয় সাহায্যে ৯২টি শিল্প সংস্থা চলে। ছিমতিপুইয়ে একটাও না। এ তথ্যগুলো শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্যেই দিচ্ছি যে, এম·এল·এ চাকমা হঠাৎ একটা মহকুমার কথা কেন বললেন। ছিমতিপুই জেলার পুবে ও দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে বাংলাদেশ। চোরাচালানের ব্যবসায় এ অঞ্চলের খ্যাতি বহুদিন। তাই এই এলাকার অ-মিজো তিনটি উপজাতির মধ্যে পশ্চিমে চাকমারা ও পুবে লাখেররা আন্তর্জাতিক সীমারেখা সব অভিজ্ঞতাই অনেক দিন ধরে পেয়ে এসেছে। তৃতীয় উপজাতি পাউয়িদের বসবাস উত্তর ও উত্তর-পুবে, মিজোরামের লুংলেই জেলার পাশে। তাদের ওপর এধরনের প্রভাব পড়েনি।

চাকমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের কথা অনেক আগে থেকেই মিজো ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি আইজল ও লুংলেইয়ে বলে আসছে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার সৈলো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'চাকমারা হল পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম মিজোরামের গায়ে লাগান। চাকমা জনসংখ্যা ৬ থেকে ৮ লাখ। আর মিজোরামের জনসংখ্যা ৪ লাখের মতো।' সুতরাং মূল লক্ষ্য হল বাংলাদেশের সঙ্গে বর্ডার সিল করা ও চুয়াংতে মহকুমা থেকে চাকমা অনুপ্রবেশকারীদের হটিয়ে দেয়া।

ব্রিগেডিয়ার সৈলোর বিপদ হল ১৯৭১-এর সেনশাসে চাকমাদের সংখ্যা ছিল ১০,৬৬১। অন্য দুই অ-মিজো উপজাতির সংখ্যা ছিল—পাউয়ি ১৩,৭৪১ ও লাখের ১২,৩২২। কিন্তু চাকমা জনসংখ্যা তিন গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। ফলে পুরো ছিমতিপুই জেলাতে সামাজিক আর্থনীতিক সংকট দেখা গেছে। এখন তিনটি স্বতন্ত্র জেলা পরিষদ ছিমতিপুইয়ে কাজ করছে—এই তিন উপজাতির প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে। এই জেলাপরিষদগুলি আবার শাসন পরিচালনার জন্যে চারটি মহকুমার সঙ্গে একাকার।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে বলেছেন, ১৯৪৭সালে চাকমাদের সংখ্যা ছিল ৩,০০০ মতো, বৃটিশ সরকার তাদের তখনকার লুসাই পাহাড়ের ভিতরে মিজোগ্রামগুলিতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে দিতেন না। স্বাধীনতার পরে এই ব্যবস্থা শিথিল হয়ে যায়। এবং চাকমারা দলে দলে লুসাই পাহাড়ের ভিতরে (মিজোরামে) ঢুকে পড়ে। এর পিছনে ছিল কিছু নেতার ভোট বাগানোর মতলব। কারণ, বাকি সমগ্র মিজোরামে মিজোরাই ৯০ ভাগ।

তিন অ-মিজো উপজাতির মধ্যেও চাকমারাই আলাদা। সেকারণেই তারা মিজোরামের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। অন্য দুই উপজাতি প্রধানত খ্রিস্টান। চাকমারা মিজোদের মতো পাহাড়ের ওপরে থাকে না, থাকে কর্ণফুলি নদীতীরে, সমতলে। কথা বলে বাংলারই এক উপভাষায়, চাষ করে আমন ধান, জলে মাছ ধরে। এর কোনটাই মিজো

জীবনযাত্রার সঙ্গে মেলে না।

জাতিতত্ত্বের দিক থেকেও মিজোরামের মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী থেকে চাকমারা আলাদা। পাউয়ি ও লাখেরদের মধ্যে উত্তর মিজোরামের উপজাতিদের প্রভাব থেকে ব্রহ্মদেশের উপজাতিদের প্রভাব বেশী। চাকমাদের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁদের পাউয়ি, লাখের ও লুসাইদের থেকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। ১৯৭২ সালে নর্থ ইস্টার্ন রি-অর্গানাইজেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী মিজোরাম তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত মিজোরা লুসাই নামে পরিচিত ছিল। আমি যখন এম·এল·এ চাকমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন তিনি বাংলা মিশিয়ে কখনও হিন্দি কখনও ইংরিজি বলছিলেন। সংখ্যালঘু এক উপজাতির প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ঠিক একজন বাঙালি নেতার মতোই সুরেলা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলেন।

ব্রিগেডিয়ার সৈলো ব্রহ্মদেশের উপজাতিদের মিজোরামে অনুপ্রবেশের কথা তোলেননি। তারা তাদের নিজস্ব ডিঙি ও নৌকাতে ছিমতিপুই নদী পার হয়ে মিজোরামে ঢুকছে। তাদের বাদ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার সৈলো বাংলাদেশ থেকে চাকমাদের ও নেপাল থেকে নেপালীদের অনুপ্রবেশকে 'সাংঘাতিক সমস্যা' বলেছেন। গত চার বছরের ওপর হল আসামে যে আন্দোলন চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি যে একথা তুলেছেন তা নয়। তিনি তুলেছেন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'সিডিউলড এরিয়ার' বিশেষ অধিকারের প্রশ্ন। মধ্যভারতে উপজাতি নয় এমন জনগোষ্ঠী উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। এ অবস্থাতেই বিখ্যাত ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ডঃ পি ডোর্ফম্যান বিশ বছর পরে নাগাল্যান্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও কিছু জায়গায় ঘুরে মন্তব্য করেছেন, উপজাতি অঞ্চলে উপজাতি নয় এমন জনগোষ্ঠীর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত। কিন্তু যাঁদের মতামতের সামান্য মূল্যও আছে এমন কেউই বলেননি উপজাতিদেরই নিজস্ব বসতি অঞ্চল তুলে দেয়া দরকার।

মধ্যভারত থেকে সমতলের আদিবাসীদের বি·আর·টি·এফ রাস্তা বানানোর কাজে মিজোরামে নিয়ে আসে। তারা দিনে দশ টাকার মতো মজুরি পায়, ছুটিতে দেশে যাওয়া ও ফিরে আসার খরচ পায়। এতে ব্রিগেডিয়ার সৈলোর কোনো আপত্তি নেই। কারণ এরা তো আসে মজুর হিসেবে ও তারও চাইতে বড় কথা রাস্তা বানানোর কাজটা খুবই জরুরী। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বি·আর·টি·এফ-এর খরচা দেয় ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তর। তাই মিজোরাম ও উত্তর-পূর্বের আর সব রাজ্যই একরকমের রাস্তা তৈরির কাজ আরও চায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি ভেবে দেখেছেন, যে 'ঝুমিয়া'-রা খেতেই পায় না, তাদের কেন রাস্তা তৈরির কাজে লাগান হয় না। তাঁর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যেরও মুখ্যমন্ত্রীদের তো ঐ একটাই দুশ্চিন্তা, ঝুমিয়ারা যাতে রেশন তুলতে পারে, সেই পয়সা তাদের কি করে পাইয়ে দেয়া যায়। ঝুমিয়ারা বড় জোর চার-পাঁচ মাস চালানোর মতো ধান তুলতে পারে। সেজন্য ফুড কর্পোরেশনের চাল একেবারে ঝুমিয়া গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়, মাথায় বয়ে। যাতায়াতের খরচ সরকার বহন করে।

নানারকম ঋণ, চাকরির ব্যবস্থা, পুরনো ঋণ মকুব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মিজো বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ দমনকালীন বিপর্যয় থেকে কৃষি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার সৈলোর পরিকল্পনা আছে জল সরবরাহ, রাস্তা ও স্থায়ী চাষ জমির ভিত্তিতে পাহাড়ের ওপর নতুন গ্রাম গড়ে তোলার। এটা একটা বিরাট কাজ। মিজোরামে এখন ৭২১টি গ্রাম আছে—তার ভেতর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নির্মিত ও সংরক্ষিত গ্রামগুলিও পড়ে, ভয়ে মিজোরা এগুলোকে বলে থলাবক্স। রাস্তাঘাট বাড়িঘর নির্মাণের কোনো মজুর নেই, কৃষিকাজের কোনো চাষী নেই—এতেই বোঝা যায় এই পরিকল্পনার রূপায়ণ কত কঠিন।

তাই চাকমা ও নেপালির মিজোরামের অর্থনীতিতে হয়ে উঠেছে অপরিহার্য আর তারা সমাজে হয়ে উঠেছে পরিহার্য। এ সমস্যার সমাধান কোথায়?

ডি·এস· শর্মা

কলকাতা

কলেজে ছাত্রভর্তি: প্রকাশ্যে ও আড়ালে

অল্প কিছুকাল আগে স্কুলে এবং কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রভর্তি শেষ হয়েছে। এখন চলছে ডিগ্রি কোর্সে ছাত্রভর্তির পালা। আজকাল অবশ্য উচ্চ-মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার ঝঞ্ঝাটটাই বেশি। ডিগ্রিতে, বিশেষ করে অনার্স ক্লাসে, ভর্তি হওয়ার দায় ও সমস্যাও কম নয়—কিন্তু তার ধরন আলাদা। আবার কলকাতা শহরের কলেজগুলিতে সমস্যার যে প্রকৃতি, তা নিশ্চয়ই মফস্বলের কলেজগুলিতে দেখা যায় না। কলকাতাতেই বা কী সব এক? সেন্ট জেভিয়ার্স, লেডি ব্রেবোর্ন বা বেথুন কলেজে যে ছবি পাওয়া যাবে, তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না চারুচন্দ্র, আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ বা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে। আবার মিলটাও চোখে পড়ার মতো দক্ষিণ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ কলেজ (যেটা ছিল আশুতোষ কলেজের সান্ধ্য বিভাগ), মধ্য কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ কিংবা উত্তর কলকাতার শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ—ইতস্তত নানা কলেজ ঘোরার অভিজ্ঞতায় যদি এই তিনটিকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়—দেখা যাবে, সূক্ষ্ম নিয়মকানুনের হেরফের বাদ দিলে তিনটিতেই ছাত্রভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার একটা জোর টানাপোড়েন চলেছে কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক সব শ্রেণীর মধ্যেই। তবে সর্বটাই যে আশার কথা তা-ও নয়, মাঝে-মাঝেই সরষের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে যায় ভূত।

কলেজে ছাত্রভর্তি নি[illegible] গোলমাল দীর্ঘকালের ব্যাপার এ নিয়ে প্রতিবারই তুমুল হট্টগোল-সমালোচনা, কাগজপত্তরে লেখালেখি। এর পেছনের কতকগুলো কারণ খুব স্পষ্ট। যেমন, প্রথমত, বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য অভিভাবকদের আকুলতা। অল্পমাত্রায় হলেও সে-আকুলতা বাণিজ্যবিভাগে পড়ানোর জন্যও। দ্বিতীয়ত, বিশেষ-বিশেষ কলেজে পড়ানোর ইচ্ছে—গ্রামের ছেলেরা শহরের কলেজে এবং শহরতলির ছেলেরা খাস কলকাতার কলেজে। এই আকুলতা বা ইচ্ছের পেছনে যেমন বিচিত্র মনস্তত্ত্ব কাজ করে, তেমনি কোনো বাস্তব সংগত কারণও যে নেই এমন নয়। কোনো বিশেষ কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা বা ল্যাবরেটরির সমৃদ্ধি সম্পর্কে ঠিক হোক ভুল হোক যখন একটা নামডাক তৈরি হয়, তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই অভিভাবকেরা সেদিকে ছোটেন। যতদিন না সমস্ত বিদ্যায়তনের মান কাছাকাছি হয়, ততদিন এটা ঘটবেই। বিজ্ঞানের দিকে যে ঝোঁক, সে-সম্পর্কেও অভিজ্ঞ কেউ কেউ বলেন, অপেক্ষাকৃত কম-মার্কস-পাওয়া সাধারণভাবে বিজ্ঞান পড়ারই অনুপযুক্ত, সুতরাং তাদের পক্ষে এই দৌড়াদৌড়ি অহেতুক এবং সুযোগ পেলেও বিপর্যয়কর। কথাটা সত্যি হলেও অর্থহীন। কারণ, এ-কথা অভিভাবকরা জানেন, বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু পড়লেও তাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বস্তুত কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে ছাত্রের ভবিষ্যতের সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের প্রত্যাশা সামান্যই। সমস্তটাই, যাকে বলে, আশার বিপরীতে আশা। সুতরাং, ছাত্রদের বিষয়-নির্বাচন এবং সে-ব্যাপারে ভারসাম্যহীনতাই ছাত্রভর্তি-সমস্যার যে একটা বড় কারণ সন্দেহ নেই। মাঝে-মাঝেই তাই, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেব কষে দেখিয়ে দেন, কলেজে-কলেজে আসন-সংখ্যা এবং পাশ-করা ছাত্রের সংখ্যার সুষম অনুপাত।

সময়-সময় বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি বা সিদ্ধান্তও নতুন নতুন সমস্যার জট তৈরি করে। যেমন, সম্প্রতি কয়েক বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশি মার্কস দেওয়ার উদারতায় পাশের সংখ্যা বা উচ্চতর ডিভিশন প্রাপ্তদের সংখ্যা বিস্ময়কর রকমের বেড়ে গেছে। অবজেকটিভ টেস্ট, প্রশ্নপত্র তৈরি ও মার্কস দেওয়ার নতুন নতুন পদ্ধতি—সব কিছুর মধ্যে এমন একটা নীতি অনুসৃত হচ্ছে—পক্ষে বা বিপক্ষে যা-ই মত হোক—যার ফলে বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্ররা সাধারণ কলেজেও ভিড় করছে, নামী কলেজগুলিতে ভর্তি

হওয়ার জন্য নিম্নতম মার্কস ও আকাশছোঁয়া (সে-সব কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য স্টার মার্কস-ও যথেষ্ট নয়) এবং শুধুমাত্র পাশ-করা ছাত্রের পক্ষে ছোট স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই

কলেজগুলিতে উচ্চ-মাধ্যমিক বা ডিগ্রি কোর্সের ছাত্রভর্তির সময় কলেজের সামনে বা ভেতরেও যে দৃশ্যের অবতারণা হয়., তাকে মোটামুটি প্রায় বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেখা যাবে, অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ-কেউ আর কাউকে না পেয়ে কলেজের অধস্তন কর্মচারী, এমনকি দারোয়ানকেই খোশামোদ করছেন। অভিভাবকরা কেউ কেউ স্টাফরুমের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো বিশেষ শিক্ষকের জন্য অপেক্ষা করছেন—যদি তাঁকে 'ধরে' কিছু করা যায়। কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় ফর্ম নেওয়ার জন্য বা অ্যাডমিশন কমিটির সঙ্গে ইন্টার-ভিউয়ের জন্য। ছাত্র-ইউনিয়নের সদস্যদের ছোটাছুটি। তারা এক-একজন ছাত্রকে নিয়ে ব্যস্ত। ইউনিয়ন অফিসে ভিড় করে ফর্ম-ভর্তি-করা চলছে। সব মিলিয়ে বিশৃঙ্খল কোলাহল।

ভর্তি হওয়ার একটা নীতি-নিয়ম বা নিম্নতম মার্কস সবই ঠিক করা আছে। এমনকি নোটিশবোর্ডে টাঙানোও হয়েছে। কিন্তু একটু ভেতরের খবর নিলেই দেখা যাবে, অ্যাডমিশন কমিটি তাদের মিটিঙে কিছু-কিছু ভাগ-বাটোয়ারা আগেই করে নিয়েছে। তাকে বলা হয় 'কোটা'। ছাত্র-ইউনিয়নের কোটা, অধ্যাপকদের কোটা, অশিক্ষক কর্মচারীদের কোটা, এমনকি অধ্যক্ষের কোটা। কখনও-কখনও সেই কোটাতে ঢালাও ভর্তি, কখনও-কখনও কিছু মার্কসের গ্রেস। ছাত্ররা তাদের ভাবী কর্মীদের ভর্তি করাবে। অধ্যাপকরা তাঁদের ভাগে, বন্ধুপুত্র কিংবা প্রতিবেশী-পুত্রকে ভর্তি করাবেন। অধ্যক্ষের কোটায় ভর্তি হবে তাঁর পরিচিত ছাড়াও বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি বা ডি· পি· আই· দপ্তর বা আঞ্চলিক থানা বা পাড়ার মাস্তানদের পাঠানো ছেলে। সুতরাং তাঁর কোটাটা একটু বড় হওয়া চাই। অ্যাডমিশন কমিটির মিটিঙের প্রধান কর্মসূচী এই কোটার সংখ্যা স্থির করা—কার কত কোটা। তা নিয়েই বচসা, দরাদরি, ইত্যাদি। এঁরা বলেন, ওঁরা যদি নেন তবে আমরা নেব না কেন, ইত্যাদি। ভর্তির এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিভাবকরা সবটা না হলেও কিছু কিছু জানেন। তাই তাঁরা ধর্না দেন পরিচিত বা অর্ধপরিচিত অধ্যাপকদের কাছে। 'তাঁর কোটায়' নিয়ে নেওয়ার জন্য।

মাঝে-মাঝে হিস্যা নিয়ে মনান্তর ঘটলেও এরকমই সুখী ব্যবস্থা বহু কলেজে চলছিল। নামী কলেজগুলিতে প্রকাশ্যত কোটা থাকত না বটে, কিন্তু তলে তলে অধ্যক্ষের সুপারিশে ভর্তি করানোর হুকুম আসত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে। যুক্তিও ছিল এর সপক্ষে। এমনকি শিক্ষকদের মধ্যেও এরকম কথাবার্তা "আমাদের ছেলেরা কোথায় যাবে?" (এখানে 'আমাদের ছেলে' বলতে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের ছেলে) "বন্ধুবান্ধবদের 'না' বলব কেমন করে?" "সমাজে যখন এত দুর্নীতি তখন আমরা কী একাই সব পালটাতে পারব?"

তবু অস্বস্তিতে ছিলেন হয়ত অনেকেই এই ব্যবস্থায়। তাই স্টাফ-কাউন্সিলের মিটিঙে সমালোচনা-আত্মসমালোচনা উঠত না এমন নয়। ছাত্রও এই 'দুর্নীতি' দূর করার কথা বলত, অন্তত মুখে বা দেয়াল-লিখনে। নিশ্চয়ই সরকারি দপ্তরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কানেও পৌঁছেছিল এই চোরা-দুর্নীতির খবর। শিক্ষামন্ত্রীর মাঝেমধ্যে বিবৃতিও ছাপা হয়েছে কাগজে, এই বন্টনব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য।

১৯৮২ সালের ১৯ আগস্ট তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর অব কলেজেস্-এর দপ্তর থেকে ভর্তি-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার পাঠানো হলো কলেজে কলেজে। পৌঁছলো আরও পরে। ততদিনে ভর্তিশেষ। জানানো হয়েছিল "খবর পাওয়া গেছে কোনো কোনো কলেজ কম-মার্কস-পাওয়া ছাত্রদের ভর্তি করছে ছাত্র-ইউনিয়নের সুপারিশে—এর সাংকেতিক নাম হলো 'স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কোটা' এবং বেশি-মার্কস-পাওয়া ছাত্রদের ভর্তি হতে দেওয়া হচ্ছে না। এটা চলতে দেওয়া যায় না—শীগগিরি'রদ হওয়া দরকার। যেখানে ভর্তির জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে ছাড়া অন্যত্র বিগত পাবলিক পরীক্ষায় পাওয়া মার্কসের বিবেচনায় কঠোরভাবে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতেই ছাত্র ভর্তি করতে হবে। ছাত্র ইউনিয়নের সুপারিশে যদি কাউকে ভর্তি করা হয়, অথচ তার নির্দিষ্ট মান না থাকে, তবে তা অবিলম্বে বাতিল হবে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে।" নিচে কর্মরত ইনস্পেক্টর অব কলেজেসের সই।

দোষটা শুধু ছাত্র-ইউনিয়নের উপর পড়েছে এবং এটাও হয়ত ঠিক নিয়ম-লঙ্ঘনটা প্রথমে সেখান থেকেই অনেকসময় শুরু হয়—কিন্তু আর সবাই ধোয়া তুলসিপাতা এমনও নয়। সে-খবরও নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের কানে পৌঁছয়। ফলে এ-বছরের সার্কুলারে সংশোধন করে জানানো হল কারোরই কোটা থাকবে না—ছাত্র, অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মচারী কারোরই না।

কলকাতা এবং শহরতলির বেশ কয়েকটা কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই সার্কুলারের জন্যই হোক কিংবা শিক্ষক-ছাত্র সকলেরই ক্রমশ ন্যায়বোধ জেগে ওঠার ফলেই হোক, ভর্তিতে এই কোটা-প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, বা অন্তত সেই দিকেই এগিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই কলেজের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবাই অবশ্যই নিজেদেরই স্বার্থে, ভর্তির ব্যাপারটায় খুব কড়া নজর রাখতেন—ফলে স্বভাবতই পারস্পরিক নজরদারি ঘটে যেত। এবার কোটা-ব্যবস্থার মুলেই যে ঘা পড়েছে, এটা ভালো কথা।

যেমন, উত্তর কলকাতার একটি বড় কলেজে গিয়ে এবার ভর্তির যে ব্যবস্থা চাক্ষুষ করা গেল, তা এককথায় চমকপ্রদ। সুপারিনটেনডেন্টের ঘরের সামনে লাইন পড়েছে। কিন্তু অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, কোনো ধাক্কাধাক্কি নেই। ছাত্র-ইউনিয়নের ছেলেরাই তদারকি করছে। তারা এক-একজন ছেলেকে ঢুকতে দিচ্ছে। উঁকি মেরে দেখা গেল, যাঁরা চেয়ারে বসে আছেন (অ্যাডমিশন কমিটির অধ্যাপকেরা), তাঁরা মার্কসিটের সঙ্গে সামনে-রাখা 'নির্দেশ' মিলিয়ে-মিলিয়ে কাউকে ফেরৎ দিচ্ছেন, কাউকে সই করে ফর্ম দিচ্ছেন। যারা ফর্ম নিয়ে বেরোচ্ছে তাদের চোখেমুখে স্বস্তি। ছাত্রকর্মীরা কাছে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, "১৪ নং ঘরে চলে যান, ওখানে আমাদের কর্মীরা আপনাকে ফর্ম ভর্তি করতে সাহায্য করবে।" আর থাকতে না পেরে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতেই হল, "তোমরা ভাই, ভর্তির ব্যাপারে এরকম সাহায্য করছ অধ্যাপকদের—তোমাদের নিজেদের ক্যান্ডিডেট ভর্তি করছ না?" আগের-আগের বছরের শোনা-দেখার অভিজ্ঞতায় এই প্রশ্ন। ছেলেটি দেখিয়ে দিল তাদের এক নেতাকে—ইউনিয়নের সম্পাদক। সে বেশ সগর্বেই বলল, "আমাদের কোনো কোটা নেই কারোরই নেই। অ্যাডমিশন কমিটিতে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আমরাও আছি। পর্যবেক্ষক হিসেবে। আমাদের মতও শোনা হয়েছে। আমরা প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছি, অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মচারীদের যদি কোনো কোটা না থাকে, তবে আমরা ছাত্র-ইউনিয়নও কোনো কোটা চাইব না। তাই ঠিক হল। কারোরই কোনো কোটা নেই। শুধু মার্কসের ভিত্তিতে ভর্তি হবে।"

চমক যেন ভাঙতেই চায় না। ১৪নং ঘরের সামনে ফর্ম ভর্তি [illegible] বেরিয়ে-আসা এক অভিভাবক উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানালেন ছাত্রকর্মীদের সহায়তার কথা। কীরকম ধৈর্য ধরে তারা প্রত্যেককে সাহায্য করছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে [illegible] নিয়মকানুন—কোথায় কী [illegible] হবে—কী কী সাবজেক্ট [illegible] এখানে। কলেজ-কর্তৃপক্ষ প্রসপেকস্টাস ছাপাতে দিয়েছেন এখনো ছেপে আসেনি। ফলে [illegible] সাহায্য হয়ে উঠেছে খুব জরুরী।

খানিকবাদে অ্যাডমিশন কমিটির একজন অধ্যাপকেরও দেখা [illegible] ঘর থেকে বেরোতেই তার [illegible]

নিলাম। তিনি খুবই বিশদ করে বললেন। এর আগের কোনো-কোনো বছরে মার্কস দেখেই ভর্তি করা হতো বটে, কিন্তু অধ্যক্ষ-অধ্যাপক-কর্মী-ছাত্র সকলেরই কোটা থাকত। একজন বা দুজন। কোনো বছর তাঁরা একজন বা দুজন ক্যান্ডিডেটের জন্য কিছু নম্বর ছাড় পেতেন। ফাউন্ডার বা বিশেষ কারোর সুপারিশের কথা ভেবে অধ্যক্ষের হাতেও বেশ কিছু আসন থাকত। স্বভাবতই ছাত্ররাও চাইত কিছু নির্দিষ্ট আসন। ইউনিয়ন খানিকটা দলগত স্বার্থেই কম-মার্কস-পাওয়া কিছু ছাত্রকে ভর্তি করাতে পারত। ফলে বিরাট একটা জটিলতা তৈরি হতো। অধ্যক্ষের উপরও খুব চাপ পড়ত। সমস্ত কলেজ জুড়ে একটা লেনদেনের আবহাওয়াও তৈরি হতো। যাঁর প্রার্থী নেই, তিনি অন্যের জন্য ছেড়ে দিতেন তাঁর দাবি। অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন এই ব্যবস্থায়। টিচার্স কাউন্সিলে আত্মসমালোচনা ও ধিক্কারও জমা হতো। এ-বছর প্রথম থেকেই ঠিক হলো, দূর করার চেষ্টা করতে হবে এই দুর্নীতি।

সবচেয়ে সহায়ক হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি। তার চেয়েও ইউনিভার্সিটির সার্কুলার। ওটাকে হাতিয়ার করেই অনেকে মিলে স্থির করে বসলেন, মার্কস ছাড়া আর কিছুই বিচার্য হবে না। খেলোয়াড়, তফসিলী বা প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু আসন আলাদা করে রাখা হল ঠিকই। কিন্তু প্রতিবার ঐ যে জুজু দেখানো হয়, রাইটার্স বিল্ডিংসের বিশেষ বিশেষ কর্মচারীদের পাঠানো প্রার্থীকে ভর্তি করাতে না পারলে মাইনে আটকে যাবে, কিংবা পাড়ার ছেলেদের ভর্তি না করলে কলেজে ঢোকা যাবে না—তার পরখ করতে চাইলেন কমিটির সদস্যরা। এবার কমিটিতে রাখা হয়েছে কয়েকজন ছাত্র-ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে, পর্যবেক্ষক হিসেবে। এই ব্যবস্থা যে কতদূর ভালো, তা বোঝা গেছে। দেখা গেছে, অন্যদের চেয়ে একটুও কম দায়িত্ববান নয় তারা। সকলের সব কোটা বন্ধ করার কথা একই রকম জোর দিয়ে বলেছে তারাও—সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি সার্কুলার বা নীতির কথা।

এরকম ছবি হয়ত সব কলেজে অবিকল পাওয়া যাবে না। কিন্তু হাওয়া পালটাচ্ছে বোঝা যায় অনেক কলেজে গিয়েই। হাওয়া কখনো উলটো-পালটাও। এমনকি উত্তর কলকাতার যে কলেজটির কথা বলা হলো, সেও সেখানকার স্থায়ী অভিজ্ঞতা নয়। কয়েকদিন পরেই ঐ অধ্যাপকের সঙ্গে আবার দেখা। এবার তিনি যেন কিছুটা অধোবদন। জানালেন, "বিশুদ্ধ নিয়মে আমাদের নির্দিষ্ট আসন তো ভর্তি হয়ে গেল। এরপরে মিটিঙ বসল, সম্ভাব্য ড্রপিং বা ছেড়ে-যাওয়া ছাত্রদের জায়গায় কিছু অতিরিক্ত ছাত্র নেওয়া হবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নিতে। এ আলোচনায় দেখা গেল, অনেকেই খুব উৎসাহী। অন্যরকমের উৎসাহী। যা ভাবা গিয়েছিল—কর্তৃপক্ষদের কেউ-কেউ বলতে লাগলেন, ইউনিভার্সিটির ওমুক একজন পাঠিয়েছেন, ডি· পি· আই-এর তমুক প্রভাবশালী কেরানি আরেকজনকে পাঠিয়েছেন, ইত্যাদি। ভয় দেখানো হতে লাগল, ও-সব 'কেস' না-হলে গভর্নমেন্ট-ইউনিভার্সিটি নানা অছিলায় বিপদে ফেলবে। তা ছাড়া দোষত্রুটি তো আমাদের হয়ই। নানা ব্যাপারেই হাত পাততে হয় ওদের কাছে।

বিশ্ববিদ্যালয়-সরকার যে দলের হাতে, ছাত্র-ইউনিয়ন বা অধ্যাপক-সমিতিও সে-দলেরই। তবু এক-অংশ আরেক অংশের ব্যক্তিগত দুর্নীতিমূলক আচরণকে ভয় পাচ্ছে, মেনে নিচ্ছে, লড়াই করার কথা বলছে না। খানিকটা যা সৎভাবে করা গেছে, তাতেই যেন সকলে খুশি। বাকি সামান্য কটায় ঐ বন্দোবস্তে যেতেই হবে! কারণ পেছনে জুজু রয়েছে, কলেজে কারা যেন কী ক্ষতি করবে! আর তা সময়মতো মনে করিয়ে দেওয়ার লোকও রয়ে গেছে ঠিক। ছাত্ররাও এই বন্দোবস্তে সোৎসাহ সমর্থন জানাল। তারা তো কোটার বিরুদ্ধে বরাবরই—কিন্তু "স্যারেরা যখন বলছেন তখন তো কলেজের কথা ভাবতেই হবে··· তা ছাড়া আমাদেরও তো খুব অসুবিধা হচ্ছে··· খুব চাপ··· দু-একজনকে না ঢোকালে সংগঠনই বা টেকে কী করে··· বাড়ে কী করে?" শিক্ষকরা বললেন, "ছাত্রদের যখন থাকবে, তখন আমরাই বা কী জবাব দেব আমাদের বন্ধুবান্ধবদের···।"

ছাত্রভর্তি নিয়ে চমৎকার একটি একাঙ্কিকা লিখেছিলেন মারাঠী নাট্যকার মাধব অচওয়াল। সমস্যাটা অবিকল একই। সেখানে দুর্নীতিমুক্ত ভর্তিব্যবস্থার নাছোড়বান্দা সমর্থক এক নবীন অধ্যাপককে শুনতে হয়েছিল 'বাস্তববাদী' অধ্যক্ষের উপদেশ। অধ্যাপক বলেছিলেন, "এ একেবারে নোংরা ব্যাপার!" উত্তরে অধ্যক্ষ "আরে বাবা, গোটা জীবনটাই তো নোংরা ব্যাপারে ভর্তি! আপনি কি নিজের হাত দুটো পরিষ্কার রাখতে চান নাকি?" □

ডঃ ফারুক আবদুল্লা কলকাতায় আসছেন

গত ২২ জুলাই বেলা এগারোটায় শ্রীনগরে, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে কাশ্মীরের নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ফারুক আবদুল্লা প্রতিক্ষণ এর সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানান, যে, অগাস্ট মাসের মাঝামাঝি তিনি কলকাতায় আসছেন।

তাঁর আসার উদ্দেশ্য হল, কাশ্মীরের শিল্পায়নে উন্নতির জন্য পশ্চিমবাংলার দক্ষ ও কৃতী শিল্পপতিদের তিনি আমন্ত্রণ জানাবেন যাতে কাশ্মীরে তাঁদের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা উৎসাহিত হন।

নির্বাচনে জয়লাভের পর ডঃ আবদুল্লা নির্বাচনী অঙ্গীকার কার্যকর করায় বদ্ধপরিকর বলে 'প্রতিক্ষণ'-কে বলেন। শিল্পবিকাশ এই মুহূর্তে কাশ্মীরে অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে পাঞ্জাব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত ডঃ আবদুল্লা নিতে বাধ্য হয়েছেন। পাঞ্জাবের ভেতর দিয়েই কাশ্মীরের সমস্ত কিছু সরবরাহ আসে চলতেই থাকে, তবে কাশ্মীরের বিভিন্ন জায়গায় তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাই ডঃ আবদুল্লা চান কাশ্মীরকে আরও স্বয়ম্ভর করে তুলতে।

কাশ্মীরে শিল্পায়নে অনেক সুযোগ সুবিধে দেওয়া হবে। তিনি বিস্তৃত কিছু বলতে দ্বিধা করেন, কারণ তাঁর সফরের দিনক্ষণ এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। তবে তিনি অগাস্টে আসছেন—এটা নিশ্চিত। বোধ হয় মাসের মাঝামাঝি। □

বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকা এবং তাঁর বই 'কালের পুতুল' বাংলা কবিতার আধুনিকতার দিকে অপ্রস্তুত পাঠকেরও মুখ কিছুটা ফিরিয়েছিল। 'এক পয়সায় একটি' তো এখন অনেকেরই সুখস্মৃতি। আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনটির কবিতা-নির্বাচন ও মুখবন্ধ পাঠককে সাহায্য করেছিল আধুনিকতার স্বরূপে সামাজিক রাজনৈতিক পটের গুরুত্বকে বুঝে নিতে। তারও আগে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' শুধু বিদেশী সাহিত্য নয়, স্বদেশের সাহিত্যকেও নতুন দৃষ্টিতে দেখার শিক্ষা দিয়েছিল। হয়ত এ-সমস্ত ঘটতে পেরেছে অগ্রসর পাঠকের রুচির ক্ষেত্রেই। সেরকমই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মহিমা সম্পর্কে পাঠককে আরও বেশি সজ্ঞান করে তুলতে পেরেছিল ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ননী ভৌমিক, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বা অধুনা যুগান্তর চক্রবর্তী ও প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের আলোচনা। শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্যের সম্পাদনা ও আলোচনার গুণে সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে আমাদের আজকের পাঠক অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। জগদীশ গুপ্তের দিকে সুবীর রায়চৌধুরী কী আমাদের পাঠকদের চোখ ফেরান নি? এমন কি কমলকুমার মজুমদার সম্পর্কেও দেবেশ রায়, বা বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত সম্প্রতি? কবিতার ক্ষেত্রেও এরকমই উল্লেখ করা যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে অমলেন্দু বসু থেকে অশ্রু কুমার সিকদার পর্যন্ত অনেকেরই নাম। কিংবা বয়সের দিক থেকে আরেকটু কাছে এসে সুতপা ভট্টাচার্য বা সুমিতা চক্রবর্তীর মতো কেউ-কেউ। একেক কবির গ্রন্থি উন্মোচনে তাঁরা বিচ্ছিন্নভাবে অনেকটাই সাহায্য করে চলেছেন। বলাই বাহুল্য, সমস্ত নামগুলোই করা হল খুব এলোমেলো, সম্পূর্ণতার কোনো চেষ্টাই নেই। উদ্দেশ্য শুধু এ-কথা বলা, কাজ অল্পবিস্তর হয়ত হচ্ছে এখনও। বহু ছোট-ছোট পত্রিকার সমালোচকদের অনেকেই কমবেশি সেই দায় পালন করেছেন বা করছেন। নিজেদের রুচির পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে পাঠকের রুচি নির্মাণের দায়।

কিন্তু মানতেই হবে, এ-সমস্তই ব্যতিক্রমের কথা। যেটুকু আঁচড় তা কাটে, তাকে হয়ত আমরা অতিকায় করেই দেখছি। জনরুচির অন্ধশক্তি অনড় পাহাড়ের মতো সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে টলানো খুব শক্ত। খুব জোরালো যুক্তিগ্রাহ্য সমালোচনাও, দেখা যায়, জনরুচি যাকে ধরে বসে, তাকে নাড়াতে পারে না।

কালের পুতুল

বুদ্ধদেব বসু

ঠিকই, অনেকের অনেক স্বতন্ত্র শিক্ষা ও সংস্কার নিয়েই গড়ে ওঠে জনরুচি। কিন্তু জনরুচির আবার একটা নিজস্ব ওজন ও স্বভাব আছে — তাকে উলটে দেওয়া সম্ভব নয় সমাজ বা পরিবেশ না পালটে। অর্থাৎ, সমালোচনার যেমন চাপ আছে সমাজের ওপর, যতই তা ক্ষীণ হোক না কেন, তেমনি, তার চেয়েও বড় কথা, সামাজিক মানসেরও কোনো কার্যকারণ আছে সমালোচনায় অবিচলিত থাকার।

এর সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধের দ্বিধা ও ভাবালুতা বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন পাঠক বহুদিন ধরেই বিরাগ প্রকাশ করেছেন। তবু কোনো প্রাজ্ঞ সমালোচকই সেই আপত্তিকে চারিয়ে দিতে পারেননি সমাজমানসে। কারণ নিশ্চয়ই বহু — সামাজিক ও সাহিত্যিকও। এখনও সব দেশে বহুকাল ধরেই চিত্তাকর্ষক গল্প বলার ধরনটাই আসল। আর তাতে শরৎচন্দ্রের দক্ষতা তো তর্কাতীত। তাই জনপ্রিয়তার তালিকায় সারা ভারতেই এখনও তিনি চুড়োয়। তুলনায়, সমালোচকরা যতই তোলপাড় করুন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সুদূর 'অপঠিত.....নেই আর কোনও আবেদন'।

হয়ত শরৎচন্দ্র সম্পর্কে উঁচকপালে পাঠক ও সমালোচকেরও কিছু আত্মজিজ্ঞাসার অবকাশ আছে। কিন্তু বাজারী বহু কাহিনীকারের জনপ্রিয়তা কি রুচি ও প্রগতির অনিবার্য ব্যর্থতাই নয়?

পাঠকদের মানসিকতার অবশ্য একটা সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়ঃ যে-লেখক একবার প্রতিষ্ঠিত ঘ জনপ্রিয় হন, একটা ঝোঁক থাকে সেই প্রতিষ্ঠা বা জনপ্রিয়তা চলতে থাকার। পাঠকের রুচি তখন আর সব সময় স্বাধীন থাকে না। নাবালক মানসিকতার পাঠকের ক্ষেত্রে, কোনো লেখকের ব্যাপক পরিচিতি বা গ্ল্যামারই তাকে টেনে আনে, তার রচনাপাঠকে প্রভাবিত করে। সে-কারণেই দেখা যায়, কোনো লেখকের বইয়ের যখন স্বল্প সময়ের মধ্যে একবার নতুন সংস্করণ বের হয়, তখন পরবর্তী সংস্করণগুলিও বিক্রি হতে থাকে অল্প সময়ের মধ্যে। শুধুমাত্র সাহিত্যকৃতির দিক থেকে তার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। এমনকি সেই একই লেখকের সমপর্যায়ের রচনাও হয়ত সে-সৌভাগ্যে বঞ্চিত। জনপ্রিয়তার পেছনে, আজকের বঙ্গীয় পরিভাষায় বলা যায়, স্থিতিজাড্য ও গতিজাড্য কাজ করে বলে মনে হয়। যে বই বা যার বই বিক্রি হয় না 'পাঠক নেয় না', তার ভাগ্যে সেই ঘটনা ঘটতেই থাকে। যার বই বা যে বই একবার বিক্রি হতে শুরু করল, তার বিক্রি যেন থামতেই চায় না। অন্তত কিছুকাল। অবশ্য এটা একটা সাধারণ সত্য হিসেবে বলা হল — প্রত্যেক লেখক বা বইয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া ঘটে পাঠক বা ক্রেতার আচরণে, সূক্ষ্মভাবে দেখলে। আর তাছাড়া বিক্রি বা না-বিক্রি কিংবা পাঠকের গ্রহণ বা বর্জন, তার ভিন্ন ভিন্ন মাপ বা মাত্রা ও তার ওঠানামা নেই এমন তো নয়।

সমালোচক অবশ্য পারেন সেই জাড্যকে — স্থিতির ও গতির জাড্যকে ভেঙে ফেলতে। সমালোচকের সেটাই তো কাজ। পাঠকরুচির গ্রহণ বর্জনের মূল্যবোধহীন জাড্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো — গ্রহণ বর্জনের নতুন মূল্যবোধে নতুন গতির সঞ্চার করা। জাড্যকে পালটানোর শক্তি। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই সমালোচকদের সেই মেরুদণ্ড বা আত্মকর্তৃত্ব থাকে না — তাঁরাও পাঠকের ঐ পূর্বকথিত মনস্তত্ত্বের দ্বারা চালিত হন। ফলে খ্যাতিমানের আরো খ্যাতি প্রচার করা এবং মরার ওপর আরেকবার খাঁড়ার ঘা ফেলেই সকলে নিশ্চিন্ত। প্রতিষ্ঠিত লেখকের ইমেজ টিকিয়ে রাখাই তাঁদের কাজ। পুরস্কৃত লেখককেই আরেকবার পুরস্কৃত করা। এর ফলে যা হয়, তাহল, নতুন লেখকের পক্ষে চোখের সামনে হাজির হওয়াটাই একটা বড় লড়াই।

তাই অনেক দিনের অভিজ্ঞ সমালোচকও, দেখা যায়, বই বিক্রির হিসেবের দ্বারা অজ্ঞান্তে চালিত হন, পাঠকের রুচির নৈরাজ্যে ওঠেন-বসেন। আমাদের শিক্ষা ও রুচির বিপর্যস্ত পরিবেশে পাঠক-সাধারণ তো চাইতেই পারেন রোমহর্ষক গল্প, নাটকে উত্তেজনা — কিন্তু সমালোচকও যখন সেই তালে আমাদের সংকটের ও সমস্যার অতিরেক ও উত্তেজনাকে বাস্তবের মাত্রা বলে ভুল করেন, তখন বোঝা যায় রুচির স্বাবলম্বন সমালোচকের পক্ষেও কত কঠিন। তা না হলে সমরেশ বসু-র দীর্ঘ বাস্তবতার পথসন্ধানেই আমরা খুশি থাকতাম, পরবর্তী কল্পবাস্তবে তার ধারাবাহিকতা খুঁজতাম না। মহাশ্বেতা দেবীর আসল জোরটা কোথায় ভুলে গিয়ে তিনি তারাশঙ্করকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, এই ভ্রান্ত উপমায় লুব্ধ হতাম না। অথচ পাঠকের কাছ থেকে সম্প্রসারিত এই লোভ ও উত্তেজনাই তো আমাদের কোনো কোনো সমালোচককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। □

বুড়িয়ে না-যাওয়া গল্প / দেবেশ রায়

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের লেখার প্রতি আমার আসক্তি প্রায় অন্ধ। চোখে পড়ে গেলে, তাঁর আট-দশ লাইনের লেখাও পড়ব-কি-পড়ব-না ভাবার আগেই পড়ে ফেলি। দু-একবার এ-রকমও মনে হয়েছে, এ-সব লেখা এক ছোট বলে চোখের অভ্যেসে পড়া হয়ে যায়। কিন্তু ক্বচিৎ-কদাচ তাঁর যে সব বড় লেখা বেরিয়েছে সেগুলো পড়ে না ফেলা পর্যন্ত অস্বস্তিতে ভুগে নিজের আসক্ততা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

সন্দীপনের বই বেরয় দশকের হিসেবে। আর এ-ও তো জানাই যে তাঁর নতুনতম বইয়েও থাকতে পারে পুরনো কিছু চেনা লেখা। কিন্তু, সন্দীপনের লেখা এত কম বেরোয় আর এত কমই তারা বই-এ বাঁধা হয়, তাঁর কোনো লেখাই বড় বেশি চেনা হয়ে যেতে পারে না। বই-এ সে সব লেখা নতুন তো ঠেকেই, বরং দুটো মলাটে একটা ফ্রেমও জোটে লেখাগুলির, আর, আরো কিছু লেখার প্রতিবেশিতায় এক একটি লেখার চেহারা চরিত্রও বদলে যায়।

নিজের লেখাকে এমন অচেনা রেখে দেয়া অনেক লেখকের পক্ষেই সম্ভব হয় না, সম্ভব হয়নি। আমাদের এই সময়ে নিজের গদ্যকে নিজেরই রেখে দেয়া খুব কঠিন; প্রায় যেন অসম্ভব। এক হতে পারে মৌলিকতায় প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে আত্মরক্ষা। কিন্তু সন্দীপন তেমন গদ্য লেখেন না। সন্দীপন তাঁর ভাষায় যে চলচ্ছক্তি সঞ্চার করেন তা গত কয়েক বছরে বাংলার জনসংযোগের ভাষাকেও অনেকখানি বদলে দিয়েছে। জনসংযোগ বলতে শুধু খবরের কাগজ বা বিজ্ঞাপনই নয়; সাহিত্য শিল্প চর্চার ছোট কাগজও তার সীমাবদ্ধ পাঠকের সঙ্গে সেতু তৈরির যেভাষা ব্যবহার করে, তাকে একজন কোনো লেখকের ভাষা যদি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে থাকে তবে তিনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

সে কারণে, সন্দীপনের পক্ষে তার নিজের লেখাকে একান্ত নিজেরই রেখে দেয়া আরো কঠিন। কিন্তু সন্দীপন তা পেরেছেন। তাঁর কোনো গল্পকেই মনে হয় না—বয়েস হয়ে গেছে বুড়ো হয়ে গেছে। প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা গল্পগুলি আজও যেন প্রথম পাঠকের জন্যে তৈরি। আর, আজও তার গল্প নিয়ে প্রায় সেই তিরিশ বছর আগের মতোই তর্ক বাধতে পারে—পক্ষে-বিপক্ষে।

আটটি গল্প নিয়ে তাঁর এই ১১৪ পৃষ্ঠার নতুন বইটিতে আমাদের তাই প্রথমেই দেখতে ইচ্ছে হয়— একটা বই তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে লেখাগুলো কোন ফ্রেমে আটকা পড়ছে, আর, একটি গল্প আর একটি গল্পকে কতটুকু নতুন করে দিচ্ছে।

সন্দীপনের সব গল্পই নাগরিক পরাজয়ের ধারাবাহিক কাহিনী—সেই আমাদের নাগরিকজীবন রাজনীতির ওতপ্রোত। সন্দীপনের গল্পগুলিতেও তাই রাজনীতি আসে সেই পরাজয়ের বিবরণের সঙ্গে নানা গোপন জটিল পথে। এই বইটির প্রথম গল্প, 'বিপ্লব ও রাজমোহন' ৬৯ সালে লেখা। সারা গল্পে কোথাও বিপ্লবের নামগন্ধ নেই। কিন্তু পুরো গল্পটি তৈরি হয় আপাতশিথিল দুটি ভাগে। প্রথম ভাগে রাজমোহন কী করে একটা পছন্দসই বুককেশ বানিয়েছিল—সেই তথ্যটি জানাতে হয়। গল্পে এমন তথ্যের দায় বড় কঠিন। তাকে কাহিনীর অনিবার্যতায় মেশাতে হয়, অথচ, তাকে রাখতে হয় এত হালকা যেন তা কাহিনীর ভিতর ঢুকে না পড়ে। আমরা যারা আধুনিক পাঠক, তারা তো শুধু ঘটনার চলমানতাতেই বিশ্বাস করি; তার উৎসেও আমাদের আগ্রহ নেই, পরিণতির প্রতিও আমাদের কোনো টান নেই। সন্দীপন সেই কাজটি সারেন খুব ভালোভাবে। তারপর শুরু হয়ে যায় আসল গল্প। সেটি আর কিছুই নয়—রাজমোহন বইপত্রসহ এই বুককেশটি পুড়িয়ে ফেলে। সন্দীপন এই পোড়ানোর পদ্ধতিটিকে বেশ খুঁটিয়ে লেখেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই দেন পোড়া বইগুলোর বিবরণ। সে বিবরণে রাজমোহনের স্মৃতিও কাজ করে বটে, কিন্তু গল্পটি শেষ হয়—"ঘরের আর কিছুই পোড়ে নি, শুধু একটা দেওয়ালে শিলিঙ পর্যন্ত কাঁচা এক্সরে প্লেটের হাড়-পাঁজরের মত আগুনের হল্কা।" ৬৯ সালে, গল্পটির প্রকাশকালে, নকশাল আন্দোলনের বই-পোড়ানো আমাদের নাগরিক বাস্তবতার এতটা অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায়নি, যাতে অনুমান করা যাবে যে সন্দীপন সেখান থেকেই কাহিনীর আদলটা পেয়েছিলেন। অসুখের আগেই এক্সরেতে তার ছবি ওঠে? উঠেছিল?

৭২ সালে, "অংশু সম্পর্কে ২-টো ১-টা কথা যা আমি জানি" যখন বেরিয়েছে, তখন নকশাল আন্দোলন তার তুঙ্গ সময় পেরিয়ে এসেছে। সময়ের সেই নির্দিষ্টতাকে সন্দীপন ঘটনায় কিছু-কিছু আনেন, কিন্তু আবারও গল্পকে তার তথ্যের দরবারে নিয়ে যান অনেক পেছনে, যখন অংশুর জন্ম হয়নি। মায়ের প্রেমিকের ছেলে অংশু—এই পরিচয়টুকু দরকার হয়— সেই প্রেমিকের বৈধ ছেলে তড়িৎ-এর সঙ্গে তার জন্মের গোপন ওসব আবিষ্কারের বাইরের সম্পর্কটুকু বোঝাতে। ঐ তথ্যের ওপর গড়ে ওঠে গল্পের বর্তমান—সেখানে অংশুর আহার নিদ্রা মৈথুনময় নাগরিক দৈনন্দিন আর তড়িতের ঘুমছুট জীবনের বিপরীতটুকু। মধ্যরাতে নিদ্রাময় বিছানা ছেড়ে অংশুকে বৃষ্টিপাতময় ছাদে কয়েকদিন আগে নিহত আর একটি ছেলের রক্তের কাছে যেতে হয়। "দিন চারেক আগের শুকনো রক্ত ফোঁটা-ফোঁটা জল পেয়ে ইতিমধ্যেই বজকে উঠেছে।....এই সামান্য বৃষ্টিতে পিঁপড়েরা এখনো বিব্রত নয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যশ্রেণীর চেয়ে ঢের বেশি শৃঙ্খলার সঙ্গে, প্রকাণ্ড ছাদ পেরিয়ে, মনার রক্তের কিনারা পর্যন্ত তাদের অবিচলিত যাতায়াত আজ ৪ দিন ধরে অব্যাহত।" আমার বা অংশুর আত্ম-পরিচয়ের এই যাত্রার সঙ্কেত সন্দীপন গোড়াতেই দিয়ে রেখেছিলেন, "পুরাণ বর্ণিত থিসিউস, বহুতলা ল্যাবিরিনথ-এর ৩৫০০ অবিকল এক রথে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরের কেন্দ্রে, উৎকর্ণ ও অপেক্ষমান ষণ্ডদানবের দিকে ধোঁয়া ও দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে সেই রোমহর্ষক অবতরণ, চিহ্ন না রেখে গেলে, সূত্র বিনা, সে কখনোই ফিরে আসতে পারত না।" রাজনীতির নৈর্ব্যক্তিক, এমনই ব্যক্তির জন্ম কাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন হয়ে উঠতে পারে, গল্পে।

৭২ সালেই লেখা 'বড় দুঃসময়' গল্পটিতে কেমন মিশে যায় 'অংশু সম্পর্কে...' গল্পটির পরিবেশ সময় আর তা নিয়ে যায় 'মাঝখানের দরজা'-র মতো গল্পের দিকে, যদিও শেষের এই গল্পটি আট আটটি বছর পরে লেখা। একটু শিথিলভাবে বলা যায়, 'বড় দুঃসময়' গল্পটি থেকে ধীরে-ধীরে সময় ঝরে যায়— ঐ নকশাল আন্দোলনে গভীর দাগ দেয়া সময়। সেই আপাত সময়হীনতায় সন্দীপনের গল্পের স্বামী, স্ত্রী ও কিশোরী পরিচারিকা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ও নানা লেখায় ছড়িয়ে পড়তে চায়। নকশাল আন্দোলনের তুল্য আর কোনো আন্দোলন তার পরে আর হয়নি যা আন্দোলন হিসেবে ছিল 'ফরেন', অন্যমূল, তবু, অথবা, হয়ত সে-কারণেই, ঢুকে পড়েছিল আমাদের জীবনযাপনের অন্দর থেকেও অন্দরে। এই অন্যমূল শক্তি আমাদের জীবনের দখল নিয়েছিল—যেভাবে দেশ বা জমির দখল নেয়া হয়, 'বড় দুঃসময়' গল্পের উপকথাতুল্য ষাঁড়টির মতো, "সে এক পা তুলে দরজায় আঘাত করে। মাত্র একটি আঘাতেই হুমড়ি খেয়ে দরজা ভেঙে পড়ে।" "....রাস্তায় নেবে প্রতিবেশী সমাজের

উদ্দেশ্যে আহ্বানে ভরা তৃতীয় হুঙ্কার ছাড়ে। ...তারপর ভালো করে কিছু বোঝার আগেই সামনে খুর গেঁথে, আঁচড়ে, কিছু ধুলো উড়িয়ে, অশ্বের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে গঙ্গার দিকে দৌড়ে যায়।"

'বড় দুঃসময়'-এই আশা নামে কাজের মেয়েটির দিকে গল্পের পুরুষটি কেমন এক অস্পষ্ট সম্বন্ধ নিয়ে তাকায়—বোঝা যায় নৈর্ব্যক্তিক স্নেহ বদলে যাচ্ছে ব্যক্তিগত কোনো এমন সম্পর্কের ঘোর টানে, যেখানে মন নেই। জনসমুদ্রের ঢেউ ভেঙে-ভেঙে মহেন্দ্র সেদিন সেই আশা-র কাছেই এসেছিল।

এসেছিল মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কারণ, 'বড় দুঃসময়'-এ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মীমাংসা ঘটেছিল দুঃসাময়িক এক উপমার কবিত্বে। এই এমন উপমার ব্যবহার কবিতায় হয়ে থাকে, গল্পে হয় না, অন্তত হতো না। যাকে অলঙ্কারের ভাষায় বলা যায়, স্মরণ বা নির্দেশিকা, ইয়োরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয়—রেফারেন্স, তাও গল্পে আসত না। সন্দীপন তাঁর গল্পে এই কবিতাময় উপমা আর স্মৃতিজাগরুক প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। কবিতার উপমা বা প্রসঙ্গের মতোই এর খোসা ছাড়ানো যায় না, আবার খোসা না ছাড়িয়ে ধরাও যায় না। 'অংশু সম্পর্কে....' গল্পটিতে থিসিউস, 'বড় দুঃসময়' গল্পটিতে ষাঁড়— এমনি ব্যবহার। সন্দীপনের আগের গল্পগুলিতেও এ-রকম ব্যবহার দেখা গেছে।

কিন্তু, আবারও সময়ের কথায় আসতে হয়। অন্তত এই বইটিতে দেখছি সময় যখন নকশাল আন্দোলনের শানে গভীর দাগানো নয়, তখন এই উপমা আর স্মরণ গল্প থেকে খসে যায়, থাকে শুধু সময়হীন চরিত্রগুলো, তার মানেই স্মৃতিহীন, উপমাহীন, প্রসঙ্গহীন। 'বড় দুঃসময়'-এর ছ বছর পরে লেখা 'দোলনা'-য় স্বামী ও স্ত্রীর নাম দুটি পর্যন্ত বদলায় না, বাচ্চাটি একটু বদলে যায়। সেখানেও স্মরণ ঘটে, প্রসঙ্গ আসে, উপমাও ছড়িয়ে যায়, জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন', কিন্তু তার চেয়ে যদি উচ্চকিত না-ও হয় অন্তত সমোচ্চ হয়ে ওঠে গল্পের গল্পটুকু—হুকে ঝোলানো দড়ির ফাঁসে গলা দিয়ে মহেন্দ্রর দ্বিধা আর নিচে তার ছেলে। দু-বছর পরে লেখা 'মাঝখানের দরজা' বা তারিখহীন 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা'-তে সে বালাইও আর নেই। সব আড় ভেঙে গেছে। গল্পের মানুষজন এখন নগ্ন—শুধু শারীরিক অর্থেই। সেই নগ্নতায় এক শেষ-যৌবনের পুরুষ তার কিশোরী-পরিচারিকাকে দাম্পত্যের মতোই নিয়মিত ধর্ষণ করে যায় ('মাঝখানের দরজা'), আর ডাক্তারের চেম্বার-সংলগ্ন বাথরুমে সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যে স্বমৈথুনে বীর্য বের করতে হয় ('হ্যাঁ, প্রিয়তমা')। এই শেষ গল্পের স্ত্রী-টি আবার ৭৮ সালের 'আলমারি' গল্পের স্ত্রীটির মতোই ফরাসি বুকনি ঝাড়ে।

যে লেখাগুলো লেখা হয়েছে ৬৯ সাল থেকে, বেরিয়েছে কখনো মিনিবুকে, কখনো কোনো কাগজে, দ্বিতীয়বার পড়ে ওঠার সুযোগ পাওয়া যায়নি, সে-সব একসঙ্গে বইয়ে পড়া গেলে এমনই এক অর্থময়তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যের, গল্প-উপন্যাসের, নির্ভর যে-বাস্তব আর উদ্দেশ্য যে-কল্পনা—এগুলো তার সমস্ত শর্ত স্বীকার করে বলেই সন্দীপন গদারের এক বচন উদ্ধৃত করে রেখেছেন—'বোধহয় কারো কাছেই বাস্তবতা এখনো ধরা দেয় নি।'

তার মানে কি এই যে সব লেখকই তাঁর নিজের মতো করে বাস্তবতাকে দেখেন। কিন্তু এ-কথা জানাবার জন্যে একটা উদ্ধৃতির দরকার হল কেন সন্দীপনের ? তা-ও, গদারের ?

এতে একটু সন্দেহ হয়—সন্দীপন তাঁর লেখাকে তাঁর লেখাটুকুর ভিতরেই না রেখে, তাকে একটা তত্ত্ব বা মতের ওপর দাঁড় করাতে চান।

কথাটি যে শুধু সামান্য এই এক লাইনের উদ্ধৃতির সূত্রেই বলছি, তা-নয়। বাংলা গল্প-কবিতায় এক ধরনের আধুনিকতা কিছুটা আদেখলেপনার সঙ্গে জুড়ে গেছে। সেখানে রচনার চাইতে রচয়িতা প্রধান, শিল্পের চাইতে জীবনাচরণ মুখ্য। এখন তার করুণ দিকটাও ধরা পড়েছে।

যেমন, এই বইটির ভূমিকায় সন্দীপন তাঁর স্বাভাবিক গদ্য লিখে উঠতে পারেননি। যেন, শব্দের অতিরিক্ত দিকে তিনি আঙুল দেখাচ্ছেন। কিন্তু সন্দীপনের গদ্যের জোর তো আঙুলের কাজে নয়, স্বরের কাজে। তিনি যে বলেন,

> "উল্টোদিকে, গত ২২ বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আমিও কিছু হতে পারি নি, তা নয়। আমি একজন সফল না-লেখক হতে পেরেছি। শুধু আমি জানি এবং আর কেউ জানে না, এ জন্যে আমাকে কত চেষ্টা করতে হয়েছে।"

তাতে আমাদের মত অনুরাগী পাঠক ভুলে যেতে চাই নিহিত আত্মকরুণা, মনে করতে চাই আত্মসচেতনতালব্ধ বিশিষ্টতায় তাঁর নিজেরই আস্থা। গোপনে দুঃখও যে পাই না, তা নয়। সন্দীপনকে তাঁর অভিমান জানাতে হচ্ছে ? সেই অভিমান থেকে তৈরি হচ্ছে না কথা, সন্দীপনের হাতে তৈরি কথা একজন লেখকের অবিশ্যি এমন হতেই পারে। তিনি নিজের যে গুণে মুগ্ধ, সেই গুণটিকেই করে তোলেন তাঁর লেখার একমাত্র সমর্থক। সন্দীপনের নবীনতা এত প্রচারিত, যে তাঁর পাঠকমাত্রেই যেন এই একটিমাত্র গুণেই মুগ্ধ থাকেন, যেন তাঁরা ভুলেও যেতে পারেন শুধু নবীনতা লেখার কোনো স্থায়ী গুণ নয়, সন্দীপনের লেখারও স্থায়িত্ব তাঁর নবীনতায় নয়—যে বিষয়কে তিনি খুঁজে ফেরেন সেই বিষয়েরই যোগ্য টেকনিকনির্মাণে।

এই লেখাটি শুরু করার সময় ভেবেছিলাম সন্দীপনের বিষয় একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যায় না কেন, এ নিয়ে কিছু কথা তুলব। কিন্তু, গল্পগুলি আবার পড়ে ফেলে সেই প্রশ্নটিকে বড় অবান্তর লাগছে। সন্দীপনের মতো আর এমন ক-জন লেখকই বা আছেন আমাদের, যিনি নিজের বিষয়টুকু নিয়েই নিজের মতো করে লিখে যেতে পারেন ? □

হ্যাঁ, প্রিয়তমা – সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯। বারোটাকা

সমর্পিত সত্তা

'যৌবনবাউলে'-র স্নিগ্ধ, ঈশ্বরবিশ্বাসী অলোকরঞ্জন ইতিমধ্যে দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসেছেন। এখন তাঁর কবিতা অনেক বেশি তির্যক, উচ্চারণ সংঘাতসঙ্কুল, এবং কখনো-কখনো ঈষৎ কৃত্রিম। আলোচ্য বইটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পুনশ্চালিত'-তে ("আগের বিজয়া দশমীতে কাকে-কাকে চিঠি লিখেছিলাম/ তার সংক্ষিপ্ত তালিকা তছনছ করতে গিয়ে চোখে পড়ল/ এক বন্ধুর নাম—যে আর নেই—তবু তাকে চিঠি লিখি,/ এবং আমারই ঠিকানায়") তিনি নিজের উদ্দেশে যে প্রতিবেদন জানিয়েছেন তা বহুলাংশে সত্য। তিনি তাঁর অতীত যে-সত্তাকে সম্বোধন ও স্মরণ করছেন তা আর নেই, এবং থাকা বোধহয় সম্ভবও নয়। গ্রন্থটির প্রস্তাবনা খুব উল্লেখযোগ্য ঃ

শিশুকে যেমন আদর করেন
চিত্রাভিনেতা ড্যানিকে

বুকের জ্যোৎস্না ঢেলে
আমিও দিব্য কমেডির
সুমীমাংসিত আঙ্গিকে

সব-কিছু অবহেলে
শিল্পের দিকে সঁপেছি আমার
মন।

আজ দেখি তুমি এক লহমায়
সমস্ত কাজ ফেলে

ও-পাড়ার শিশুটিকে
বাঁচাতে গিয়েছো, তোমার
কান্তাসম্মিত কজ্জল

গিয়েছে ঈষৎ বেঁকে,
সেই দেখাটাই আজ আমার
পার্বণ ॥

এই কবিতাটিতে বইটির মূল চরিত্র বিধৃত হয়ে আছে। একদিকে তিনি 'শিল্পের দিকে' মন সমর্পণ করেছেন, অন্যদিকে যাঁকে তিনি সম্বোধন করছেন, তিনি মানবিক তাগিদে 'ও-পাড়ার শিশুটিকে' বাঁচাতে গিয়েছেন—এই দুই উপলব্ধির টানাপোড়েনে তৈরি হয়েছে 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে'-র অধিকাংশ কবিতা।

শিল্পে অলোকরঞ্জনের সমর্পিত সত্তা এবং তাঁর মানবমুখিনতা কখনো কখনো একই কবিতার আয়তনে আস্তীর্ণ হয়েছে, কখনো বা আলাদা আলাদা কবিতায়। 'দয়িতা' কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি লোকায়ত,

জীবনঘনিষ্ঠ চিত্রকল্পে "যবের শিষ ধরে রয়েছে সপ্তদশী/কামরাশুদ্ধ জনমনিষ্যি কৌতূহলে ফেটে পড়ে" তারপরেই ঈষৎ তির্যকভাবে প্রবাহিত হয়েছে কবিতাটি, বলা হয়েছে সপ্তদশীর "সিঁথির রং অবিবাহিত, গৃহ হয়তো বহরমপুর," এবং পরিশেষে কবিতাটি শেষ হয়েছে অতি-শিল্পিত দুটি পঙক্তিতে "তাকেই আমি বিবাহ করি অনবরত/পড়ে শোনাই গট্‌ফ্রীড বেন, 'অতসী মামী'।" "একটি 'ধু-ধু সর্বনাম যায়" পুরোপুরিভাবে মানবিক অভিমান ও নিঃসঙ্গতার কবিতা ("তুষারমথিত নিঃশব্দতা। একটি মানুষ আমার কামরায়। উঠে এসেছে, সঙ্গে একটা কুকুর"………)। অন্যদিকে 'নিষ্কৃতি' বিশুদ্ধ শিল্পচেতনা থেকে উদ্ভূত ("কিশোরীহৃদয়ের স্বচ্ছ সরসীতে/আমার এই স্থান, সুবন্ধুরা আমাকে মনে করে লোলুপ যযাতি"…..)। 'সান্দ্র মুহূর্ত' কবিতায় আবার এই দুই উপলব্ধির সংঘর্ষ সংরক্ত হয়ে আছে ঃ

> আমরা তোমাকে এই সান্দ্র
> মুহূর্তে বিবাহ করছি—
>
> তুমি তার কিছুই জানো না
> তুমি হাঁটু মুড়ে এক শহিদত্ব
> নিয়ে বসে আছো
>
> এখন তোমার জানুদেশ
> বীণাপাণি সেইখানে কান
> পেতে
>
> শিল্পীরা নতুন উৎস খুঁজে
> পাবে।

আরো দু একটি উদাহরণ ঃ

> ১· আমি দেখলাম
> বাড়িটা প্রায় দিনের মধ্যে ছ'
> হাজারবার
>
> আহ্নিক আবর্তে ঘুরছে—
> আত্মপ্রদক্ষিণের মতো পাপ
> কিছু নেই।
>
> এবং দেখলাম
> একটা কাক প্রজ্ঞাপরিমিত
> বসে আছে সেগুন ডালের
> একটিমাত্র চুড়োয়
>
> একটি শান্ত অপ্রতিবাদ।
> (এক-একদিকে মানুষ আছে)
>
> ২· তুমি চিরদিন তোরণের
> নিচে
> দাঁড়িয়ে থাকো
>
> এই শুধু ছিল প্রার্থনা, যেন
> অবাঙ্মুখ
>
> নিছক শৈলী সম্মিতি নিয়ে
> দাঁড়িয়ে থাকা
>
> তোমার ধর্ম — যেভাবে
> ভারততাত্ত্বিকেরা
>
> এদেশ বুঝেছে ঠিক সেইমতো
> — ব'লেই আমি
>
> কীর্ণ ভুবনে বেড়াতে গিয়েছি।
> (নিরঞ্জনা)

এবার, গ্রন্থটির আরো দু-একটি প্রধান সূত্রের প্রসঙ্গে আসি। দেশ বিদেশের পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস সব কিছুকেই বিশাল এক ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন অলোকরঞ্জন। তাইরেসিয়াস, জিউস, হেরা, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী, চীবর সন্ন্যাসী, যযাতি, ধূমাবতী, ব্রহ্ম, আলম্বন বিভাব, ইত্যাকার অনুষঙ্গ প্রকীর্ণ হয়ে আছে অনেক কবিতায়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলোকরঞ্জন পুরাতনীকে নবীনের পটভূমিকায় অনুভব ও বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন, এবং এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

তৃতীয় সূত্রটি হল দ্যুতিময়, উজ্জ্বল, অমোঘ চিত্রকল্পের ব্যবহার। অলোকরঞ্জনের চিত্রকল্পরচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো নাটকীয় নিঃসরণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, এবং এখানেই তাঁর সমসাময়িক কবিদের কবিতা থেকে তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র

যেমন ঃ

১· মুখ ঘোরালে
দেখতে পাবো পাণ্ডুলিপি,
ঘরের মধ্যে

প্রাতিভাসিক নিজস্ব পৃথিবী,
কতো প্রহর জমেছে এই ঘরে,
কতো প্রহর মজেছে এই ঘরের
নিচে

মুহূর্তে মুহূর্তে পুঞ্জ
মহেঞ্জোদরোয়'।

২· বনস্থলীর নিলীন শক্তি
হঠাৎ পশুপাখিতে পরিণত,

নদীর অদৃশ্য সত্তা হাঁস আর
মাছের পসরা

উজাড় করে দিল, মেয়ের
সাজি থেকে তীব্র জাগুয়ার
আচমকা লাফিয়ে পড়ল।
(রাত্রিসূক্ত)

৩· রেমব্রান্টের ছবির গাঢ়
বিষণ্ণ আচ্ছন্ন তীব্র শিখা

দেখেও আমার চোখ ভরেনি,
খরগোশদের ঘাসের খিড়কি
দিয়ে

সাঁৎরানো—খুনসুটির দৃশ্য
দেখেছি ঢের

(বিভাব)

এই বইটির অধিকাংশ কবিতাই আমাকে স্পর্শ করেছে, শুধু একটি কবিতা ছাড়া ঃ 'নিসর্গে'। প্রথম পঙক্তির "হাই তুলতে গিয়ে দেখি উল্লোল ফুলদানি। বলছে সুসমাচার" — চিত্রকল্পে যে কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছে, তাকে শেষাবধি কোথাও অন্য আয়তনে অনূদিত করতে পারেননি অলোকরঞ্জন।

সব মিলিয়ে, 'দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে' সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় একটি উজ্জ্বল সংযোজন। শৈবাল মিত্রের আঁকা গ্রন্থের প্রচ্ছদটি আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। ☐

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

দেবীকে স্নানের ঘরে নগ্ন দেখে।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।
নাভানা। ১০·০০।

আগামী সংখ্যাগুলোয় যে সব বই ও পত্র-পত্রিকার সমালোচনা
সিদ্ধেশ্বর সেন, শামসুর রহমান-এর কবিতা,
দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ
প্রশান্ত কুমার পাল-এর রবিজীবনী
প্রস্তুতিপর্বের সুকুমার রায় সংখ্যা,
জলার্ক-এর জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং ধূর্জটীপ্রসাদ সংখ্যা।

চলচ্চিত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সোমেশ্বর ভৌমিক

ড্রামাটিক পারফরম্যান্স বিলটি আইন পরিষদে পেশ করা হয়েছিল ১৮৭৬ সালের ২১ মার্চ। নয় মাস বিতর্কের পর সেটি সদস্যদের অনুমোদন পেয়েছিল সেই বছরের ৬ ডিসেম্বর। মধ্যবর্তী সময়ে বিলটির খুঁটিনাটি বিচার করার জন্যে এবং এ-ব্যাপারে জনমত সংগ্রহের জন্যে একটি সিলেক্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এককথায়, সরকারের আসল উদ্দেশ্য যাই থাক, তাঁরা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিকে এমনভাবে প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে লোকের মনে গূঢ় কোনো অভিসন্ধির সন্দেহ না জাগে।

ইন্ডিয়ান সিনেমাটোগ্রাফ বিলটিতে ছিল কঠোরতর নিয়ন্ত্রণবিধি। তবু সেটি অনুমোদিত হয়েছিল মাত্র ছয় মাসের মধ্যে (৫-৯-১৯১৭ থেকে ৬-৩-১৯১৮)। এবং প্রথম থেকেই সরকারি তরফে তাড়াহুড়ো এবং গা-জোয়ারির ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অতিরিক্ত তৎপরতা না দেখিয়ে বোধহয় উপায়ও ছিল না সরকারের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইওরোপ জুড়ে ব্যাহত হয়েছিল চলচ্চিত্র-নির্মাণের কাজ। সেই সুযোগে বিশ্বের বাজারে—এমনকি ভারতেও—প্রায় একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে নিয়েছিল হলিউডে তৈরি আমেরিকান ছবি। আমেরিকান পরিচালকদের কোনো দায় ছিল না ভারতীয়দের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার। ফলে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে 'অস্বস্তিকর', এমন বহু ছবিই এসে পড়ত ভারতের বাজারে। এমন একটি ছবির কথা আগেই আমরা বলেছি।

সিনেমার পৃষ্ঠপোষক বলতে তখন শহরের স্বল্পবিত্তের দল, অর্থাৎ মূলত শ্রমিকশ্রেণী। ১ আনা ২ আনার টিকিট কেটে হল ভরাতেন তাঁরা। (সেই যুগের একটা হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটি সিনেমাহলে বিক্রি হওয়া ৩৯৩টি টিকিটের মধ্যে ৩৫০টিই ১ আনা বা ২ আনার)। তাঁদের কাছে যদিও প্রমোদমাধ্যম হিসেবেই মূলত সিনেমার আবেদন, তবু 'অস্বস্তিকর' ছবিগুলি তাঁদের মনের মধ্যে কোনো 'বিরূপ' প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে, এমন সন্দেহে সর্বদাই জর্জরিত থাকতেন সরকার। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও যে রাজনীতি বা সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটছে, তার আভাস পেয়েছিলেন তাঁরা। ১৯০৫ সালে শুরু হওয়া স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ছোটখাটো শ্রমিক আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়েছিল তখন।

কলকাতার প্রিন্টার্স ইউনিয়ন সরকারি ছাপাখানায় এক মাসব্যাপী ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিল ১৯০৫ সালে। ওই একই বছরে পূর্বভারতীয় রেলপথের শ্রমিক-কর্মচারীরাও ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯০৭ সালে হয়েছিল সমস্তিপুরের রেল-কারখানায় ধর্মঘট। বোম্বাইয়ের কারখানা-শ্রমিকরা এক সপ্তাহ ধর্মঘট করেছিলেন লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে। আর ১৯০৮ সালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার-কর্মচারীদের ভারতব্যাপী ধর্মঘট।

স্বল্পস্থায়ী 'ধর্মঘটী পর্ষদ'-এর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল স্থায়ী শ্রমিক-সংগঠনও, যেমন বোম্বাইয়ের কামগড় হিতবর্ধক সভা (১৯০৮), কলকাতা ও বোম্বাইয়ের পোস্টাল ইউনিয়ন, সর্বভারতীয় সংগঠন ইন্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাসোসিয়েশন (১৯০৯)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বভারতীয় রাজনীতি যেমন নতুন পথে বাঁক নিল স্বাধীনতার দাবিতে, শ্রমিক আন্দোলনেও এল নতুন দিশা। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের অনিবার্য ফল ছিল ব্যাপক খাদ্যাভাব এবং ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। সেই সঙ্গে ছিল শ্রমিকদের আশু সমস্যা—চাকরিতে নিরাপত্তার অভাব এবং কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এ-দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা দেখে শ্রমিক-আন্দোলনের নেতারা এই উপলব্ধিতে পৌঁছচ্ছিলেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তি করা যাবে না। শ্রমিকশ্রেণী যে সমাজ রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই বোধ ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। শ্রমিক-আন্দোলনকে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের শামিল করতে সচেষ্ট হলেন প্রাগ্রসর রাজনৈতিক কর্মীরা। অ্যানি বেসান্ত-এর শিষ্য বি. পি. ওয়াড়িয়া হলেন প্রথম ভারতীয় শ্রমিকনেতা, যিনি শ্রমিক আন্দোলনে রাজনীতিকে নিয়ে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগঠিত হল মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন (১৯১৮), যেটিকে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের আদি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এইসব 'দুর্লক্ষণ' চলচ্চিত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সেই প্রাথমিক পর্বটিকে নিঃসন্দেহে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল, অন্তত পরোক্ষভাবে।

কিন্তু, সিনেমা এবং থিয়েটার, এই দুই সংযোগ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের চিন্তা, উপলব্ধি ও আকাঙ্খা বিষয়ে আমাদের মন্তব্যগুলি অনুসিদ্ধান্তের পর্যায়েই থেকে যাবে যদি ১৮৭৬ সালের নাট্য-অভিনয় আইন এবং ১৯১৮ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন দুটি পাশাপাশি রেখে আমরা বিচার না করি।

১৮৭৬ সালের আইনে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাক-অভিনয় নিষেধাজ্ঞা জারি করার ব্যবস্থা থাকলেও আইন প্রয়োগে খুব একটা কড়াকড়ি ছিল না। ড্রামাটিক পারফরম্যান্স বিলটি উত্থাপনের সময়েই সরকারপক্ষ থেকে আইন পরিষদ-সদস্যদের এই বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রণীত আইনটি নাট্য-অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী এবং সংগঠিত কোনো সেন্সরশিপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে না (উত্থাপনকারী সদস্য মিস্টার এ. হবহাউজের বিবৃতি, ২১ মার্চ ১৮৭৬), সরকারের চোখে এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল 'প্রয়োজনানুগ নিয়ন্ত্রণ'। নাট্য-অভিনয় আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি এইরকম ঃ

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে অভিনীত বা অভিনেয় কোনো নাটক (ক) কুৎসাজনক বা নিন্দাসূচক, (খ) ব্রিটিশ ভারতে আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত যে সরকার, তার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক বা (গ) হীন প্রবৃত্তি ও দুর্নীতির পথনির্দেশকারী, তাহলে তাঁরা বিশেষ ঘোষণাবলে সেই নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারেন।' (৩নং ধারা)

'এই ঘোষণা জারি করার পরেও কোনো ব্যক্তি যদি (ক) নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানটিতে বা সেই অনুষ্ঠানের সমতুল কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেন, বা

(খ) এই ধরনের অনুষ্ঠান-আয়োজনে কোনোভাবে সহায়তাও করেন, বা

(গ) ঘোষণাটিকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে দর্শক হিসেবেও এ-ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে বা সেটির অংশবিশেষে উপস্থিত থাকেন, অথবা

(ঘ) মালিক, অধিকারী বা ব্যবহারকারী হিসেবে কোনো বাড়ি, ঘর বা জায়গাকে এ-ধরনের অনুষ্ঠানে নিজে ব্যবহার করেন বা অপরকে ব্যবহার করতে দেন, তাহলে তিনি এই আইনের সাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত হবেন।' (৬নং ধারা)

'অভিনেয় নাটকের চরিত্র নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেই নাটকের লেখক, স্বত্বাধিকারী বা মুদ্রক অথবা নাট্যশালার পরিচালক বা মালিকের কাছে প্রয়োজনমতো তথ্য চেয়ে পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকবেন ; অন্যথায় তিনি আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হবেন।' (৭নং ধারা)

কিন্তু প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক অনুমোদন দরকার, এমন কথা আইনের কোথাও বলা হয়নি। ১৯১৮ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্র-আইন সরকারের হাতে তুলে দিল প্রি-সেন্সরশিপের সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। আইনের ৫নং ধারায় বলা হল

'কোন ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনের উপযোগী, এই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত কেউ সেই ছবি দেখাতে

পারবেন না।'

এতেও অবশ্য স্বস্তি হয়নি সরকারের। তুরুপের এত বড় তাসটা হাতে রেখেও আর একটি পরিপূরক শর্ত আরোপ করলেন তাঁরা

'কোনো প্রাদেশিক সরকার একটি প্রদেশের সর্বত্র বা অঞ্চলবিশেষে কোনো ছবির অনুমোদন বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন। প্রশাসনিক ঘোষণার প্রাক্কালেও অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনবোধে একজন জেলাশাসক বা পুলিস কমিশনার কোনো অঞ্চলে অনুমোদন পাওয়া কোনো ছবির প্রদর্শনী স্থগিত রাখার আদেশ জারি করতে পারেন, অথবা সেই অঞ্চলের মধ্যে ছবিটির অনুমোদনপত্রের কার্যকারিতা বাতিল বলে ঘোষণাও করতে পারেন।' (৭নং ধারার ৫নং এবং ৬নং উপধারা)

পরে আমরা দেখব, কার্যক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত রক্ষাকবচটি কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল!

প্রদর্শনীর পূর্বে পরীক্ষা-সাপেক্ষে অনুমোদন চাওয়ার ব্যবস্থাটি যে শুধু প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করা হল, তা নয়। আইনের জালে জড়ানো হল প্রদর্শককেও

'এই আইন মোতাবেক লিখিত অনুমতিপত্রে নির্দিষ্ট কোনো স্থান ব্যতীত আর কোথাও চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী করা চলবে না।' (৩নং ধারা)

'এই ধরনের অনুমতি পত্র দেবার অধিকারী হবেন জেলাশাসক বা পুলিস কমিশনার'। (৪নং ধারা)

অনুরূপ কোনো বিধির উল্লেখ নাট্য-অভিনয় আইনের কোথাও পাওয়া যাবে না। তুলনীয় যে একটিমাত্র নিষেধবিধি আছে ১৮৭৬ সালের এই আইনে, তার প্রয়োগব্যবস্থাও সীমাবদ্ধ — একমাত্র কোনো জরুরী অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেটি প্রযোজ্য।

'গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট একটি তারিখ থেকে অনুমোদিত প্রমোদশালা ব্যতীত অন্য যেকোনো স্থানে নাট্য-অভিনয় নিষিদ্ধ করতে পারেন।

বিশেষ সেই অঞ্চলের কোনো প্রমোদগৃহেই নাট্য-অভিনয়ের আয়োজন করা যাবে না, যদি লিখিত নাটকের অনুলিপি/ প্রতিলিপি অথবা অভিনেয় নাটকের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রতিবেদন অনুষ্ঠানের অন্তত তিন দিন আগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না দেওয়া হয়।' (১০নং ধারা)

অবতার

পরিচালনা—মোহনকুমার
ক্যামেরা—কে-কে-মহাজন,
অভিনয়—রাজেশ খান্না, শাবানা আজমি।

প্রথমে একটি আবক্ষ মূর্তি দেখা যায়, তার সামনে শাবানা আজমি ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রায় তিন ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টা পরে বোঝা যায় রাজেশ খান্নারই মূর্তিটার মতো হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মেক-আপের দোষে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। মূর্তির মেক-আপ তো আর বদলানো যায় না।

মালা হাতে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা শাবানা আজমির সুবাদে প্রথম ফ্ল্যাশ ব্যাকে তাদের বিয়ের রজতজয়ন্তীতে, সেখান থেকে আবার ফ্ল্যাশ ব্যাকে তাদের পূর্বরাগে ও সেখান থেকে আবার ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ডে রজতজয়ন্তীর পরের দিনে আসতে হয়। এতে প্রায় সাপ-লুডো খেলার মতো অবস্থা।

মোটর মেকানিক রাজেশ খান্নার প্রেমে পড়ে কোটি-কোটি পতির মেয়ে শাবানা ঘর ছেড়ে চলে আসে। শাবানার নাম রাধা। বোধহয় সেই সুবাদেই সে রাজেশকে কিষণ বলে ভাবে। রাজেশেরই নাম অবতার সিং।

ছবিতে মাঝেমধ্যে গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসা আর মাঝে-মধ্যে লম্বা-লম্বা স্ক্রু-ডাইভার এঞ্জিনের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া তাকে আর-কিছু করতে দেখা যায় না। আর এ রকম করতে করতেই সে গোটা দশেক কোম্পানির মালিক হয়ে বসে।

সারা ফিল্মে নানা দৃশ্য বেশ ভাগ-ভাগ করে দেয়া আছে। রাজেশ খান্নার একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়েছে। তাই পঁচিশ বছর আগে শাবানার সঙ্গে পূর্বরাগের দৃশ্যে বুক চিতিয়ে পেট কমাতে হয়েছে। তাতে অসুবিধে হয়নি, কারণ অধিকাংশ সময়টাই দ্বৈতনৃত্য ও দ্বৈত সংগীতে ভরা ছিল ও শাবানা পঁচিশ বছর আগে-পরে একই রকম তন্বী।

এক ফ্ল্যাশ ব্যাকের সূত্রে তুষারপর্বতে বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে যাওয়া আছে। বরফেও রাজেশের গায়ে ছিল জহর কোট, পায়ে স্যাণ্ডেল। ছেলেরা যে কত খারাপ সেটা বোঝাতে বেশ ভালো একটা সমবেত ডিসকো নাচ আছে। □

গান — শুভ বসু

কবিপক্ষের গান

এবারের কবিপক্ষে রবীন্দ্রসদনে ৪ জুনের অনুষ্ঠানের কথাই সবার আগে মনে আসে। সব মিলিয়ে এর অসামান্য সাফল্যের কৃতিত্ব নিশ্চয় নৃত্যাঙ্গন ও তার পরিচালক শান্তি বসুর প্রাপ্য। প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান ছিল 'বর্ষা ও বসন্ত'। দুই ঋতুর কিছু নির্বাচিত গান সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় গাইলেন শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, সংঘমিত্রা গুপ্ত, মধুশ্রী সাহা, শতরূপা দাশগুপ্ত ও তুষার ভঞ্জ। গানগুলিতে যে উজ্জ্বলতা ও শ্রী ছিল তারই যথাযোগ্য পরিপূরণ ঘটছিল নৃত্যে। 'প্রথম আদি তব শক্তি' ও 'শ্রাবণের গগনের গায়' গানদুটির সঙ্গে শরীরের ছন্দিত গতি এবং মুদ্রার বৈচিত্র্যে ও লাবণ্যে যেমন অসামান্যতার ব্যঞ্জনা আনলেন শান্তি বসু, তেমনি 'এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে' 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' প্রভৃতি গানের সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েদের নাচের স্বতঃস্ফূর্ত গতি আর শৃঙ্খলাতে বুঝিয়ে দিলেন পরিচালক হিসেবেও তিনি কত বড়।

সে পরিচয় অবশ্য আরো অর্থময় হয়ে উঠল দ্বিতীয়ার্ধে, 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যনাট্যটিতে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে এই বিখ্যাত কবিতাটিকে অবলম্বন করে উদয়শঙ্কর যে নৃত্যনাট্যটি উপহার দেন বর্তমান প্রযোজনা তারই অনুসরণে পরিকল্পিত। ১৯৭২-এ উদয়শঙ্কর যখন এটি আবার মঞ্চস্থ করেন, তখন তাঁর সহকারী নৃত্য পরিচালক ছিলেন শান্তি বসু। পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে সেদিনকার প্রযোজনার অসামান্য সাফল্য উদয়শঙ্করের নৃত্যধারার সম্ভাবনাময়তাকেই প্রমাণ করে।

পার্থ ও গৌরী ঘোষের নেপথ্য কণ্ঠে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তির পর পর্দা ওঠে। বোঝা যায়, শুরু হচ্ছে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে—রাজার বিচার সভার বর্ণনায়। মঞ্চের পেছনে, স্বচ্ছ পর্দার আড়ালে দৃশ্য ও নৃত্য পরিকল্পনা আমাদের রোমাঞ্চিত করে বর্ণময়তা ও সার্থক কল্পনাশক্তির গুণে। সে দৃশ্যের স্টাইলাইজড নাচের সংযম কিন্তু দীর্ণ হয়ে যায় দ্বিতীয় দৃশ্যের বাঁধভাঙা গ্রামজীবনের প্রাণবান আর সুশৃঙ্খল রূপায়ণে। সেখানে ভারতনাট্যমের মুদ্রায় চকিতে মিশে যায় কিছু বা ভাঙড়া কিংবা সাঁওতালী বা এমনকি ব্রতচারী নাচেরও সহজ লোকায়ত মেজাজ। তৃতীয় দৃশ্যে বরুণাতীরে রানী আর সখীদের নাচে সুষমা আর নাটকীয়তা একাকার হয়ে আমাদের সিটের ভেতর এলিয়ে বসবার সুখ নাকচ করে দেয় যেন।

বিশেষ করে রাজার ভূমিকায় শান্তি বসু আর রানীর ভূমিকায় রিমালক্ষ্মী মেননের কথা আলাদাভাবে না বলে উপায় থাকে না নিশ্চয়, কিন্তু, এমন কি তুচ্ছতম ভূমিকাটিতে পর্যন্ত আমাদের যে মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয় তার পেছনে শুধু প্রত্যেক শিল্পীর যত্ন নয়, দক্ষতাও কাজ করে।

অবশ্য এত সফলতার পেছনে সঙ্গীত পরিচালক বিষ্ণু সাধুখাঁর অবদানও কম নয়। কণ্ঠ সংগীতের অভাব তিনি অসামান্য পূর্ণ করেছিলেন অজস্র বাদ্যযন্ত্রের বহুমাত্রিক ধ্বনি এবং সুরে। ধ্রুপদী এবং লোকায়ত সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার উপযুক্ত নাচের সঙ্গে মিশে যেন হয়ে উঠেছিল অফুরাণ রসের উৎস। তাছাড়া দুলাল সিংহের আলো ও সুনন্দা বসুর সজ্জার অবদানও কম নয়।

তবু, একটা ছোট জিজ্ঞাসা থাকে। 'রাজার আদেশে কিংকরী আসি ভূষণ ফেলিল খুলিয়া', কবিতাটির এই স্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কি আর একটু অনুগত থাকতে পারতেন না পরিচালক? সখীদের হাতে রানীর গৌরবমোচন আমাদের সংগতিবোধকে একটু বিপর্যস্ত করে বৈকি।

৭ জুন শেষ দিনের অনুষ্ঠান ছিল 'ইন্দিরা' গোষ্ঠীর 'বাসায় ফেরা ডানার শব্দ।' যেহেতু এর অনুষ্ঠান-বিন্যাস শঙ্খ ঘোষের, অতএব আমাদের প্রত্যাশাও থাকে তীব্র। ১৯২৬ সালে ইউরোপ ভ্রমণের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে যে গীতিগুচ্ছ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তা-ই এ অনুষ্ঠানের অবলম্বন। এখানে আমরা পেয়ে যাই শেষ বেলাকার বিষণ্ণতায়ও জীবনের আনন্দ ও মহনীয়তার স্বরপ্রত্যয় রবীন্দ্রনাথকে। তবু, এমন জিজ্ঞাসাও কি থাকতে পারে না কারো মনে, রচনার কালপরিচয়ের কথা মনে রেখেও যে, শুধুমাত্র তাতেই কি পরিচিত হতে পারে কোনো গান? পৌঁছে দিতে পারে কোনো সত্যে? এ প্রশ্ন আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এই কারণে যে, গানগুলি গাওয়া হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে, অনুষ্ঠানের সংগতিকে কিছু ক্ষুণ্ণ করবার ঝুঁকি নিয়েও।

তবুও সমবেত সংগীতগুলির সযত্ন সফলতায়, বেশ কিছু একক সংগীতের ঐশ্বর্যে, অনুষ্ঠানটি ছিল উপভোগ্য। চমৎকার লাবণ্যে ও ব্যঞ্জনায় সুপর্ণা চৌধুরীর 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই' স্মৃতি হয়ে থাকে আমাদের মনে। পূর্বা দামের 'বাঁশি আমি', কৃষ্ণা হাজরার 'রয় যে কাঙাল' বলিষ্ঠ সংবেদনশীলতায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমার' গানে অর্ঘ্য সেন সঞ্চারিত করে যান আমাদের পরিচিত স্নিগ্ধ নিবিড়তা। তবে, বিশেষ করে মনে পড়ে শ্রীনন্দা মুখোপাধ্যায়ের 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে'-র কথা। কণ্ঠের ঐশ্বর্যে, সাবলীলতায়, ভাবের গভীরকে স্পর্শ করবার ক্ষমতায় তাঁর গাওয়া এই শেষ গানটির রেশ আমাদের মনের ভেতর রণিত হয়ে চলে দীর্ঘকাল। মুখের সামনে কাগজ রেখেও শব্দ প্রয়োগের ত্রুটি কি আমরা কখনো প্রত্যাশা করি অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে? তিনি কি দাবি করেন না দক্ষ পেশাদার গায়কের চেয়ে বেশি কিছু সম্মান?

'যোগাযোগ'-এর তবু অন্তত কিছু পেশাদারী দক্ষতা ছিল। কিন্তু ৬ জুন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর মুক্তির উপায় যেন অবিশ্বাস্য। পাড়ার থিয়েটারে যেকোনো নাটক নামাতে কারো সংকোচ হয় না। কারণ, ত সাধারণত পাড়া প্রতিবেশীই দেখে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের মতো মঞ্চে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করবার আগে যেকোনো বয়স্ক লোকই তো বার দুই ভাবেন জানতাম। অথচ মঞ্চ, আলো, অভিনয়, নাটকীয়তা সঞ্চার, প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলোচনার অযোগ্য নিম্নমান সত্ত্বেও পরিচালক অমল গুহ ও তাঁর দল যে অসংকোচ নির্ভীকতায় নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হতো না। আত্মীয়তা বা প্রগতিশীল সংস্কৃতি চর্চা সম্বন্ধে একেবারে নাছোড় রকমের দায়বোধ ছাড়া এ নাটক শেষ পর্যন্ত বসে দেখা অসম্ভব। □

'গান্ধার'এর অনুষ্ঠান

'গান্ধার'-এর বয়স আর কত? যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন যে, তরুণ এই গোষ্ঠীটি যদিও এখনো তেমন রমরমা খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করে নি, তথাপি রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় তাঁদের নিষ্ঠা আর অনুসন্ধিৎসা যেকোনো মানুষের মনে বাধ্যতই আশা জাগাতে পারে। তার পরিচয় আবার পাওয়া গেল 'গোর্কি সদন'-এ ৮ জুন '৮৩-র সন্ধ্যায় কাকলি রায়ের পরিচালনায় 'প্রবাহিনীর গান' অনুষ্ঠানটিতে।

রবীন্দ্রসংগীত সংকলনের ইতিহাসে 'প্রবাহিনী'-র কথা আজ নিশ্চয় অধিকাংশেরই মনে নেই। কিন্তু 'গীতবিতান' প্রকাশের আগের যুগে এই সংকলনটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ১৯২৫-এর এই সংগ্রহটির অন্তর্ভুক্ত ছিল 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য গীতালি'-র পরবর্তী গানগুলো। পরবর্তীকালে 'গীতবিতান'-এর ভেতর লুপ্ত হয়ে যাওয়া এই সংগ্রহটিকে বেছে নিয়েছেন 'গান্ধার' নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের সংগীত ভাবনা বিকাশের একটা বিশেষ পর্বের পরিচয় পেতে। এর থেকেই তাঁদের অন্বেষণের গভীরতার একটা আঁচ পাওয়া যায়।

উপন্যাসের অংশ, গদ্য ও নাট্যাংশের সূত্রে গ্রথিত ছিল সেদিনকার একক ও সম্মেলক সংগীতগুলো। সুপরিচিত কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের পাঠ-খ্যাতি এখন প্রশ্নাতীত। সেদিন ভাষ্যপাঠে তাঁর সাথে ছিলেন সমরেশ রায়। মানতে হবে যে, সেদিনকার অনুষ্ঠানে গানের তুলনায় ভাষ্যপাঠের অংশটি দুর্বল শোনাচ্ছিল। বিশেষত 'গান্ধার'-এর আগের একটি অনুষ্ঠানে সদ্যপ্রয়াত রাধামোহন ভট্টাচার্যের অবিস্মরণীয় রাবীন্দ্রিক পাঠ শোনার রোমাঞ্চের স্মৃতি এখনো টাটকা বলেই কথাটা বেশি করে মনে হয়।

তবে, গানে নিশ্চয় শ্রোতার প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি। বিশেষত তেমন অনুষ্ঠানে, যেখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী বলতে একমাত্র গীতা ঘটক। অথচ এককে সম্মেলকে গানের নির্বাচন, উপস্থাপনা, নিষ্ঠা আর সক্ষমতা দর্শকদের আপ্লুত করে রাখতে পেরেছিল প্রায় সমস্তটা সময় জুড়ে। অনেক তারকাখচিত অনুষ্ঠানেও সব সময় এতখানি আন্তরিকতার স্বাদ জোটে না।

গীতা ঘটক

ফটো □ পুণ্যব্রত পত্রী

বিশেষত সম্মেলক গানগুলিতে পরিচালক প্রায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলা চলে। পুরুষ ও নারীকণ্ঠের সমন্বয় এই গানগুলিতে দুর্লভ সামঞ্জস্য অর্জন করতে পেরেছিল যেমন, তেমনি মার্জিত সুন্দর সুরের আরোহণ অবরোহনে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর দীর্ঘ চর্চার নিষ্ঠার পরিচয় ছিল। বিশেষত তা এই কারণেই আরো আশাব্যঞ্জক যে, শিল্পীদের ভেতরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই যথেষ্ট কমবয়সী, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত তাঁদের সবার সামনে।

একক সংগীতগুলির ভেতরে কয়েকটি গান আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে। সিদ্ধার্থ রায় তো কলকাতার তেমন একজন নন যে নামেই প্রত্যাশা জাগবে। কিন্তু 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া'-র প্রথম কলিটি গুঞ্জরিত হয়ে ওঠামাত্র আমাদের অভিজ্ঞতায় যে মাধুরী ছলকে ওঠে মুহূর্তে, তা শেষ চরণ পর্যন্ত অটুট থেকে স্থায়ী প্রত্যাশায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। শান্তা সেনের 'আমার দিন ফুরাল' গানটিতে শব্দ আর সুর, অর্থ আর সুর সেই নিবিড় অদ্বৈতে পৌঁছে যাচ্ছিল, যা আজ ব্যাপ্ত রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জনপ্রিয়তার যুগেও সহজলভ্য নয়। চমৎকার নিবেদনের আকুলতায় কাকলি রায়ের 'আমার সকল দুখের প্রদীপ' এক স্থায়ী বিষাদের রেশ সঞ্চার করে যেতে পেরেছিল আমাদের মনে। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'দিন অবসান হলো' ভালো লাগে তাঁর কণ্ঠমাধুরীর ও আন্তরিক গায়নের গুণে। গীতা ঘটক গাইলেন 'আমার একটি কথা' ও 'আমার জ্বলে নি আলো'। তাঁর কণ্ঠের অসামান্য ঐশ্বর্য, ভাবরূপায়ণদক্ষতা, লাবণ্য ও অভিজ্ঞতার কাছে আমাদের যে স্বাভাবিক প্রত্যাশা থাকে দ্বিতীয় গানটিতে হয়ত ততখানি প্রাপ্তি ঘটে না। তাঁর কাছে প্রত্যাশার সামান্যতম অপূর্ণতাও আমাদের কাছে বিশাল, তাই, ক্ষোভকর মনে হয়।

বিশেষভাবে স্মরণীয় এই গানগুলি ছাড়া অন্যান্য গানগুলিতে শিল্পীর নিষ্ঠা আর যোগ্যতার যে অভাব ছিল তা নয়। তাই, সব মিলিয়ে সেদিনকার সে অনুষ্ঠানের শেষে বেশ খানিকটা তৃপ্তির ছোঁয়া ছিল আমাদের মনে। এ জন্য নিশ্চয় 'গান্ধার' ও তার পরিচালক কাকলি রায়কে আমরা অভিনন্দন জানাব। আশা করব, আগামী দিনগুলিতে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয়ে তাঁরা কলকাতার এক অন্যতম সংগীত সংস্থা হিসেবে পরিচিত হবেন। □

বেতার দূরদর্শন

বর্ণালী দাস

বেতার

যান্ত্রিক গোলযোগে অনুষ্ঠান প্রচারের বিঘ্ন এবং তারজন্য নির্বিকার মার্জনা প্রার্থনা আকাশবাণীর একটি প্রাত্যহিক অভ্যাস। ফলে রোজই বহু সুখশ্রাব্য অনুষ্ঠান বিধ্বস্ত। রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতির অনুরোধের আসরে প্রায়ই নির্বিকার-ভাবে বাজানো হচ্ছে কাটা রেকর্ড, মাঝে মাঝে দ্রুততর হয়ে উঠছে যন্ত্রের গতি, মাঝে মাঝে শ্লথ।

চাষীভাইদের খেতখামারে আর ছাত্রছাত্রীদের ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরবেলায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হচ্ছে দুটি প্রহসন 'উনো জমির দুনো ফসল' এবং 'বিদ্যার্থীদের জন্য'।

বর্ষার এখন মাঝামাঝি, আকাশবাণীও নিয়মমাফিক প্রত্যহই দু-হাতে উজাড় করে দিচ্ছে গীতবিতানের বর্ষাঋতুর যাবতীয় গান। সুপ্রিয়া রায়চৌধুরী রাবীন্দ্রিক টপ্পার স্থিতিস্থাপকতা ছাড়াই গেয়ে গেলেন 'কোথা যে উধাও হল', স-হারমোনিয়াম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে 'বাদল মেঘে মাদল বাজে' গাইলেন কালীকিঙ্কর বটব্যাল, কল্যাণী রায়ের সেতারে বাজল জয়জয়ন্তী। এত ঘনঘটা সত্ত্বেও দামোদরে চড়া, গ্রামবাংলায় খরা।

শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবীর পুরাতনী গান শুনলাম। নামের ঘোষণায় গোড়ায় একটি 'শ্রীমতী'-ও নেই, শেষে একটি 'দেবী'-ও নেই। এই প্রবীণা সর্বজনশ্রদ্ধেয়া শিল্পীর এতটুকু প্রাপ্য সম্মানের দাবি কি খুবই অসঙ্গত?

বিধায়ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে মনুজেন্দ্র ভঞ্জের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানটি আকৃষ্ট করলেও মুগ্ধ করতে পারেনি। একজন নাট্যকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কি না, বা গান গাইতে জানেন কি না এই জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের বিকল্পে নাটকের বিভিন্ন টেকনিক, পরিভাষা বা ডেমনস্ট্রেশনের আগ্রহ বহু শ্রোতারই ছিল।

'সমালোচনা করতে সবাই নিজেকে আর্নল্ড ভাবে', 'সংবাদপত্রে দেখেছি মূর্খের পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনায় দেখেছি পণ্ডিতের মূর্খতা' পকেট থেকে মুঠো মুঠো এইরকম জলদি জবাবের নিরপেক্ষ উইট ছুঁড়ে রাত্রের অভিজ্ঞানে প্রমথনাথ বিশী সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটিকে জমিয়ে তুলেছিলেন।

দূরদর্শন

শব্দ বা ছবির যান্ত্রিক গোলযোগ নিয়েই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দূরদর্শন। হরেকরকম্বার অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীর অনবদ্য ওড়িশী নৃত্যটি এর বলি হল।

শনি রবিবারের বিকেলগুলি তো আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে বহুদিন অন্তর্হিত হয়েছে। এরই মধ্যে চমৎকার উপহার ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর'। 'পরশপাথরে'র মধ্যবিত্ত সঙ্কটের সুরাহা হওয়ামাত্র পর্দায় ভেসে উঠল 'অমিতাভ সন্ধ্যা'।

সংবাদপত্রের গ্রন্থ সমালোচনায় কেবলমাত্র কলকাতার প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির বিশ্লেষণ এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। 'ঐকতানে' তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল আলোচনাসমেত খণ্ড দৃশ্যগুলির জীবন্ত কোলাজ।

শিশুদের পত্রিকা নিয়ে বড়দের সঙ্গে ছোটদের আলোচনার অনুষ্ঠানটিতে শিশুরা অনেক বেশি সাবলীল স্বচ্ছন্দ। তুলনায় প্রাপ্তবয়স্করা বোধহয় তাঁদের প্রাজ্ঞ অভিজ্ঞতার নান্দনিক ভারে ভারাক্রান্ত।

সুনন্দা বসাকের মিহি কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের গায়কির মৌলিক ধর্ম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কোনো প্রয়োজন ছিল না ইতিমধ্যে জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত রাজস্থানী হস্তশিল্পের পুনঃপ্রচারের, খোলামাঠে চেয়ার পেতে ধান উৎপাদনের স্রেফ প্রচারমূলক অনুষ্ঠানটির, সময়াভাবে কীর্তনের ল্যাজামুড়ো ছেঁটে দেবার।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনার সিদ্ধান্তটি প্রশংসার্হ। কিন্তু 'তোমরা বড় হয়ে কে কী হবে?' এই জাতীয় প্রশ্ন কি এইসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য?

নাটক — সোমেন গুহ

জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন

কলকাতার বাতাসে এখন বের্টোল্ট ব্রেখটের হাওয়া। এবং এই হাওয়া উত্তরোত্তর বাড়বে বই, কমবে না। যাঁরা মৌলিক নাটকের সন্ধানে মাথা কুটছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এখন ব্রেখটকে নিয়ে ক্লান্ত। হওয়ারই কথা। য়ুরোপ-আমেরিকার পরিমণ্ডল থেকে উপড়ে বাংলার জল-হাওয়ায় ব্রেখটকে রোপণ করতে গেলে খানিকটা মিইয়ে যাবেই। সুতরাং কাজটা দুরূহ। এ কাজে কেউ কেউ হয়ত সফল, অনেকেই নয়।

বার্লিনের আন্সাম্বল্‌-এর অতিথি-পরিচালক ফ্রিট্‌ৎস বেনেভিটসের পরিচালনায় 'গালিলেওর জীবন' দেখে কলকাতার মানুষের ব্রেখট প্রযোজনা সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মেছে। উৎপল দত্ত একটি সফল ব্রেখট প্রযোজনা করে আমাদের সে ধারণাটা আর একটু উস্কে দিতে পারেন।

'জুলিয়াস সীজারের কাহিনী' নামে একটি ছোট উপন্যাসও ব্রেখট লিখেছিলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত বেছে নিয়েছেন 'সীজার এবং তাঁর সৈনিক' নামের ছোটগল্পের প্রথম অংশ 'সীজার'কে।

রোমান ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র এই জুলিয়াস সীজার। ডিক্টেটর হিসেবে যিনি ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাকে নিয়ে শেক্সপিয়র নাটক লিখেছেন, ব্রেখট গল্প লিখেছেন। আজ ১৯৮৩তেও থিয়েটার কমিউনের প্রযোজনায় নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত নাটক করলেন। নীলকণ্ঠ একটা সিরিয়স নাটকের সন্ধান করছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান কামনা করে নীলকণ্ঠ ইতিহাসের একটি চরিত্রকে পাদপ্রদীপের সামনে হাজির করেছেন। নীলকণ্ঠের উদ্দেশ্য মহৎ। তবে সমকালীনতা এতে কতটা স্পষ্ট হয়েছে এটা বলা মুসকিল। কলকাতার নাট্যকর্মীরা যে সমাজসচেতন এটা নীলকণ্ঠের বর্তমান প্রযোজনা আর একবার প্রমাণ করল। যেহেতু ব্রেখটের নাটকে প্রমোদ একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে, সেহেতু কেউ যদি নীলকণ্ঠের কাছে সেটুকু আশা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই হতাশ হবেন। কারণ ব্রেখটের যে গল্প নিছকই বর্ণনাপ্রধান, তাতে নাটকীয়ত্ব আরোপ করবার জন্য

থিয়েটার কমিউনের জুলিয়াস সীজারের শেষ সাতদিন নাটকে নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও সোনালী দাস

ফটো □ অসীম পাল

নীলকণ্ঠ শুধু ব্রেখটের উপরই নির্ভর করেননি। অন্বেষণ করেছেন প্লুটার্ক, শেক্সপিয়র এবং এফ· আর· কাওয়েলকে। সীজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের যে দীর্ঘ তালিকাটি নগরের গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রাহক তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেটিতে তাঁর বিশ্বস্ত লোকেদের নাম দেখতে হবে ভেবে সীজার কোনোদিন খোলেননি। সেক্রেটারি রারাসের কাছ থেকে সেটি একদিন খোওয়া যায় এবং রারাস নিহত হন।

সীজারের বন্ধু অ্যান্টনির নিষেধ সত্ত্বেও সীজার সিনেটের দিকে গেলেন। পম্পের পোর্টিকোয় পৌঁছলেন। চেয়ারে বসেছেন সীজার। তার দিকে এগিয়ে এল ষড়যন্ত্রকারীরা। কিন্তু দুদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতোন এখন আর তাদের ঘাড়ের ওপর সাদা রঙের ছোপান কিছু বসানো নেই, সেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের সত্যকার মুণ্ডুগুলোই শোভা পাচ্ছে। একজন তাঁকে কি একটা পড়তে দিল। তারপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর।

থিয়েটার কমিউনের নাটকেও ব্রেখটকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ব্রেখটের গল্পের মতোই সেখানেও ব্যবসায়ী, সিনেটার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে ক্রমশই দানা বাঁধছে তা দেখানো হয়েছে। বাড়তি অংশ যেটুকু এসেছে তাহল সীজার নির্বাচন ব্যবস্থা নাকচ করে রোমের সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাঁরই দত্তক পুত্র অকটেভিয়াসকে মনোনীত করতে চান পরিণতিতে সংঘটিত হল ইতিহাসের সেই মহান হত্যাকাণ্ড। ফাঁকা মঞ্চে জোরালো সাদা আলোয় সমগ্র প্রযোজনাটি বাংলা মঞ্চের একটি অত্যন্ত সফল বুদ্ধিদীপ্ত আন্তরিক প্রযোজনা। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত একজন বড় মাপের পরিচালক ও অভিনেতা। চেহারায় না মানালেও তাঁর সৃষ্ট সীজার আমাদের কাছে কখনও করুণ, কখনও মহান, কখনও প্রাজ্ঞ, আবার কখনও বা হাস্যকর।

দেবরঞ্জন সেনগুপ্তের আবহ, তপন সেনগুপ্তের মঞ্চ ও মনোরঞ্জন ঘোষের আলোতে আন্তরিকতা সুস্পষ্ট

এই নাটক দেখার পর বর্তমান প্রতিবেদকের দু-একটি কথা মনে হয়েছে। (১) ব্রেখটের তথাকথিত কোনো নাটকের মধ্যে না গিয়ে ব্রেখটের কাহিনীর অনুপ্রেরণায় 'জুলিয়াস সীজারের শেষ সাত দিন' কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার মঞ্চে ব্রেখট-চর্চার পরিসরকে অনেকখানি বিস্তৃত করল। (২) তথাকথিত ব্রেখট বিশেষজ্ঞদের পাণ্ডিত্যের কচকচানিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক চিন্তার ফলশ্রুতি এই নাটক বাংলা মঞ্চে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ব্রেখট প্রযোজনা। (৩) এ নাটক দেখার পর দর্শক হয়ত কোনও জঙ্গী অনুপ্রেরণা পাবেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তা চেতনার জগতে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন এনে দেবে এই প্রযোজনা। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত কলকাতার মঞ্চে একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা। □

যে যেখানে

দেবাশিস মজুমদার

দেবাশিসের নাম মৌলিক নাটক প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে বেশ জরুরী হয়ে উঠেছে। শূদ্রক নাট্য-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণ এই যুবক পুরোদস্তুর একজন নাট্যকর্মী। নাট্য রচনার সময় দলের চরিত্র ও সীমাবদ্ধতার কথা তিনি ভুলে যেতে পারেন না। অমিতাক্ষর নাটকে যে শিশু চরিত্রটি রয়েছে হয়ত তা বাদ দিতে হতো যদি নিকট আত্মীয়ের একজনকে অভিনয় ও রিহার্সালে নিয়মিত হাজির করা যাবে এই নিশ্চয়তা না পেতেন।

সমাজ সচেতনতা ও সমাজের যথার্থ গতি অনুধাবণ, উপলব্ধি এবং শেষে তা একটি নাটকের স্ক্রিপ্টে কোনো-না-কোনো দিক থেকে মৌলিকভাবে সৃজন — নাট্যকার হিসাবে এ সমস্যা প্রায়শ তাঁর কাছে সংকটের রূপে আসে। দৃশ্য-শিল্পে দর্শকের উপস্থিতিও নাটককে অনেকখানি প্রভাবিত করে, যদিও দর্শকের সঙ্গে নাটকের আপাত সম্পর্ক নাটকে যে সীমাবদ্ধতা আনেনা দেবাশিস তা বিশ্বাস করেন না। প্রকরণ, প্রণালী ছাড়াও এই তত্ত্বগত দিকটি তাঁকে এবং তাঁর দলকে চিন্তিত করে তোলে।

সর্বোপরি বিশাল ব্যয়। গ্রুপ থিয়েটারের আরেকটি দিক এখন বিপদ সংকেতের মতো বেজে উঠছে: দর্শক কমছে। এসব সত্ত্বেও দেবাশিসের জীবনশক্তি মূলত নাটকের দিকেই বেগে বয়ে চলেছে। ঈশাবাস্য'র পর হাত দিয়েছেন আরেকটি নাটকে। ☐

অশোক ঘোষ

মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি আর তার পরিবেশ যদি হয় নৃতত্ত্বের গোড়ার কথা, তাহলে সমকালের চেনা জানা বৃত্তের মানুষকে নিয়ে গবেষণাও নৃতত্ত্বের এক্তিয়ারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশোক ঘোষ তাই বিদ্যায়তনিক গবেষণাকে একটু পাশে রেখে কাজ করছেন সমকালীন মানুষ আর তার সমাজকে নিয়ে। ভারী কৌতূহলোদ্দীপক তাঁর গবেষণার বিষয়গুলো। হালে গণমাধ্যম নিয়ে তাঁর গবেষণা শেষ করেছেন। টিভি, রেডিও আর সংবাদপত্রের মতো তিনটি আধুনিক মাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে কতটা পালটায় সেটাই উদঘাটন করতে চেয়েছেন তাঁর গবেষণায়। আরও একটা কাজ সম্প্রতি শেষ করলেন, কলকাতা আর তার সংলগ্ন অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে। তাঁর অবিদ্যায়তনিক গবেষণার শুরু শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা দিয়েই।

এ পর্যন্ত তিনি রচনা করেছেন দেড় শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে নৃতত্ত্বের তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তাঁর নিজস্ব বিষয় হল "প্যালিও অ্যানথ্রপলজি"। ঝকঝকে চেহারার মতোই তাঁর কথা-বার্তা সরাসরি পরিষ্কার। তাঁর গবেষণার বিষয় এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান নিরলস। বিশ্বের প্রায় সমস্ত নৃতত্ত্বের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এই গবেষক সম্প্রতি মগ্ন আছেন 'সোসাল পলিউশান' নিয়ে। গবেষণার নামটাই শুধু নয়, বিষয়টাও অভিনব। ☐

নবনীতা দেবসেন

এই অসহ্য গরম, নিজের হাঁপানি আর সংসারের উনকোটি ঝামেলায় প্রকাশকদের দেয়া কোনো কথাই রাখতে পারছেন না নবনীতা দেবসেন। মূল কানাড়ি থেকে দ্বাদশ শতকের কবিতা বীর শৈব রচনা সংগ্রহ অনুবাদ শেষ। ভূমিকা বাকি। রেডি ফর প্রেসের জন্যে টুকটাক যে ঝাড়পোঁছ দরকার, তাও। ১৯৮২তে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছিলেন এ্যানুয়াল টেগোর মেমোরিয়াল লেকচার। ওই বই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপার কথা, পাঠানো হয়নি ম্যানসক্রিপ্ট। বাচ্চাদের একটা রূপকথা সংকলন এক বই-ছাপিয়েকে দেয়ার কথা, হয়নি। দুটি কবিতার বই, মেয়েদের বিষয়ে যেসব প্রবন্ধ আর রম্যরচনা লিখেছেন, তার সংকলন গুছিয়ে-ওঠা যাচ্ছে না। ১৯৬১ থেকে রামায়ণের ওপর নানান প্রবন্ধ ইংরেজিতে বেরিয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকার অনেক কাগজে। বাকি শুধু শেষটুকু। তুলনামূলক ইংরেজি সাহিত্যের ওপর রয়েছে অনেক ছাপা প্রবন্ধ। গুছিয়ে ফেললেই বই। মা রাধারানী দেবী লিখতেন অপরাজিতা দেবী নামে। তাঁর ওই নামে লেখার বয়েস পঞ্চাশ। অপরাজিতা দেবীর প্রথম কবিতার বই বেরয় ১৩৪০-এ। পঞ্চাশ পূর্তি নিয়ে ইচ্ছে ছিল প্রবন্ধ লেখার, হয়ে উঠল না। অপরাজিতা দেবীর কাব্য সংকলন বেরনোর জন্যে যে উদ্যোগ নেয়া দরকার ছিল, হয়নি তাও। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমপারেটিভ লিটারেচার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি নবনীতা। ☐

গণেশ পাইন

মধ্য কলকাতার প্রায়-অন্ধকার ভাঙা বাড়ির দোতলায় তাঁর স্টুডিও, নিচে সশব্দে চলছে প্রেসের মেশিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা গণেশ পাইন এই শব্দ ও ভাঙা বাড়িটির সান্নিধ্যে থাকেন, যেখানে প্রিয়জনেরা সব সময়ই নিমন্ত্রিত। আর সন্ধ্যা থেকে রাতে ঘরে ফেরার আগে তাঁকে পাওয়া যায় কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের এক রেস্তরাঁয়। কবি, গল্পকার, স্কুল-টিচার ও শিল্পী বন্ধু দু-একজন ছাড়াও, যে-কেউ ঐ আড্ডায় নিজেকে সাবলীলভাবে জুড়ে নিতে পারেন। তাঁর আকাঙ্খা এত তীব্র ও স্বাভাবিক যে তা শুধু শিল্প নয় নান্দনিক অর্থে। জীবনযাপনের প্রশ্ন, না ঠিক তা-ও নয়, জীবন প্রবাহ বলাই সঠিক। এই প্রবাহ তো সমাজেও বয়ে যাচ্ছে, ফলে ব্যক্তি-সমাজ সবকিছু জুড়ে মানুষের নিরন্তর চেষ্টায় বেঁচে থাকার এক গল্পও যেন তাঁর চিত্রের জিজ্ঞাসা। জীবন আলোড়িত করা সেই সৃষ্টি এক বিস্ফোরণের মতো। সশব্দ বা নিঃশব্দ এমন এক বিশ্বাসী মুখই তিনি খুঁজে চলেছেন। একান্তে বলা এইসব কথা মুদ্রিত অক্ষরে নিয়ে আসা বিপজ্জনক, বিশেষ করে এমন শিল্পী যিনি প্রধানত নিজেকে কর্মী-ই ভাবতে চান। সত্যাসত্যর তর্ক ও আলোচনায় অংশ নেন নিষ্ঠার সঙ্গে, অথচ এ শহরের গড়পড়তা প্রবণতা মতান্তর-মনান্তর একদম মানেন না। প্রসঙ্গত বহুদিন আমরা তাঁর কোনো প্রদর্শনী দেখিনি, জানা যায়নি শীঘ্র দেখা যাবে কিনা। ☐

প্রতিক্ষণ-এর পক্ষ থেকে প্রিয়ব্রত দেব কর্তৃক ৭, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা - ৭০০০১৩ ফোন ২২৮৫৩০ থেকে প্রকাশিত ও হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক কোম্পানি,

PRATIKSHAN □ Vol.I, No 3 □ 2 August 1983 □ Rs 3 □ FORTINIGHTLY